আজ কলকাতায় গল্প সংকলন

সম্পাদনা : রতীশ রায়

রম্যবাণী পাবলিশিং হাউস
বারোর এ, লাটুবাবু লেন।
কোলকাতা-ছয়

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৬৮

প্রকাশক :
রতীশ রায়
রম্যবাণী পাবলিশিং হাউস
১২এ, লাটুবাবু লেন
কলিকাতা-৬

মুদ্রণ :
নেপাল ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স
৫৭।এ, কারবালা ট্যাংক লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
সত্যচরণ দাস
কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৬

ব্লক : চ্যাটার্জি ব্লক মেকার্স

বাঁধাই : সীতানাথ বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

প্রচ্ছদ :
পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

অলংকরণ :
নিতাই দে

মূল্য :
বারো টাকা
(শোভন সংস্করণ) আঠারো টাকা

প্রাসঙ্গিক

আমাদের দুর্ভাগ্য, যে গল্প সংকলন দিয়ে আমাদের প্রকাশন সংস্থার সূত্রপাত, তা নিছকই গল্প কথা নয়। এই সংকলনের নামের মধ্যেই গল্পগুলির চরিত্র আভাষিত। আমরা পুরোপুরি ভাবেই কলকাতার মানসিকতাকে ধরতে চেয়েছি। শ্যামবাজারের একটি ছেলের সঙ্গে বালিগঞ্জের একটি মেয়ের প্রেম এবং দুজনের মুখোমুখি আলাপ যদি প্রাত্যহিক কর্মসূচী হয় তবে যাতায়াতের পথে ট্রাফিক জ্যাম, মিছিল, লরী, স্টেটবাস, বিজ্ঞাপন অনেক কিছুই আসবে নিঃসন্দেহে কিন্তু এইটুকুতেই 'আজ কলকাতাকে' পাওয়া যাবে না, অন্যদিকে শান্ত নির্জন গ্রামসম্পর্কে আমাদের বহুদিন লালিত ধারণা যখন বিস্ফোরণ ও অবক্ষয়ী আর্তনাদে ভেঙ্গে পড়ে, তখন সেখানকার জীবনে যে কলকাতার আঁচ লেগেছে, সে সত্যই প্রমাণিত হয়। কারণ কলকাতা হল বাংলার আয়না।

এই গল্প সংকলন শহরে, গঞ্জে, গ্রামে এই কলকাতামনস্কতাকে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী। শুধু খুনোখুনি নয়, সার্বিকভাবে আজকের কলকাতার বিচিত্র জীবন চিত্রণের প্রচেষ্টায় আমরা আন্তরিক। সাহিত্য সমকাল অথবা সমাজদর্পণ হবে কিনা সে আলোচনা, বিতর্ক ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়ে এখন বাহুল্য বোধ হয়। তবু পৃথিবীর সব দেশেই দেখা গেছে সমকাল ভিত্তিক সাহিত্যকর্ম অনেক সময়েই চিরন্তন সাহিত্য মূল্যে কালাতিক্রমী। আমাদের সৌভাগ্য, সমকালের পটভূমিকায় চিরন্তন মূল্যের একটি গল্প সংকলন তথা এযুগের অথবা চিরকালের একটি প্রামাণ্য দলিল প্রকাশ করে আপনাদের দরবারে উপস্থিত করতে পারলাম।

সূচীপত্র

আজ
কলকাতায়

শাদা অ্যামবুলেন্স

....

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
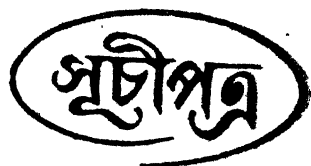
প্রথম ফুস্‌কুরিটা সে গোপনে দেখল। জানলা খুলে, হাতটা সূর্যের আলোতে রেখে দেখল। মনে হয় শ্বেতচন্দন দিয়ে কে ফোঁটা দিয়েছে। গায়ে জ্বর। সে জ্বর নিয়ে সারা বাড়ির কাজ করেছে। মেঝে মুছে রেখেছে। ড্রইং রুমের সোফা-সেট, বাতিদানের আধার এবং আলমারির কাঁচ ও জানলার শার্সি ঝেড়ে মুছে তকতকে করতে গিয়ে তার মনে হয়েছে শরীরে ব্যথা, ভয়ঙ্কর রকমের ব্যথা, সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কপাল টান ধরে আছে এবং কেমন একটা বমি-বমি ভাব। সে ঠিক করেছে এখন মাদুর পেতে এই ছোট্ট ঘরটিতে—(সে ঘরটাতে একাই থাকে) —গ্যারেজের উপরে এই ছ-ফুট বাই আট-ফুট ঘরে শুয়ে পড়বে। ফুস্‌কুরিটা দেখেই ওর জল তেষ্টা পাচ্ছিল তীব্র। এখনই হয়ত ছোট দিদিমণি চিৎকার করবে, ওর কুকুরটা নিচে নেমে গেছে, কথা শুনছে না, ধরে আনতে হবে কুকুরটাকে। নীল রঙের কুকুর, লম্বা জিভ এবং বক্‌লস পরালে বাঘের মতো—কুকুরটা তাকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। তাকে দেখলেই ওটা বেশি ছুটোছুটি শুরু ক'রে দেয়। সে এখন এ-সব পারে না। বয়স হয়েছে। সেই কর্তাবাবার আমলে সে এক কাপড়ে এখানে এসে

উঠেছিল। এখন কর্তাবাবা নেই। ছোটবাবু আছেন। তাঁর দুই মেয়ে। মিলি আর লিলি। লিলি দিদিমণি ঘুম থেকে বড্ড দেরি ক'রে ওঠে। ওর ঘরের জানলা খুলে দিলে সে দিদিমণির লম্বা শরীর কতদিন প্রায় উলঙ্গ দেখেছে। লিলিদিদি ওকে আর মানুষের মতো মান্য করতে চায় না। কুকুরটা শুয়ে থাকে খাটের নিচে। উপরে লিলিদিদি। সিল্কের গাউন এবং চুলের ফিতে সাদা রঙের। আশ্চর্য রঙ লিলিদির শরীরে। কুকুরটার যেমন ঢুকে যাবার নেই মানা ওরও তেমনি মানা নেই। সে যেন কিছু দেখে না, ঘর সাফসোফ ক'রে দেয়, ঘরের বইপত্র সাজিয়ে রাখে, ফুলদানিতে ফুল দিয়ে যায় ভোরে এবং অলস সূর্য জানলায় নেমে এলে সে শুধু ডাকে—লিলিদি তোমার কফি। সকালে কফি না খেলে লিলিদির ঘুম ভাঙে না। বিছানা ছেড়ে উঠতেও পারে না।

সুতরাং এক্ষুণি ডাকবে তাকে। লিলিদি ডাকলে আর নিস্তার নেই। সে জ্বরে ভুগছে, একথা এখন বলতে পারছে না। সে একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে দিল। ছোটবাবুর যা কিছু পুরণো ছেঁড়া পাঞ্জাবি, কাপড়, যা আর গায়ে দেওয়া যায় না—তার দুটো একটা তাকে দিয়ে দেন। সে সেই পাঞ্জাবি শরীরে গলিয়ে নিয়েছে। হাতটা ঢেকে রেখেছে। কারণ সকাল থেকেই সে লক্ষ্য করছে দুটো-একটা ফুস্‌কুরি দেখা দিচ্ছে। জল নিয়ে বেশ টস্‌টসে। সে সবই ঢেকেঢুকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এখন লিলি দিদিমণি ডাকলেই ভয়। বাইরে বোগেনভেলিয়ার ডালপালাগুলি বাতাসে নড়ছে। কুকুরটা সেই ডালপালায় কি যেন শিকার খুঁজছে। সে ভাবল, দিদিমণি ডাকলে সাড়া দেবে না। বরং শরীরের যা অবস্থা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লে ভাল। কিন্তু ভয়—সে যেন শুয়ে পড়লেই ধরা পড়ে যাবে! তোমার কি হয়েছে সুবলদাদা। তুমি শুয়ে আছ কেন! ডলি (কুকুরের নাম) কি

দুষ্টুমি করছে দ্যাখো। একেবারে সারাটা দিন লিলি দিদিমণি কচি খুকির মতো থাকে। যেন শরীরে কিছুই গজায় নি। কিছু বোঝে না জানে না মতো। অথচ সাজপোষাকে শরীরের সব উঁচু ক'রে রাখার বাসনা। এসব ভাবতেই সে কেমন জিভে কামড় দিল। সে কর্তাবাবার আমল থেকে আছে, বিশ্বাসী মানুষ। ওরা যখন সবাই উটি চলে যায় হাওয়া বদলাতে তখন সে বাড়িতে একা থাকে। কুটোগাছটি পর্যন্ত কেউ সরাতে পারে না। সুতরাং বিরক্ত মুখে সে লিলি দিদিমণির অথবা মিলি দিদিমণির সম্পর্কে কিছু অশ্লীল চিন্তা ক'রে ফেলে নিজেই জিভে কামড় দিতে শুনল, ডাকছে লিলি দিদিমণি, না কি ছোট মা ডাকছে, গলার স্বরটা সে কেন জানি বুঝতে পারল না, জ্বরের জন্য হয়ত হবে, কারণ তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, চোখমুখ লাল, সে সকাল থেকেই দূরে দূরে থেকেছে। তার কোনোদিন কোনো অসুখ হয় নি, হলে সে নিজেকে বড় ছোট ভাবত, অসুখ হওয়াটা ওর পক্ষে কৃতিত্বের ব্যাপার নয় সে জানে। আজ এই যে এত বছর পর শরীরে জ্বর এসে গেল—এবং দু-একটা ফুস্‌কুরি ভেসে উঠছে শরীরে। কোমড়, হাত পা ভীষণ কামড়াচ্ছে। সে দাঁড়াতে পারছে না ভালমতো। এখন যে সে কি করে! ছোট মা না লিলি দিদিমণি ডাকছে তা পর্যন্ত সে বুঝতে পারছে না। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তার কি করা কর্তব্য এখন, বাতাসে ফুঁ দেবে না দূর থেকে সব কথা শুনে চলে আসবে! সে যাই হোক কিছু ভাববার আগেই ছোট মা কেমন সিঁড়ির মুখে তড়তড় ক'রে নেমে এল, এই সুবল তোমাকে যে ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না?

—হ্যাঁ মা শুনতে পাচ্ছি, বললেই শুনতে পাব।

—বাজার থেকে এক কিলো মুরগির মাংস নিয়ে আয়।

—আর কি লাগবে?

ছোট মা বললেন, দাঁড়া। বলে উপরে উঠে গেলেন,

ফ্রিজ খুলে কি দেখলেন, তারপর বললেন, না আর কিছু লাগবে না।

সুবল মার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে উপরে গেল, টাকা নিল এবং নেবার সময় দেখল মুখের দিকে তিনি হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছেন। হ্যাঁরে সুবল, তোর অসুখ করেছে!

—না মা অসুখ করে নি।

—চোখ মুখ এত লাল!

—রাতে ভাল ঘুম হয় নি।

—কুকুরটা বুঝি জ্বালিয়েছে?

—না মা কুকুরের দোষ কি। সে আমার ঘরে শোবে না লিলি দিদিমণির ঘরে শোবে ঠিক করতে পারে না। দিদিমণি দরজা খুলে শোয়, আমার শুতে ভয় করে।

ছোট মা হেসে দিলেন। সুবল হাবাগোবা লোক। বয়স হয়েছে। প্রৌঢ় বলা চলে। মিলি-লিলির সে জন্ম দেখেছে। সে ওদের কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছে। তবু যে কেন সুবল ভয় পায়।

ছোট মা বললেন, তোর তো কোনো অসুখ করে না জানি।

—হ্যাঁ মা, আমার অসুখ করে না।

—অসুখ হয় না তোর, কি যে হিংসে হয় না তোকে!

—তা মা আমার এইটা আছে হিংসা করার মতো। কোনো অসুখ হয় না।

—আর আমায় ছাখ···এই বলে ছোট মা আর কিছু দেখালেন না। কথা অর্ধেক পথে বন্ধ ক'রে দিলেন। এত বেশি কথা তিনি কখনও সুবলের সঙ্গে বলেন না। বলে ফেলে তিনি নিজেই কেমন তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত ক'রে নিলেন!···তাড়াতাড়ি ফিরবি।

—ফিরব মা।

—তোর এই একটা অসুখ আছে। বাড়ির বাইরে গেলে আর ফিরে আসতে চাস না!

—তা মা আমার এই একটা অসুখ কি ক'রে যে হয়ে গেল!

সত্যি ওর এই একটি মাত্র অসুখ। বাইরে বের হলে ফিরে আসতে ইচ্ছা হয় না। কতলোকের সঙ্গে তার পরিচয়। সকলের সঙ্গে সে একটা যেন সম্পর্ক পাতিয়ে বসে আছে। রাস্তার মোড়ে নন্দী মশাইয়ের কাপড়ের দোকান, পরে পালবাবুর চায়ের দোকান, এবং বড় পথ ধরে গেলে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে একটা মানুষ বসে থাকে, চুল দাড়ি কামায়—তার সঙ্গে দেখা হলেই—এই যে সুবল দা, মুরগির মাংস আনতে যাচ্ছ।—কেবল ওদের খোঁটা দেবার স্বভাব—এত মুরগি খায় কি করে? দুবেলা মুরগি, তাজা মুরগি —আহা ওরা যেন সুবলের মুখ দেখলে বড় বাড়িটা যে সুন্দর সুন্দর মুরগির কলিজা সিদ্ধ ক'রে খায় তা টের পায়। পথে বের হলেই সুবলকে এ ও ডাকবে, কথা বলবে, মেয়ে দুটোর খবর নিতে চাইলে সে জিভে কামড় দেবে—ওদের কিছু বেলেল্লাপনা, অথবা চটুল চালচলন এইসব মানুষের চোখে লাগে—ওরা যেন সুবলকে কাছে পেলে—সব রাগদুঃখ উজার ক'রে দিতে চায়। সে সেজন্য যতটা পারে ওদের কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করে—অথবা কোনো কোনোদিন কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে বসে থাকলে তার কেন জানি একটা আবাসের কথা মনে হয়, সে তার পুত্র সন্তানটিকে যে কোথায় কার কাছে গচ্ছিত রেখে চলে এসেছিল এখন যেন সব মনে করতে পারে না। বৌটা পালিয়ে গেলে সে উন্মাদের মতো হয়ে গিয়েছিল—সে এ-দেশে এসে অভাবের সঙ্গে লড়তে পারে নি। বৌটা তার স্বজন ফেলে এক বাউণ্ডুলে মানুষের সঙ্গে ভেগে গেল। সুতরাং সে মুরগির মাংসের জন্য অথবা অন্য কোনো কাজে বের হলে চুপচাপ হাঁটে—হাঁটতে হাঁটতে সে তার স্মৃতিতে ফিরে যায়। এবং কি ক'রে যেন দশটা পাঁচটা লোকের সঙ্গে

কথা বলতে বলতে ওর দেরি হয়ে যায়—সে টের পায় না কত আগে বের হয়েছে। বাড়ি ফিরে গেলেই ছোট মা একেবারে রণমূর্তি। মায়ের আঁচল পর্যন্ত তখন ঠিক থাকে না। কুকুরটা শুয়ে কুঁই কুঁই করতে থাকে। সুবল একেবারে নির্বিকার। যেন এই চিৎকার চেঁচামেচি সে আদৌ শুনছে না। সে তার কাজ ক'রে যাচ্ছে। কারণ এ-বাড়িতে ছোটবাবু তার আপনার জন। একমাত্র তিনিই তার দুঃখটা ধরতে পারেন।
বের হবার সময় সে মুরগির মাংস কিনে তাড়াতাড়ি ফিরবে এমন ভাবল।

কিন্তু পথে বের হতেই ওর ভেতরে একটা ভয় লেগে গেল। সে এতক্ষণ ঘরের ভিতর ছিল। ছায়া ছায়া অন্ধকারে বোঝা যায় নি, ওর মুখে মুসুরির মতো দুটো-একটা গোটা দেখা দিচ্ছে। সে এখন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে চাদর গায়ে দিলে পারত। অর্ধেকটা মুখ তবে ঢেকে রাখা যেত। এই গরমে চাদর গায়ে দিলেই অবিশ্বাস বাড়বে। আরে তুমি কি পাগল, চাদর গায়ে, এই সকালের রোদে বের হয়েছ! না কি তোমার জ্বরটর আছে শরীরে! অসুখ হয়েছে তোমার! সে সুতরাং চাদর গায়ে দিতে পারে না। সে প্রায় হনহন ক'রে হাঁটতে থাকল। যদি বলে কেউ, অ সুবল, তোমার মুখে ও-সব কি উঠেছে!

সে বলবে, আর কবেন না কর্তা মুখে আমার ব্রনো উঠেছে।

—এই বয়সে ব্রনো, তুমি কি বাবা রাত জেগে ছোট দিদিমণির হালকা শরীর স্বপ্নে ছাখো না কি?

—ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন! ওদের আমি কাঁধেপিঠে মানুষ করেছি। ওরা আমার....

—ওরা তোমার কি?

সে আর যেন মনে মনে কোন উত্তর পায় না। সে শুধু

হনহন ক'রে হাঁটে। ওকে তাড়াতাড়ি মাংস নিয়ে ফিরতে হবে। মুরগিকে সাধু ভাষায় কি বলে, কুক্কুট। কুক্কুটের মাংস!

সে বাজারে ঢুকলেই লোকগুলি ওর দিকে বেশি ক'রে তাকাতে থাকল। শরীরে কি যে কষ্ট! চোখমুখ ফেটে যাচ্ছে মতো। মনে হয় শরীরটা তার জ্বলে যাচ্ছে, এত বিষ ব্যথা। সে আহা-উহু করতে পারলে কিছুটা আসান পেত। কিন্তু যেভাবে লোকগুলি ওকে দেখতে আরম্ভ করেছে, তাতে তাকে নির্বোধের মতো দেখাচ্ছে। নির্বোধ না হলে এমন মুখ নিয়ে কেউ বাজারে আসে!

সে মুহূর্ত দেরি করল না। যতটা তাড়াতাড়ি পারল, যেন এখন সে বাজার থেকে চুরি করে পালাচ্ছে; হাতে কুক্কুটের মাংস; গায়ে বসন্ত ফুটে ফুটে বের হচ্ছে। এবং এখন মুখে চার-পাঁচটা মাত্র গোটা, একটু বেলা হলেই ওগুলো বেড়ে যাবে সংখ্যায়—সে তাড়াতাড়ি একটা নিমগাছের নিচে এসে দাঁড়াল। কিছু নিমের পাতা পকেটে পুরে হাতে কুক্কুটের মাংস নিয়ে হাঁটতে থাকল। তখন সে দেখল একদল মেয়ে-পুরুষ, হাতে তাদের লাঠি সড়কি, এবং লাল নিশান—ওরা বিপ্লবের ধ্বনি দিতে দিতে চলে যাচ্ছে। ওর ইচ্ছা হল কুক্কুটের মাংস হাতে নিয়ে সেও সেখানে ভিঁড়ে যায়। গনগনে রদ্দুরে ওর শরীরে মুখে যা সব বের হচ্ছে তা বিষের মতো সারা শরীরে গলে পড়ুক। হাফ্-ডেড হয়ে বেঁচে থাকতে আর ওর ভাল লাগছে না। সে দিদিমণিদের মতো ইংরেজি উচ্চারণ করল।

বাড়ির ভিতর ঢুকেই সে সদর বন্ধ করে দিল। দুপাশে নানারকমের মৌসুমি ফুলের চাষ। টবে সুন্দর গোলাপ ফুটে আছে। ব্যালকনিতে হাল্কা পোষাকে লিলি দিদিমণি চুলে ক্রিম মাখছে। অথবা এই যে বাগানে এতসব ফুল ফুটে আছে, বড় রাস্তায় বাসট্রাম যাচ্ছে এবং নির্বোধের মতো মুখ নিয়ে সুবলদা ফিরছে কুক্কুটের মাংস নিয়ে—তার কাছে এসব অর্থহীন। শরীরে

কোমল নীল রঙের এক মৌমাছি কেবল হুল ফোটায়। বড় আকাশ মাথার উপর থাকলেই লিলি দিদিমণির অন্যমনস্ক হতে ভালো লাগে।

সুবল সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠে যাচ্ছে। সিঁড়িতে কি সুন্দর কার্পেট! দুপাশে পেতলের ভাসে সব নানা বর্ণের মানি প্ল্যান্ট এবং পরিচ্ছন্ন সংসার, সুবল হাতে ক'রে মানুষ করছে সব। সে যেতে যেতে দেখল দুটো পাতা শুকনো মানি প্ল্যান্টের, পাতা দুটো ছিঁড়ে ফেলল। সুবলের জন্য এই বাড়িতে কোথাও কুটোগাছটি পড়ে থাকবার জো নেই। সে ঝেড়েপুঁছে সব তকতকে ঝকঝকে ক'রে রাখে। বরাবরের এটা অভ্যাস সুবলের, বাবু অথবা ছোটমা বাড়ি থাকুক আর না থাকুক, সে বাড়ির এইসব মানি প্ল্যান্টের মতো চুপচাপ এখানে দীর্ঘকাল পড়ে আছে। ওর কোনো নালিশ ছিল না। কোনো অসুখ ছিল না, কি যে বিড়ম্বনা হয়ে গেল—এই অসুখ নিয়ে সে এখন কি করবে—তার এত কাজ, শুয়ে থাকলে চলবে কেন, আর সে পরম বিশ্বাসী মানুষ, অসুখ নেই বলে সংসার তাকে নানারকম সুযোগসুবিধা দিয়ে থাকে—সে দুপুরের পর একটু ঘুমোতে পায়। কেউ তখন ওকে জ্বালাতন করে না। কুকুরটা পর্যন্ত ঘরে ঢুকতে ভয় পায়।

দোতলায় বারান্দায় ছোটবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। সে একটু ঘুরে গেল, যেন ওদিকটায় সে ছোটমার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে—কুক্কুটের মাংস, দাম এবং পয়সা এসব সম্পর্কে সামান্য কথাবার্তার জন্যে। সে মুখটা ঘুরিয়ে হেঁটে হেঁটে ছোটবাবুকে পার হয়ে গেল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখতেই মনে হল, ছোটবাবু তাকে তখনও দেখছে। সে একেবারে ছুটে এবার বাথরুমের পাশে যে ঘরটায় এখন লিলি দিদিমণি কাপড় ছাড়বেন তার পাশে গিয়ে ব্যাগটা রেখে দিল। সে আর এই

ঘুপ্‌চি-মতো জায়গা থেকে নড়ল না। দিদিমণির হয়ে গেলে সে একেবারে সায়া ব্লাউজ কাপড় সব ধুয়ে নিচে নেমে গিয়ে শুয়ে পড়বে। নতুবা মাথা ঘুরে পড়ে গেলে সে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে।

ছোটবাবু ব্যালকনির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন—তাঁর মনে হল সুবল কেমন তাঁকে আজ এড়িয়ে চলছে। মুখটা ভার-ভার, লাল্‌চে মতো। যেন কিছু হয়েছে। তিনি আজ ছুটির দিন বলে কোর্টে বের হন নি। বিচারক মানুষ। মনটা সহজেই খুঁতখুঁত করতে থাকল। সে কি কোনো অপরাধ ক'রে ফেলেছে —যা আজকালকার দিন, কিছুই বিশ্বাস নেই, লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছে, ডাকলে কাছে আসছে না, দূর থেকে জবাব দিচ্ছে—চোখ মুখ ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে—কি যে করবেন এখন, কি করলে বিচারকের মতো দৃঢ়তা দেখানো হয়—ভেবে তিনি ডাকলেন, সুবল, সুবল আছিস !

—আজ্ঞে যাই, ছোট হুজুর। বলেই সে এক দৌড়ে দরজার পাশে নিজেকে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। যেন ছোটবাবু ওর ভাসুর ঠাকুর। সে গ্রাম্য বিধবা বৌয়ের মতো জড়োসড়ো হয়ে শরীর ঢেকেঢুকে একপাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে।

সুবলের সহসা এ সংকোচবোধ দেখে ছোটবাবু না হেসে পারলেন না। তিনি বললেন, কিরে তুই ওখানে দাঁড়ালি কেন ?

—আজ্ঞে।

—কাছে আয়।

সুবল নড়ল না।

—তোর মুখটা এমন দেখাচ্ছে কেনরে ?

—কেমন দেখাচ্ছে ছোট হুজুর ?

—কাছে আয় বলছি।

সে আর পারল না। সে হুজুরের পায়ের কাছে একেবারে ভেঙে পড়ল—হুজুর আমার শরীরে গোটা উঠেছে।

কেমন আঁৎকে উঠলেন তিনি! বলিস কি! টিকে নিস নি?

—নিয়েছি হুজুর।

—দেখি মুখটা। বলে ভাল ক'রে আলোতে নিয়ে দেখলেন।

—তুই এই নিয়ে বাজারে গেলি! হাওয়া লাগাচ্ছিস শরীরে!

—হুজুর আস্তে। ছোট মা জানলে কুরুক্ষেত্র করবে।

রাখ তোর কুরুক্ষেত্র! চুপচাপ গিয়ে শুয়ে থাক। মশারি টানাবি। একদম বের হবি না।

—কে একদম বের হবে না! ছোটমা শুনে একেবারে ছুটে এলেন।

—তোমাদের সুবল।

—কেন কি হয়েছে?

—পক্স হয়েছে।

—মানে!

—মানে পক্স। পক্স বোঝ না! মুখে হ্যাখো না—এই সুবল একটু ঘুরে দাঁড়া।

—অমা···তবে কি হবে!

মিলি মায়ের চিৎকার শুনে ছুটে এল। ছোটমা দুহাতে মিলিকে ঘরে ঢুকতে বাধা দিলেন। সর্বনাশ! এখন কি হবে!

মিলি বলল, কি হয়েছে মা?

চোখ লাল ক'রে ছোট মা বললেন, তুমি যাও। যা করছিলে করগে।

মিলি এখন কাপড় ছেড়ে এসেছে। সে স্নান করেছে। শরীরের সর্বত্র ঠাণ্ডা ভাব। চন্দনের গন্ধ শরীরে। চোখেমুখে কমনীয় ভাব। এবার গিয়ে মিলি আয়নার সামনে বসবে। মুখে পাউডার দিয়েথুয়ে বের হলে সে দেখতে পাবে, তার মুখেও গুটি উঠে গেছে!

সে শুনেছে, শুনে ফেলেছে, শুনে ছুটে গেছে লিলির ঘরে, ওঠ দিদি, এখনও তুই গল্পের বই পড়ছিস—কি হয়েছে জানিস না! সুবলদার পক্স হয়েছে!

এই এক ব্যাপার—যেন প্রায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে—ছুটোছুটি, এমন সুন্দর সব মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—আয়নার পাশে দাঁড়ালেই মনে হচ্ছে গুটি উঠে এমন সুন্দর ভালোবাসার জন্য উদাস মুখ এবং এমন চোখের নিচে কাজল সব নষ্ট ক'রে দেবে—এই তিন যুবতী, ছোট মা এই বয়সেও নিজেকে যুবতী ক'রে রেখেছেন—যেন বয়স বাড়ে না তাঁর, মুখে রেখা পড়ে না, কেবল খুকি খুকি, ওলো সখি ভাব—সে যে এখন কি করবে, সুবল ছোট মার দিকে তাকাতে পারছে না—চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এতদিনের বিশ্বাসী মানুষটা। এই বাড়িতে সে এতদিন আছে—কোনদিন কোনো অবিশ্বাসের কাজ সে করে নি, আজ সে যে এটা কি ক'রে বসল! ছোটমার জোরে জোরে পা ছড়িয়ে প্রথম কাঁদতে ইচ্ছে হল। না এখন কাঁদার সময় নয়, একটা বিহিত করতে হবে—কুকুরটা এদিকে নেই—যা লোভ এই কুকুরের, সব মুরগির মাংস না আবার খাবলা খাবলা খেয়ে নেয়—কুকুরটা কোথায় রে?

লিলি বলল, সুবলদার ঘরে।

—ওটাকে ওর ঘর থেকে নিয়ে আয়।

—যাচ্ছি। দূর থেকে জবাব দিল লিলি।

—মাংস ফ্রিজে তুলে রাখ।

—রান্না হবে না মা? লিলি বই ভাঁজ ক'রে চিৎকার ক'রে জানতে চাইল।

—রাখ তোর মাংস। এখন তোমাদের বাঁচাতে পারলে হয়।

—কি আরম্ভ করলে তুমি! ছোটবাবু ধমক না দিয়ে পারলেন না।

—এত বড় সর্বনাশ! আর তুমি বলছ আমি কি করেছি!

—মানুষের তাই বলে অসুখ বিসুখ করবে না !

তাই বলে এই অসুখ যার কোন ওষুধ নেই। যা এত সংক্রামক, বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। সে আর অন্য অসুখ খুঁজে পেল না। এত ক'রে বলেছি বাইরে বেশি সময় কাটাবি না !

—তুমি সর। ওকে যেতে দাও। ওর ঘরে চলে যাক্। বেচারা দাঁড়াতে পারছে না। কাল থেকেই দেখছি কেমন সব সময় লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছে।

—কাল থেকেই হয়েছে! তবে ত সোনায় সোহাগা! সব জজিয়ে এখন তিনি আমায় উদ্ধার করতে যাচ্ছেন।

—তুমি সর বলছি !

—আমি সরছি। কিন্তু সুবল ঘরে থাকবে না।

—তার মানে !

—মানে সোজা। কে ওর পচা গলা শরীর দেখাশোনা করবে !

—কেন তুমি !

—আমি পারব না !

—লিলি মিলি !

—ওদের বিয়ে দিতে হবে না !

—ঠিক আছে আমিই করব।

—এত বুঝি সোজা !

—ছোটবাবু সামান্য হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকলেন। বৌয়ের চোখের দিকে তিনি তাকাতে পারছেন না। ভয়, ভীতি এবং বিস্ময়ে চোখ দুটো কেমন ছোট হয়ে গেছে। তিনি যে দৃঢ়তাটুকু দেখাবেন স্থির করেছিলেন, স্ত্রীর এমন ভয়াবহ চোখ দেখে তা আর দেখাতে পারলেন না। তিনি শুধু ধীরে ধীরে বললেন, ঠিক আছে, এখন তুই সুবল গিয়ে শুয়ে থাক। দেখি কি করতে পারি।

সুবল বলল, ঠিক আছে বাবু। আমার খাবারটা জলটা বাইরের

ঘরে রেখে যাবেন—আমি সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাব। এই বলে সুবল নেমে যাচ্ছে এমন সময় ছোটবৌ ডাকল, সুবল তুমি ও-ঘরে ঢুকবে না।

—আমি কোথায় যাব তবে।

কটা ত দিন। কোথাও গিয়ে থাক। তোমার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই ?

—সে তো সবই জানেন।

—তার জন্যে অসময়ে কোনো আত্মীয়স্বজন থাকবে না সে কি ক'রে হয়! তুমি বরং সুবল, তোমার বিছানা নিয়ে কিছুদিন আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে এস।

সুবল বুঝতে পারল, ছোটমা সাহস পাচ্ছেন না। সে বলল, ঠিক আছে মা। আমি রাস্তায় গিয়ে নিমগাছটার নিচে শুয়ে থাকব।

—সেই ভাল।

—সেই ভাল মানে! ছোটবাবু আর নিজেকে সংযত করে রাখতে পারলেন না। কিন্তু সুবল জানে ছোটবাবু ভীতু গোছের মানুষ। যখন ছোট মা কোনোরকমে পারবেন না—তখন কেমন একটা অসুখের ভান ক'রে বিছানায় সারাদিন শুয়ে থাকেন, চোখমুখ বসে যায় —অদ্ভূত রহস্যজনক এক অসুখ ছোট মা ভিতরে তখন পুষে রাখেন। ছোটবাবুর আর তখন চিন্তার শেষ থাকে না—তিনি আর ছোটমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে সাহস পান না। তখন শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, ভালোবাসার কথা বলেন, পৃথিবীতে এই ছোট বৌ বাদে তাঁর আর কে আছে—একেবারে মলিন মুখ তখন সহসা নির্মল হয়ে যায়। ছোট বৌয়ের ঠোঁটে সামান্য হাসি ভেসে উঠলে তিনি নিশ্চিন্ত। সুতরাং সুবল বুঝতে পারল শেষপর্যন্ত ছোট মা-ই জয়ী হবেন—সে আর দাঁড়াল না—মাদুর বগলে ক'রে রাস্তায় নেমে একটা বড় গাছের উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকল।

সুবল হাঁটতে থাকল। বগলে মাদুর, হাতে একটা পেতলের ঘটি আর ছেঁড়া বালিশ। সে হাঁটছে। খর রোদে ট্রামবাস পার হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার লোকগুলি ওর মুখ দেখে আঁৎকে উঠছে—অথচ কিছু বলছে না—যে যার মতো বাড়ি ফেরার তালে আছে—অথবা অফিসে কাছারিতে গিয়ে গল্প করবে, শালা কলকাতায় আর বসবাস করা যাবে না, রাস্তায় এখন লোকজন মুখে শরীরে পক্স নিয়ে চলাফেরা করছে। মানুষজন যা হয়ে যাচ্ছে—ফুটপাথে বাচ্চা দিচ্ছে, এসব যে দিনেদিনে কি হচ্ছে, কি হচ্ছে শালা—বলে ওরা হয়ত গপ্‌প ক'রে পান খাবে এবং বাড়ি গিয়ে বিবি নিয়ে শুয়ে থাকবে।

সুবল একটা ছায়ামতো জায়গা খুঁজছে। তার আত্মীয়স্বজন বলতে ছায়া মতো জায়গাটা এবং নিচে সে শুয়ে থাকলে গাছের পাতা মুখের উপর ঝরে পড়তে পারে—নিমগাছ হলে ভাল হয়, মারিমড়কের দেবী নিমগাছের হাওয়া সহ্য করতে পারে না। বাড়ির কাছে একটা নিমগাছ আছে, কিন্তু সেখানে শুয়ে থাকলে পাড়ার লোকেরা চিনে ফেলবে এবং ছোটবাবুর ওপর গিয়ে হামলা করতে পারে—সে সেজন্য রেলিং দেওয়া পুকুর পার হয়ে এল, বড় বড় দালান কোঠা পার হয়ে এল, বাগানে নানারকমের ফুল ফুটে আছে, গ্রীষ্মের দিনেও নানারকম ফুল ফোটে—ওর জল তেষ্টা পাচ্ছে। সে হাঁটতে হাঁটতে কম দূর চলে আসেনি! যারাই দেখছে সরে যাচ্ছে। রাস্তায় লাল নিশান হাতে নিয়ে জনগণতান্ত্রিক সরকার গঠনের জন্য একদল মানুষ চেল্লাচেল্লি করছে। সুবল তাই রাস্তা পার হতে পারছে না। ওরা পার হয়ে গেলে, সে ঐ দূরের গাছটা, মনে হচ্ছে গাছটা নিম গাছই হবে, সে গুটি গুটি পা পা ক'রে হেঁটে হেঁটে সেখানে এবার চলে যাবে। কাছেই একটা টিপকল আছে, ডানদিকে চায়ের দোকান, মানুষজনের ভীড় তেমন নেই—নিরিবিলি জায়গাটার জন্যে ওর লোভ বেড়ে গেল। সে জনগণতান্ত্রিকের দলটা পার হয়ে গেলেই সেখানে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। না কি সে ওদের সঙ্গে মিলে গিয়ে এবার

রাস্তায় নেমে পড়বে! এবং বলবে আমি এক হা-অন্নের মানুষ, অসুখ করলে পাপ। ছোট দিদিমণি হালকা পোষাক পরে এখন চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, আর রেকর্ডপ্লেয়ারে রেকর্ড বাজাচ্ছে এবং ডেটল দিয়ে সারা বাড়ি ছোটমা কর্পোরেশনের মেথর ডেকে ধুয়ে দিচ্ছেন। একটা অশ্লীল কথা জিভে এল! সুবল নিজের জিভে গপ্ ক'রে কামড় দিল এবার।

বস্তুত যুদ্ধ আর কোথাও হচ্ছে না। রক্তের জন্য সংগ্রামের জন্য এবং বেঁচে থাকার জন্য ক্রমান্বয় যুদ্ধ চাই। সে তাকাল উপরের দিকে। গরমকাল বলে দরজা জানলা বন্ধ। ভিতরে ঠাণ্ডায় সব বৌ-বিবিরা এখন শরীর ঠাণ্ডা করছে। বাবুরা অফিস কাচারি থেকে ফিরে এলেই আবার ধকল যাবে শরীরে, এখন শুয়ে বসে লম্বা হয়ে শরীর ঠিকঠাক ক'রে নেওয়া—সুতরাং দরজা জানালা বন্ধ, সে সেইসব দরজা জানলার নিচে একটা বড় মতো নিমগাছের ছায়ায় মাদুর বিছাল। হাত-পা ঝাঁ ঝাঁ করছে, কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। কতক্ষণে গড়িয়ে পড়বে। এক ঘটি জল নিয়ে এল সে। মনে হল ওপাশের একটা খুপড়ি মতো ঘরে দুটো রাস্তার ছেলে ওকে দেখছে। সে জল এনে শুয়ে পড়লেই গুটি গুটি সেই দুই রাস্তার বালক পাশে এসে দাঁড়াল। বেশ কৌতুহল নিয়ে ওরা সুবলকে দেখছে। মুখে বড় বড় গোটা, জল নিয়ে একেবারে বেথুন ফলের মতো টসটসে হয়ে আছে। সুবল চোখ বুজে ছিল, টের পায় নি, দুজন নাবালক ওর মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের নিশ্বাসের শব্দ সে যেন টের পেল এবং চোখ তুলে তাকালে দেখল—ওরা ওকে দেখে ফিক্ ক'রে হাসছে!

—তোরা কেরে?

—আমরা? ওরা এইটুকু বলেই চুপ ক'রে থাকল। ওরা যে কে ওরা ঠিক জানে না। সুবলও যেন টের পেল ওরা যে কি ওরা যেন জানে না। সে এতদিন কিন্তু এমন অনেক নাবালক ফুটপাথে পড়ে থাকতে

দেখেছে। তারা কে, কেন এই ফুটপাথে—এমন কথা ওর একবারও মনে হয় নি! মনে হলেও সে ভাবত, কৃতকর্মের জন্য তুমি পাপ ভোগ করছ। কৃতকর্ম! শালা জীবনে কোনো কর্মই করলি না, তোর আবার কৃতকর্ম! সে এবার মুখ বিকৃত ক'রে ফেলল। কথা বলতে ভাল লাগছে না। কেবল চুপচাপ পড়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে এবং আঃ-উঃ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। পরক্ষণেই সে দেখল, ওরা একজন পায়ের কাছে অন্য জন শিয়রে—শালারা কি যমের দূত? সে বলল, এই তোরা কোথায় থাকিস!

ছোট বাচ্চাটি আঙুল কামড়াচ্ছিল। কোথাও না, ওরা কোথাও থাকে না, যখন যেখানে থাকে তখন সেই অঞ্চলটা নিজের বলে ভেবে নেয়। এখন এখানে আছে, সুতরাং বলল, আমরা এখন এখানে আছি।

—জলটল লাগলে এনে দিতে পারবি? তারপরই সুবলের মনে হল, ওর শরীরে সংক্রামক ব্যাধি। মা দয়া করেছে ওকে। সে বলল, এখানে আসবি না। এলে তোদের অসুখ করবে। মারিমড়কের দেবী শালা তোমাদের প্রেমে পড়ে যাবে।

ওরা যেভাবে মাথার কাছে পায়ের কাছে আছে, ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল। ওদের কেন জানি এই মানুষটাকে নিজের লোক বলে মনে হয়। ভাঙা একটা টালির ঘার, আগে কাঠ চেরাই হতো, এখন কিছু হয় না, ঘরটায় ওরা এই ভরদুপুরে শুয়ে থাকে, রাতে এই নিমগাছের নিচে। এখন একটা লোক এসে জায়গাটার দখল নিয়ে নিয়েছে। ওদের আশেপাশে কোথাও একটা জায়গা ক'রে নিতে হবে।

—তোরা সরে যা। দাঁড়িয়ে থাকলে আমার মতো তোদেরও হবে।

—তোমার জলটল আনতে হবে বলছিলে।

—না কিছু লাগবে না, আমাকে ঘুমোতে দে।

ওরা দুজনে এবার ছুটে বেড়াতে থাকল। কোথাও কিছু নেই, অথচ কি আনন্দে যে ছুটছে এই ভরদুপুরে—মুক্ত পুরুষ, শুধু দুটো অন্নসংস্থান, তা এপাড়ায় এসে ওদের এখন চিন্তা করতে হয় না—কারণ সকাল সকাল নানারকমের বাসি খাবার দোতলা-তিনতলা থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, দিনমান ঐ খেয়ে বেশ সুখে দিব্যি চলে যাচ্ছে, স্নান ক'রে আসতে হয়, কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন ভাবটা ভাল নয়, কারণ তখন ওদের দেখলেই বলবে বাবুরা, এই যাবি, কাজ করবি—তাই নোংরা, যতটা পারা যায় শরীর, চোখমুখ, চুল নোংরা ক'রে পড়ে থাকা—তারপর নির্বিবাদী হয়ে দিনমান সম্মুখ সমরে—এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে—যা মুখে মনে আসে আওড়ায়, কারণ বড় বড় পোষ্টারগুলোর লেখা ওরা দুজন কোনো কোনোদিন বাজি ধরে পড়তে বের হয়। কে কতটা পোষ্টার পড়েছে তার একটা প্রতিযোগিতা ওদের ভেতর।

ছোট নাবালকটি বড় বড় চোখে একটা পোষ্টার পড়তে গিয়ে থমকে গেল। বড় মাঠে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হচ্ছে। যে যার মতো এখন চাষ করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে, ফুল ফুটবে, ফল হবে। দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল ক'রে নাও।

সে বড় ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে গেল—একটা ভাঙা পাঁচিলে কে এঁটে দিয়ে গেছে পোষ্টারটি। ওরা দুজনই কোনো অর্থ ধরতে পারল না। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ওরা সেই নিমগাছটার নীচে এসে দেখল, বুড়ো মানুষটি নেই। অ্যাম্বুলেন্স এসে এইমাত্র নিয়ে গেছে! ওরা ভেবেছিল, বুড়ো মানুষটাকে অর্থ জিজ্ঞাসা করবে—কি মানে? এই যে লেখা—বড় মাঠে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হচ্ছে, যে যার মতো এখন চাষ করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে, ফুল ফুটবে' ফল হবে, দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল ক'রে নাও—এসব কথার কি মানে—কারা লিখছে! কেন লিখছে! দেয়ালে দেয়ালে সব নানারকমের আশার কথা লেখা হচ্ছে—কবে থেকে

হবে এটা! ওদের মনে হয়েছিল বুড়ো মানুষটাই একমাত্র এর জবাব দিতে পারে। কিন্তু এসে যখন দেখল নিমগাছের ছায়ায় কেউ নেই, কেবল মাদুর পড়ে আছে, তখন ওরা মনমরা হয়ে মাদুরটা লাথি মেরে সরিয়ে দিল। এবং সারাদিন ঘুরে আর কিছু করতে ভাল লাগল না। গাছের গুঁড়িতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

বোধহয় কলকাতার আকাশে চাঁদ উঠেছে। এই নিরিবিলি গাছটার নিচে শুয়ে থাকলে বোঝা যায় কখনও কখনও কলকাতার আকাশে চাঁদ ওঠে। ওরা ঘুমোচ্ছিল। দুটো একটা নিমের পাতা মাথায় পড়ছে এবং শরীরে মৃদু বাতাস, ওপাশে একটু হেঁটে গেলেই লেকের জল, জলে কত সুন্দরী মেয়ে এখন কবিতা আবৃত্তি করছে। নরম সিল্কের পোষাক, ফুলের মতো ফুটে থাকা সব মেয়ে এবং ছোকরা যুবক, হাফ প্যান্ট পরা বালক ব্রিজের নিচে উঁকি মেরে মাছের খেলা দেখতে দেখতে পৃথিবীটাকে পাশের যুবতীর মতো রহস্যময় মনে করছে—বেঁচে থাকা কি মধুর! তখনই মনে হল কলকাতার আকাশে কোনো কোনোদিন চাঁদ ওঠে, নিমের ছায়ায় অন্নহীন ক্ষুধার্ত বালক ঘুম যায়। এবং রাত দশটা না বাজতে অ্যাম্বুলেন্স ফিরে আসে।

সুবল ফিরে এসেছে। হাসপাতালে চিকেন পক্সের কোনো ওয়ার্ড নেই। সুতরাং নিমগাছের নিচে রেখে আবার শহরের বুকে অ্যাম্বুলেন্সটা পালিয়ে গেল।

ওরা কাতর গলা শুনে জেগে গেল। ভোজবাজির মতো ব্যাপার। ওরা উঠে চোখমুখ ঘসে দেখল, দিনমানে যে মানুষ শালা গাইব হয়ে গেছিল নিমের ছায়া থেকে, সে আবার অধিক রাতে ফিরে এসেছে। ওরা তাড়াতাড়ি উঠে গেল, এই যে দাদু খুব কষ্ট হচ্ছে!

—তোরা!

—আমরা তোমাকে খুঁজছিলাম।

—আমাকে খুঁজছিলি ?

—তা তুমি যে ফিরে এলে !

সে চুপ ক'রে থাকল। কথার জবাব দিল না। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে খুব। তবু বলল, আমাকে খুঁজছিলি কেন ?

তুমি ভাল হলে তোমাকে আমরা এক জায়গায় নিয়ে যাব।

সুবল বলল, বড় ক্ষিদে পেয়েছে রে !

আমাদের কাছে শুকনো রুটি আছে। খাবে ?

—কোথায় পেলি ?

—ঐ যা দেয়। রোদে শুকিয়ে রাখি। খেতে মচ্ মচ করে।

—খাও ! তুমি ভাল হয়ে যাবে।

এমন ক্ষিদে যে সে এখন যা পাবে, পারলে যেন নিম পাতা বেটে সরবত ক'রে খায়। সে এত কাছে এমন দুজন সহৃদয় মানুষ পেয়ে বলল, আমাকে দিলে তোরা খাবি কি ?

—আমরা ঠিক খেয়ে নেব। আমরা ত কোনোদিন উপোস থাকি না। বলে ওরা পুঁটুলি খুলে শুকনো রুটি গুড় এবং একঘটি জল দিল। জ্যোৎস্না নিমের পাতার ফাঁকে জাফরি কাটা। ওরা কাছে এলে বলল, এত কাছে আসিস না। তোরা আমার কাছে থাকলে তোদের অসুখ করবে। তারপর কি আরামে এবং সুখে যেন সে মড়মড় ক'রে মুখে দিতে গিয়ে দেখল জিভে লাগছে। গলায় লাগছে। তবু ক্ষিদের যন্ত্রণাতে সে খেয়ে ফেলল রুটি এবং গুড়। কেমন একটা পরিতৃপ্ত ভাব। সে এবার বলল, আমাকে তোরা কোথায় নিয়ে যাবি ?

—একটা কথার মানে বুঝছি না দাদু।

—কি কথার মানে রে !

—বড় মাঠে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হচ্ছে, যে যার মতো চাষবাস করতে

লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে। ফুল ফুটবে, ফল হবে। দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল ক'রে নাও।

বুড়োর মুখটা কেমন সহসা অতর্কিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, কোথাও এমন কথা আজকাল লেখা হচ্ছে!

—হ্যাঁ দাদু!

—আমাকে নিয়ে যাবি সেখানে? আমি বসে বসে লেখাটা পড়ব।

—তুমি ভাল হলে তোমাকে নিয়ে যাব।

কিন্তু সকাল হতে না হতেই আবার অ্যাম্বুলেন্স এসে সুবলকে নিয়ে গেল। তার আর সেখানে যাওয়া হল না।

গাছের নিচটা আবার খালি। বুড়ো মানুষটিকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে গেছে। ওরা বাসি খাবার সংগ্রহ করতে বের হবে এবার। উঠি উঠি করেও দেরি ক'রে ফেলেছে। আশা ছিল বুড়ো মানুষটিকে নিয়ে যাবে, যেখানে সেই কথাগুলি লেখা আছে সেখানে। কোথায় কোন্ হাসপাতালে নিয়ে গেল ওকে ওরা জানে না। আর দেখা হবে না ভাবতেই কেমন কষ্ট হচ্ছিল ওদের। ওরা চুপচাপ হাতে নুড়ি পাথর নিয়ে ক্রমাগত ঢিল ছুড়ছে কাঁচের জানলাতে।

বড়টি বলল, ফিরে যাবি না?

ছোটটি বলল, আমার কিছু ভাল লাগছে না।

—ভাল লাগছে না কেনরে?

—ওরা ওকে কোন্ হাসপাতালে নিয়ে গেল?

—দাদুর জন্যে কষ্ট হচ্ছে!

ছোটটি হাসল। তারপর শিস মেরে উঠে দাঁড়াল। কষ্ট থাকতে নেই, ঘুরে ফিরে নেচে নেচে সে কোমর দুলিয়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায় হাঁটার সময়ই দেখল, সেই অ্যাম্বুলেন্সটা আবার ফিরে আসছে। ওরা গাড়িটা দেখেই ছুটে এল। এবং ওদের ফের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।

—ওরা তোমায় রাখল না!

সুবল বলল, মাদুরটা বিছিয়ে দে। সে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল।

ওর মুখে ও সারা গায়ে এখন গুটি। এবং ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। সে বলল, আমাকে তোরা কোথায় নিয়ে যাবি বলছিলি ?

—তুমি ভাল হলে নিয়ে যাব।

—আমি ভাল আছি। আজ রাতে নিয়ে চল। কেউ দেখতে পাবে না। রাতে রাতে আমরা সেখানে চলে যাব।

রাতের বেলা, যখন গাড়িঘোড়া আর চলছে না. শেষ ট্রাম চলে গেছে, তখন সে ধীরে ধীরে ওদের দুজনকে নিয়ে হাঁটতে থাকল। এমন একটা কথা আজকাল লেখা হচ্ছে। কোথায় কিভাবে লেখা হচ্ছে—সে উৎসাহে সব কষ্ট ভুলে যাচ্ছে। দিনমানে জায়গা বদল ক'রে নাও। ওরা বড় রাস্তা পার হয়ে একটা পার্কের পাশ দিয়ে হাঁটতেই যেন সুবল তার পরিচিত পথের সন্ধান পেল। এই পথে সে রোজ কুক্কুটের মাংস কিনতে বাজারে যায়। গরীবের অসুখ হতে নেই। অসুখ হলে হাসপাতালে জায়গা থাকে না। বার বার একটা অ্যাম্বুলেন্স ওকে নিয়ে কপট আরোগ্য কামনায় ছোটাছুটি করে।

বাড়িটা সে চিনতে পারল। বোগেনভেলিয়ার অশান্ত শাখাপ্রশাখা ঝুলছে। এত রাতে শুধু লিলিদি জেগে আছে। বাড়ির সেই নতুন হলুদ রঙের দেয়ালের নিচে ওরা তিনজন হাঁটু মুড়ে বসল। রাস্তার আলোতে স্পষ্ট সেইসব শব্দগুলি চোখের উপর নাচতে থাকল। কুকুরটা বুঝি টের পেয়েছে। ব্যালকনিতে চিৎকার করছে। ওরা তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে পেছনের দেয়ালটায় চলে গেল। এবং রাতে রাতে ওরা এইসব দেয়ালের চারপাশে লিখে বেড়াতে থাকল—বড় মাঠে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। যে যার মতো চাষবাস করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে, ফুল ফুটবে, ফল হবে। দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল ক'রে নাও। ওরা সেই লেখা দেখে দেখে কেমন উদ্দীপ্ত হল এবং নিজেরা লিখতে আরম্ভ ক'রে দিল।

ওরা দেখল চারপাশের সব জানলা দরজা ভয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যা কিছু ঐশ্বর্য, সুখ এবং প্রেম ভালোবাসা মানুষের কাছ থেকে চুরি

ক'রে শুকনো বাঘ অথবা হরিণের মাথার ভিতর ওরা পুরে রেখেছিল, দেয়ালে দেয়ালে এখন সেইসব বাঘের মুখ আস্ত বাঘ হয়ে লাফিয়ে পড়ছে। হরিণেরা দ্রুত দৌড়ায়। কিন্তু বাঘের থাবাতে হরিণের মাংস এবং কলিজা এবার খসে খসে পড়বে।

এইভাবে যবে হাজার লক্ষ মানুষের হাহাকার সমস্ত রাজপথ দীর্ণ করবে তখন এক অলিখিত চুক্তি হবে,—আর শাদা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে কেউ ঘোরাফেরা করবেন না। এবার ভিতরে ঢুকে পড়ুন। এবং রক্তের ভিতর যে রঙ খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে অস্বচ্ছ আলোতে তাকে দেখে ঘাবড়ে যাবেন না! নিয়মমাফিক আমাদের জানা আছে সূর্য পূবদিকে ওঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায়।

তারকজীবন লাহিড়ীর আত্মদর্শন

অভ্র রায়

হাতের তাবিজটা ঢিলে হয়ে ঝুলতে ঝুলতে প্রায় কনুইয়ের কাছে চলে এসেছিল। কালো সুতোয় বাঁধা ঝুলন্ত তামার খোলটাকে খুব কুৎসিত লাগছিল দেখতে। রিণাকে আসতে দেখে সুতোর মধ্যে আঙ্গুল গলিয়ে ওটাকে যতদূর সম্ভব টেনে ওপরের দিকে তুলে আনবার চেষ্টা করল তারক। বাঁধবার সময় বেশ শক্ত করেই বেঁধেছিল কিন্তু সুতোটাই একদিনে আরও ঢিলে হয়ে গেল—নাকি তার হাতটাই শুকিয়ে কাহিল হল, কে জানে। নাকি শালা নিজের থেকেই লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়তে চায় ওটা !

শার্টের হাতার ভাঁজ খুলে আরও এক পাট নামিয়ে কনুই পর্যন্ত বেশ করে ঢেকে দিল সে। তারপর চোখে মুখে একটা বেশ উদাসীন অথচ স্মার্ট ভঙ্গি ফোটাবার চেষ্টা করল। যেন ব্যাপারটা কিছুই না—এমন একটা ভাব করে পকেট থেকে প্যাকেট বার করে সিগারেট ধরাল। যদিও মাথার জ্বালাধরা ভাবটা এখনও ঘাড়ের শিরা বেয়ে বুকের মধ্যে এসে দম আটকে ধরছিল মাঝে মাঝে—তবু তারক সে সব গ্রাহ্যই করল না এখন। রিণার দিকে তাকিয়ে চোখে মুখে বেশ একটা আবেশ, একটু হালকা হাসির অভ্যর্থনাই আপাতত জরুরী মনে হল।

'এই—কতক্ষণ এসেছ? অনেকক্ষণ?' দূর থেকেই প্রশ্নটা মুখে করে এগিয়ে এল রিণা। ভুরুর দু'পাশে, চোখের কোলে, ঠোঁটের ওপরকার হালকা রোমশ রেখা জুড়ে ঘামের কণা চিক চিক করছিল। হয়তো অফিস থেকে বেরোবার আগে সে টয়লেটে ঢুকে এক দফা প্রসাধন সেরে এসেছে। কাঁধ-হাতা, নাভি খোলা চোলি আর সেই রঙের ছাপানো শাড়ি আঁট করে পরা রিণার চোখে কটাক্ষ।

'তা, বেশ অনেক্ষণই হল; আমি ত ভাবছিলাম হয়ত এলেই না শেষ পর্যন্ত' শৌখিন'-মেজাজে একরাশ সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে জবাব দিল তারক। বুক থেকে একটা ঘড়ঘড়ে কাশি গলার কাছটায় উঠে আসছিল, অনেক কষ্টে সেটাকে গিলে অল্প করে একটু হাসল।

'আসব না মানে? এমন কিছু দেরী হয়নি আমার, ছ'টায় বলেছিলাম এখন ছ'টা কুড়ি, তাতেই অধৈর্য্য? মনে মনে খুব গালাগাল দিচ্ছিলে নিশ্চয়!' কেমন একটা নাচের কায়দায় শরীরটা কাঁপিয়ে রিণা বেশ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে হাসল।

গলার মধ্যে এক রোখা কাশিটাকে চাপা দেবার জন্যে তারক খুব সন্তর্পণে তার পকেট থেকে দুটো-তিনটে লবঙ্গ একসঙ্গে মুখের মধ্যে চালান করে দিল। তারপর কিছু না ভেবেই হঠাৎ বলল, 'আজ তোমার অফিসে ফোনটা কে ধরেছিল বল ত?'

'কেন? কেউ ধমক দিয়েছে বুঝি?' রিণা হাসল, 'তা একস্‌টারনাল কল্ এলে আমাদের চারু বোস একটু-আধটু ক্রস্ করে দেখে বাপু। ওই ত আমাদের সেকশানের গার্জেন। অবলা সম্প্রদায়কে একটু কে আর চোখে চোখে না রাখতে চায় বল।'

'আরে না না, কেউ ক্রস করেনি—কেমন যেন ফিসফিস করে ঠাট্টার সুরে কথা বলছিল কে একজন, কোনও মেয়ের গলা। তোমাদের চারুবাবুকে আমি চিনি, সে নয়—'

'তুমি চেনো চারুবাবুকে? কই কখনো বলোনি ত? কী করে তোমার সঙ্গে চেনা হল?' রিণা বেশ অবাক চোখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কী মুশকিল রে বাবা! চারুকে চিনলে এত জবাবদিহি করতে হবে জানলে কোন শালা তার নাম করত। কোথায় এই সন্ধ্যের ফুরফুরে হাওয়ায় একটু আরাম করে নিঃশ্বাস টানবো, সারাদিনের জমানো অস্বস্তি যন্ত্রণা-ফন্ত্রণা ছেড়ে শরীরটাকে একটু ঝালিয়ে নেব, অন্ধকার-টার দেখে একটু প্রেম বিনিময় ইত্যাদি, তা না বসে বসে সেই বুড়ো মর্কট চেরোর পিণ্ডি চটকাও এখন। ধুত্তোর ছাই....

'আরে, চিনি মানে—দূর থেকে দেখেছি একদিন, আলাপ-টালাপ নেই। তোমার বন্ধু সেই মিস না মিসেস সরকেল সেই দেখিয়েছিল চারুবাবুকে। তোমার ছুটির মধ্যে একদিন পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে সরকেলের সঙ্গে দেখা সেই ত' বলল তোমার শরীর খারাপ, বাইরে গেছ ছুটি নিয়ে। বলল, একটা উপকার করুন না আমার; একটা দামী ঘড়ি আনিয়েছিলাম ফরেন থেকে, কিন্তু ইদানীং বড় ট্রাবল দিচ্ছে ঘড়িটা। বার দুয়েক একটা দোকানেও দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুতেই রেগুলেট করা যাচ্ছে না। আপনার ত শুনেছি এ লাইনে খুব নাম, দেখুন না একটু চেক করে, কিছু পার্টস ফার্টস ম্যানেজ করল নাকি দোকানটা। হাঁটতে হাঁটতে এসে ট্রাম ধরল সরকেল, সেখানেই দাঁড়িয়েছিল তোমাদের ও, এস চারু বোস।'

'ও তাই বল, এত ব্যাপার হয়ে গেছে তলে তলে। কিন্তু সরকেলের ত' এসব বলা উচিত ছিল আমায়, এদিকে ত' এটিকেট আর ম্যানার্সের গুমোরে মাটিতে পা পড়ে না ওর, দাঁড়াও কাল ধরব ওই ধুমসীকে।'

হায় ঈশ্বর! এখনও জেলাসি-ফেলাসির মত তুচ্ছ জিনিস আছে নাকি তোমার? নাকি ওই ছলনা দিয়ে আমায় মজাতে চাও? মহিমা অপার সরকেলের, আমার মত অভাজনকে যদি সে একটু কৃপা কোনদিন বিলিয়েই থাকে তবে সে ত' তার লীলা মাত্র। সরকেল

কি সধবা না কুমারী? না কি বিধবা? কিছুই তো বোঝা যায় না চেহারা দেখে। মাথায় ত' শ্যাম্পু করা চুল ফুলিয়ে প্রায় ঝাঁকা মুটের মত এক বিরাট বাবুই পাখির বাসার নকশা, শেষ বিন্দুতে যার সেঁদিয়ে থাকে এক প্লাসটিকের বেলকুঁড়ি। আহা রে—যৌবন যেন ফুটি ফুটি ফোটে না। আর মুখখানা বুঝি বাসা থেকে বেরিয়ে পড়া বাবুই পাখি! সিম্বলটা ত' ভালই, কিন্তু সেই নীড়ে বসা পাখির চোখে মুখে কি রঙের বাহার! আর রক্তমুখী সেই বদন বিহঙ্গের ঢলানীই বা কত: পার্কষ্ট্রীটের রেঁস্তেরায় বসে মেমসাহেবী কায়দায় বলেছিল, 'য়ুড য়ু লাইক টু হ্যাভ সাম ড্রিংকস?'—কিন্তু পয়সাটা কে দেবে সোনা, তাত জানি না। 'না, না শুধু চা'—সরকেলের সেই দশাসই গতরটা দুমড়ে মুচড়ে এক অভিনব তির্যক ভঙ্গিতে বসে ছিল সামনে। অনেকদিন পরেও একদিন দেখেছিলাম সে অমনি ভঙ্গিতে একটা মাথা কামনো গেঞ্জীপরা জোয়ান লোককে জাপটে ধরে তার স্কুটারের পিছনে বসে ময়দানের দিকে ছুটছিল।

'এই কি এত ভাবছ তুমি?' তারকের গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রিণা বলল।

'কই না। মাথাটা একটু ভারি ভারি লাগছে যেন।'

'সেই ব্যথাটা? কষ্ট হচ্ছে খুব?'

'একটু আগেও হচ্ছিল, এখন তেমন নেই।'

ডান হাত দিয়ে রগ দুটো একটু টিপে ধরল তারক, কিন্তু সড়াৎ করে হাতাটা নেমে কবচটার কাছকাছি পৌঁছে যেতেই তাড়াতাড়ি হাত নামিয়ে নিল সে।

'কতবার তোমায় বললাম, চোখটা একবার দেখাও; তাকি একবারও তুমি গ্রাহ্য করলে?'

'চোখটা না মাথাটা?' তারক হাসল।

একদিকে রবীন্দ্রসদন, একদিকে ভিক্টোরিয়া, মাঝের মাঠটা দিয়ে ময়দানের দিকে যাচ্ছিল ওরা। ধু-ধু রেসকোর্স আর ময়দানের

খোলা হাওয়ায় এখন বেশ আরাম লাগছিল তারকের। একটু আগেও যে যন্ত্রণাটা মাথার মধ্যে বুকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল তা এখন অনেকটা ফিকে হয়ে এল। সেই অস্বস্তিকর যন্ত্রণার মধ্যে সে কখনো কখনো তার শ্বাসকষ্টটা টের পায়। এ সময় সাধারণত কোন কৌতুহল উদ্দীপক দৃশ্যে বা কোনো প্রাকৃতিক ইচ্ছার তাড়নায় সে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে।

আর একটু এগোলেই বিড়লা প্লানেটোরিয়াম, ওখানটায় ভিড়, সারি সারি গাড়ির মিছিল, আলোয় আলোয় এ পাশের অন্ধকারটাও পাতলা। শুধু সেন্টপল্স্ চার্চের মুখোমুখি এই গাছগুলোর আড়ালে বেশ অন্ধকার। এইখানটায় দাঁড়িয়ে রিণাকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খাবার কথা ভেবে রেখেছিল সে। হাত বাড়িয়ে রিণাকে আকর্ষণ করে তার গালে মুখ ঠেকাল তারক। 'এই অসভ্য, মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে,' কেমন একটা আঁশটে গন্ধের ঝাঁজে গা ঘুলিয়ে ওঠে। চুমু খাবার ইচ্ছেটা আপাতত দমন করে সে তার হাতটা রিণার খোলা কোমরে আলতো করে ডলতে থাকে। একটা আধবুড়ো লোক তাদের দিকে চোখ রেখে হেঁটে যাচ্ছিল, কি যেন আঁচ করে লোকটা ঝুপ করে ফটোগ্রাফারের ভঙ্গিতে একটা গাছের অন্ধকারে বসে পড়ল।

'এই তোমার মা কেমন আছেন?' রিণার গলাটা একটু ধরা।

'এক রকম ভালই, আগে রাত্রিতে দেখতে পেত না, এখন দিনেও পায় না।'

'কী মানুষ গো তুমি—একটা কিছু ব্যবস্থা কর তাহলে।'

তাতে কি তোমারও কোন সুরাহা হবে সখি? মা যে তোমার মুখ দেখলে ভেতরটাও দেখতে চাইবে। তাই তুমি চাও? ভেতরটা খুলে কে দেখাতে চায় বল? যদি সম্ভব হয় অন্ধ শাশুড়ীই ত' তোমার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ। অনেক কষ্টে—অনেক ধার দেনায় ডুবে পদ্মার বিয়ে দিয়েছিলাম। ছুটো বাচ্চার হাত ধরে আর একটা

পেটে করে বিধবা পদ্মা ফিরে এসেছে। বিছানায় হামাগুড়ি দিয়ে প্রায়ই আমাকে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে কাটা পশুর মত ছটফট করতে হয়। অন্ধ হওয়া ছাড়া আমার মার বেঁচে থাকবার আর কি কোন উপায় ছিল? এসব কথা ভাবতে গেলেই সেই অস্বস্তিকর যন্ত্রণাটা আমার সমস্ত অনুভূতিগুলোকে আচ্ছন্ন করে অসাড় করে নিয়ে আসে। শুধু রক্তের মধ্যে আছে এক ঘুমন্ত সাপ। তারই দংশনে আমি আর্তনাদ করে জেগে উঠি মাঝে মাঝে······

'ব্যবস্থা? ব্যবস্থা আর আমি কি করব বল? ডাক্তার বলেছে অপারেশনে ভাল হতেও পারে, নাও পারে। তা ছাড়া মা এই শেষ সময়ে কোন রকম কাটা ছেঁড়াতেই নারাজ। মা রাজী থাকলে না হয় যেভাবে হোক টাকার যোগাড় করে একবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু ভাল হবার গ্যারান্টি নেই, মার অনিচ্ছে এ ভাবে—'

'না তা ঠিক—সত্যিই একটার পর একটা বিপদ যাচ্ছে তোমার। বোন দুটোর বিয়ে দিলে এবার কোথায় একটু শান্তিতে সংসারটা গুছিয়ে বসবে তা না। শরীরটাও তোমার বেশ খারাপ হয়ে পড়ছে দিনদিন।'

বস্তুত বাইরে থেকে তারকের শারীরিক অবস্থা সঠিক আন্দাজ করা এখনও বেশ শক্ত। একটা লম্বা, রোগা, তীক্ষ্ণ চেহারার মানুষ। শিরাবহুল পাকানো হাতদুটো নিয়ে সে যখন ডালহৌসী কিংবা টালিগঞ্জের বাসের হাতল ধরে ঝোলে তখন মনে হয় যেন অনেকগুলো লম্বা নীল রঙের জোঁক তার চামড়ার নীচে টান টান হয়ে ফুলে উঠছে। যেন অদৃশ্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে সে বাড়ি কিংবা অফিসে চলেছে। সে ঘড়ির দোকানের মেকানিক, ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ঠুলি পরে পরে তার ডান চোখের চারদিক ঘিরে একটা কালচে ছোপ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় চোখের কোন গোলমাল আছে বুঝিবা। ঈষৎ লাল রঙের ফুলো ফুলো তার চোখটা যেন গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। তবু

তার চেহারায় কোথায় যেন একটা আকর্ষণের কেন্দ্র আছে। গমের মত বাদামী গায়ের রঙ চল্লিশে এসেও তার জৌলুস হারায়নি। হাসলে তাকে এখনো বেশ সুন্দর দেখায়। যদিও সে সময় আপাত-দৃষ্টিতে ডান চোখটায় একটা চাপা বিদ্রুপের ভঙ্গি ফুটে ওঠে কিন্তু কাছ থেকে নজর করলেই বোঝা যায় আসলে সেটা অসহায় একটা অস্থিরতা মাত্র। বোধ হয় সেটাই তার একটা বিশেষত্ব, একটা আকর্ষণের হেতু।

তবে ইদানীং সে বড় দুর্বল, বড় বেশি অসুস্থ। শীতকালে এক নাগাড়ে সর্দি কাশি আর শ্বাসকষ্টের সঙ্গে তার প্রায় স্থায়ী সম্পর্ক হতে চলেছে। ডাক্তার বলে এটা ঠিক হাঁপানী নয়, তবে অনেকটা —সেই রকমই একটা ব্যাপার। তারক জানে, আসলে এটা ঠিক তাই এবং এ আর তাকে ছাড়বে না। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পড়ে থাকতে হয় তাকে। এবার হয়ত চাকরি থেকেও জবাব পেয়ে যাবে একদিন। কিন্তু কি করা যাবে! ডাক্তারী ওষুধে আর বিশ্বাস নেই তার। আপাতত কলিগ কর্মকারের বাতলানো টোটকা-ফোটকা দিয়ে যাবতীয় উপসর্গ নিরাময়ের চেষ্টায় আছে। এতে না সারলেও পয়সা ঢালবার ব্যাপার নেই, অযথা হুজ্জুতি হয়রানিও নেই। আর তাছাড়া ডাক্তারকে ক'টা রোগের কথাই বা বলে বিশ্বাস করানো যায়? বিকেলের দিকে মাথায়, চোখে, ঘাড়ে দেখা দিয়েছে এক নতুন উপসর্গ। এক অস্বস্তিকর যন্ত্রণা টনটন করে দোল খেতে খেতে তার সারা শরীরময় ঘুরে বেড়ায়। চোখের ঠুলি খুলে, হাইপাওয়ারের বালবটা নিবিয়ে দিয়ে টেবিলে মাথা রেখে সে শুয়ে থাকতে চায় খানিকক্ষণ। চোখের সামনে যেন কতকগুলো নিয়নের শূককীট ভেসে বেড়ায়, কখনো সাবুদানার মত স্ফুলিঙ্গ। দেখে শুনে কর্মকার বলে, ব্রাদার একটু ভাল খাওয়া-দাওয়ার চেষ্টা কর, ওষুধে কিছু হবে না। মাঝে মধ্যে একটু ফ্রুটস-ট্রুটস খাও দিকি।

তারক হাসে তারপর এক সময় ঘড়ির বাক্সের ডালা বন্ধ করে

বেরিয়ে পড়ে। এলোমেলো রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, বাড়ি গেলে কষ্টটা ফিরে আসবে মনে করে সে কেবলি অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করে। লোকজন, গাছগাছালি, বিজ্ঞাপন, মেয়েছেলে, মিছিল এইসব দেখতে দেখতে ময়দানের দিকে আসে।

হাঁটতে হাঁটতে কখনো চিনেবাদাম চিবোয়, মাঠে দাঁড়িয়ে ফুটবল খেলা দেখে, ভাঁড়ের চা কিনে খায়, রিণার দেখা পেলে গল্পগুজব করে, চুমু খায় তারপর একসময় গুটি গুটি বাড়ি ফিরে যায়। ভাল লাগে না কিছুই। অথচ তবু সব কিছু ভাল লাগাবার প্রাণপনে চেষ্টা করে যায় সে। মাঝে মাঝে কত কী ইচ্ছে করে। কিন্তু কিছুই হয় না। শরীরটাই কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে দিনকে দিন।

তুলনায় রিণার চেহারায় বেশ একটু পরিবর্তন চোখে পড়ে এবার। একটু যেন মোটা আর বয়স্ক হয়ে ফিরে এসেছে সে। সুন্দরী অবশ্য তাকে কোনদিনই বলা যায় কি না সন্দেহ। শরীরের তুলনায় মুখটাই বরং কালো, মোটা নাকটার দুপাশে মেচেতার ছাপ রুজপাউডারেও সবটা ঢাকা পড়ে না। হালে চুল পাতলা হয়ে আসায় য়ুইগ লাগিয়ে সুকেশী হয়েছে সে। আর চোখে মুখে একটা শুকনো মিয়োনো ভাব চাপা দেবার জন্যেই বুঝি ইদানীং তার পোষাকআসাক বেশ উগ্র। তবে হ্যাঁ—রিণার শরীর এই শেষ যৌবনেও যথেষ্ট প্রগলভ, সুডোল গড়নে এখনও পর্যাপ্ত মাদকতা। পাশাপাশি চলতে চলতে তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে তারকের।

ভিক্টোরিয়া। রাস্তায় মাঠে থিকথিক করছে ভীড়। মেয়ে পুরুষ, কাচ্চাবাচ্চা, কুকুর, ট্র্যানজিসটার, ফুচকাওয়ালা, পাহারাঅলা, শিকারী মেয়েছেলে, টাউট সব মিলিয়ে চারদিক গমগম করছে যেন। গোটা মাঠটা জুড়েই যেন মেলা বসেছে। কলজে ভরে নিঃশ্বাস টানছে এক দঙ্গল প্রেমিক-প্রেমিকা। ওদিকে রেড রোড ধরে সারি সারি

ফ্লাড লাইট, আলোর মিছিল। দেখতে দেখতে কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছিল তারকের দৃষ্টি, কুয়াশার মত আলো, রামধনুর মত একটা রঙ, ঘাড়ের শিরার মধ্যে চিনচিন করে একটা ব্যথা—দাঁড়িয়ে পড়ে একবার হাঁ করে নিঃশ্বাস টানল সে। তারপর আঙ্গুল মটকে, চোখ ছুটো কচলে খুব স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। মিনি স্কার্ট পরা ফুটফুটে এক অ্যাংলো যুবতী তার সামনে দিয়ে এক ছোকরাকে বাগিয়ে শরীরে ঝিলিক তুলে এগিয়ে গেল।

'কি—বসবে নাকি একটু?' তারক রিণার দিকে তাকাল। মাঠের মধ্যে বেশ এক জোড়া সুখী প্রেমিক-প্রেমিকার মত বসে আরাম করে নিঃশ্বাস টানতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

'না, আজ থাক, চল না, আর একটু হেঁটেই যাই—ভাল লাগছে না তোমার?' তারকের বুকের সঙ্গে মাথাটা ঠেকিয়ে আছুরে গলায় বলল রিণা।

'চল—'রিনার কোমরটা আলগা ভাবে জড়িয়ে ট্রামলাইন বরাবর রাস্তাটা ধরে এগোতে থাকে তারক। একটা সিগারেট খেতে খুব ইচ্ছে হলেও সে আপাতত ইচ্ছেটাকে দমন করল। কারণ রিণার স্ফীত নিতম্বের উত্থানপতন এ সময় তার হাতটাকে মৃহুভাবে আঘাত করছিল। কেমন একটা মৃদু শিহরণ, একটা মৃতপ্রায় উত্তেজনার স্বাদে আশ্বস্ত হচ্ছিল সে।

প্রায় তার কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে রিণা বলল, 'এই, এমনিভাবে আর কতদিন কাটাবে? সংসারের কথা ত' অনেক ভাবলে, এবার নিজের লাইফের কথাও একটু ভাবো।'

বাতাসের বেগটা বাড়ছিল। একটু ঠাণ্ডার আমেজ মেশানো বাতাস, দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে বোধ হয়। রিণার শরীরের একটা সুগন্ধ, কখনো মৃহু, কখনো উগ্র হয়ে তার নাকে আসছিল। বুক ভরে নিঃশ্বাস টানল তারক। ভালই লাগছিল এখন। মাথাটাও যেন বেশ হালকা। বাতাসের ঝাপটায় সারি সারি গাছগুলোর পাতায়ও

যেন এক তৃপ্তিকর উত্তেজনা। চুলকে দেবার ভঙ্গিতে তার হাতের তাবিজটা একবার আলতোভাবে পরখ করে দেখতে চাইল তারক। তারপর কি ভেবে জামার ওপর থেকেই পাকিয়ে পাকিয়ে ওটাকে আরও একটু ওপরে তুলতে চাইল। কিন্তু সুতোর সঙ্গে উল্টো হয়ে একটা লোম জড়িয়ে গিয়ে হঠাৎ রিরি করে উঠল জায়গাটা। যেন আচমক। ক্ষুদ্র এক বিষাক্ত পোকা তার হুল ফুটিয়ে দিল। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা হজম করে সে সিগারেট জ্বালাল একটা। সামনেই টাটার আকাশছোঁয়া বাড়িটা যেন এক অলৌকিক আলো বিকিরণ করছে। অবশেষে সেইদিকে তাকিয়েই বিড়বিড় করতে করতে এক সময় জবাব দিল তারক।

'বেশ ত' আছি। এমনি করেই না হয় কাটিয়ে দিলাম এই ট্রিপটা—'

তুমিও ত বাবা বেশ আছ। চাকরী আছে, বন্ধু বান্ধব, ফুর্তিটুর্তিরও খুব একটা অভাব নেই, সাংসারিক দায়িত্বের কোনো বালাই নেই— এমন নির্ভাবনার স্বাধীন জীবন কী সুখের লোভে ছাড়বে? ইনসিওর আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড দিয়ে ত' জীবন মৃত্যু দুটোকেই চোখে চোখে রেখেছ। তবে কেন সাধ করে দেখতে চাও তোমার স্বামী দেবতা নামক জনৈক ব্যক্তি নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টায় হাত পা ছুঁড়ে গলদঘর্ম হয়ে উঠছে, বিধবা পদ্মার আক্রোশভরা দৃষ্টি কী এক অজানা আশঙ্কায় তোমার সারা দেহে হুল ফুটিয়ে যাচ্ছে, তোমার অন্ধ শাশুড়ী মুখদর্শনে বঞ্চিত থেকে তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে তোমার নাড়ী নক্ষত্রের ইতিহাস জেনে নেবার চেষ্টা করছে....

'তুমি আজকাল মাঝে মাঝে এমন সব অদ্ভুত এক একটা কথা বল শুনলে যেন ভয় করে আমার। এমনভাবে কেউ সারাটা জীবন কাটাতে পারে নাকি? নাকি কাটাবার কোন মানে হয়?'

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ হাত ব্যাগটা খুলে উৎফুল্ল হয়ে রিণা বলল, 'এই তোমাকে একটা খবর দেওয়া হয়নি। দাঁড়াও,

এসেই খবরটা দেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু তুমি যা গুম মেরে আছ আজ।' ব্যাগ হাতড়ে একখানা টাইপ করা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই দেখো।'

ট্রাম লাইনের আলোর কাছে সরে এসে তারক পড়ল রিণার প্রমোশনের সংবাদ। আগামী মাস থেকে সে সিনিয়ার গ্রেডে উন্নীত হবে। কিছু টাকা ধার চাইবে বলে তারক আজ অনেকক্ষণ থেকেই সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু ঠিক এখনি কথাটা বলতে গিয়েও আটকে গেল। একটু হেসে বলল, 'ব্রাভো! আমি এ জানতাম, তোমার মত ট্যালেনটেড ওয়ারকারের প্রমোশন আরো আগেই হওয়া উচিত ছিল। যাক্, ভালই হল, চাকরী-বাকরী গেলে এবার তুমিই একটা বলে কয়ে জুটিয়ে দিতে পারবে। চল, আজ তোমাকে মিষ্টি খাওয়াই।'

'না না, সেকি? আজ আমার খাওয়াবার দিন। চল, আজ যা খেতে চাও তোমাকে পেটপুরে খাওয়াব।'

'বাঃ তোফা, কিন্তু বামুনের ছেলেকে অতটা প্রশ্রয় দেওয়া কি ঠিক হবে? শেষে হয়ত পস্তাতে হবে।'

'পস্তাই আমি পস্তাবো, তোমাকে দেখতে হবে না মশাই'—হাসি আর আনন্দের ছটায় বেশ উজ্জ্বল দেখাল রিণার মুখ।

লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মোড়ে একটা রেস্টুরেন্টের কেবিনে বসল ওরা। বেশ সাজানো ঝকঝকে দোকান। ঘরের চাপা হাওয়াটায় যেন একটু গুমোট। পকেট থেকে সিগারেট বের করতে গেল তারক, খালি, সিগারেট নেই। টেবিলের কাচের ওপর ঝুঁকে ছাপানো মেনুটা পড়তে পড়তে শুধলো রিণা, 'কি খাবে বল?' রিণার শরীরের চাপে সোফার স্প্রিং কতখানি নেমে যায় এবং নড়লে চড়লে কতখানি ওঠানামা করে এবং সেই ওঠানামায় তার নিজস্ব অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় কিনা সেইটাই আপাতত মনোযোগ দিয়ে দেখছিল

তারক। মাথার মধ্যে সেই ঝিমঝিমে ভাবটা আবার যেন নড়াচড়া করছিল। মাথা নীচু করেই জবাব দিল, 'লস্যি—তেষ্টা পেয়েছে ভীষণ।'

বেয়ারা সরবত দিয়ে গেল। অনেকটা আধশোয়া ভঙ্গিতে রিণার গায়ে প্রায় হেলান দিয়ে সরবতে চুমুক দিল তারক। এ সময় বেশ আরাম করে একটা সিগারেট টানতে পারলে ভালো হত, কিন্তু এ দোকানের বেয়ারাকে দিয়ে সিগারেট আনানো উচিত হবে কিনা তাই ঠিক করতে পারছিল না সে। একটুখানি খেয়ে স্ট্র-টা মুখ থেকে খুলে গ্লাসের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে রিণা বলল, 'আচ্ছা, এভাবে থাকতে তোমার ভাল লাগে? খালি খালি লাগে না?'

'মোটেই না, কোথায় খালি? তুমি ত আমার পাশে অর্ধেকেরও বেশি জায়গা জুড়ে বসে আছ—' রিণার কাঁধের কাছে মাথাটা এনে শব্দ করে হাসল তারক।

'আবার ঠাট্টা হচ্ছে ছেলের! তাও যদি বুঝতাম একটু টান আছে।' রিণা ভ্রুভঙ্গি করে। তাকে দুহাত দিয়ে কাছে টানে তারক। ঘাম জবজবে শরীরটার তীব্র গন্ধ যেন নিঃশ্বাসের পথ আটকে দেয়। তবু তাকে জড়িয়ে ধরে খুব আবেগ ভরা গলায় সে ফিসফিস করে বলে, 'বাড়ি থেকে কি খুবই তাড়া দিচ্ছে রিণ?'

'বাড়ি? বাড়ি বলতে আমার দাদা? সে ত এখন বাড়ি করার ফিকিরেই সারাক্ষণ মশগুল হয়ে আছে। যতদিন সংসারে থেকে মাস গেলে মাইনের টাকা হাতে এনে দিই, বাচ্চাগুলোকে কাড়ি কাড়ি জামা, ফ্রক কিনে দিই ততই তার পক্ষে ভাল। সব আসলে স্বার্থপর এ সংসারে। এক এক সময় ভাবি, ধুর—চলে যাই কোন হোস্টেলে মোস্টেলে—'

'ঠিকই বলেছ—আমাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই, সবই ফাঁকা —অসার। আমারও মনে হয় এক এক সময়, ধুর সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাই কোথাও।'

'তোমার কথা আলাদা, তুমি পুরুষ, একটু শক্ত হলে তুমি কিনা পারো ?' রিণা তারকের হাত ছাড়িয়ে সোজা হয়ে বসল।

কী পারি ? তোমাকে বিয়ে করতে ? হয়ত পারি। কিন্তু তারপর শক্ত হয়ে বেঁচে থাকতে পারি কি ? অথবা আমি কি এখনি বেঁচে আছি নাকি ? একে বাঁচা বলে না। তোমার দেখবার চোখ নেই। থাকলে দেখতে, আমি অনেকদিন আগেই মরে গেছি। শুধু রক্তবীজের বংশধর কতকগুলো অসুখ, উপসর্গ আর কটু বাসনা আমার চামড়া গায়ে দিয়ে তোমার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আসলে আমি কোন সত্তাই নয়, সেই মৃত লোকটার জবরদখল সম্পত্তি মাত্র।······

রিণা একটা রুমাল দিয়ে তার গলা, মুখ-নাক সজীব করল। রেশমী শাড়ির আঁচলটা জামার তলায় ব্রেসিয়ারের হুকের নীচে গুঁজে দিয়ে সে গলার নীচের এক আকর্ষণীয় দৃশ্যপট তৈরী করছিল, সেইভাবেই যেন স্বগতোক্তি করতে লাগল, 'দুঃখ কষ্ট সমস্যা সবার লাইফেই আছে, তারই মধ্যে একটু সুখ, একটু আহ্লাদের ভরসাতেই ত' মানুষ বাঁচে। তা না হলে জীবনের কোনো মানেই থাকত না— তোমার মত হতাশ আর ভীতু হয়ে পালিয়ে বেড়ালেই যদি সব মিটে যেত তাহলে ত' আর কথাই ছিল না।'

নানা রকম খাবারের গন্ধে ঘরের বাতাসটা বেশ ভারী। একটু বাইরের হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়ালেই ভাল ছিল। শরীরের মধ্যে সেই অস্বস্তি, চোখটায় কেমন জ্বালা জ্বালা অনুভূতি। রিণাকে টাকার কথাটা বলতে হবে। রিণা গম্ভীর মুখে কি যেন ভাবছে। তার খোলা তলপেট ও কোমরের কাছটায় যে মেদের কুণ্ডলীদুটো হাঁটবার সময় দুপাশে দুটো পোষা মাছের মতো খেলা করে সে দুটোও এখন নিস্পন্দ। যেন ফর্সা মসৃণ দুফালি মাংস ও মেদের স্তর তার জামার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে পেট ও কোমরের মাঝে আড়াআড়ি ভাবে শুয়ে বিশ্রাম করছে। তারক

হাত বাড়িয়ে মাছটাকে স্পর্শ করে, 'কি, আর কিছু খাবে না তুমি ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, তোমার খুব খিদে পেয়েছে, তুমি খাও আরও কিছু। আমি কিন্তু কিছু খাব না। বাইরের খাবার প্রায় ছেড়েই দিয়েছি।' তারকের মুঠোয় ধরা মাছটা যেন একটু নড়ে চড়ে উঠল।

বেয়ারাকে ডেকে কচুরী আর ফিরনির অর্ডার দিল তারক। বেয়ারা খাবার দিয়ে গেল। রিণার হাত ধরে তারক বলল, 'তুমি কিছু একটা না খেলে আমিও কিন্তু খাব না বলে দিচ্ছি।'

রিণা ধমক দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'খুব হয়েছে, আর ভদ্রতা দেখাতে হবে না তোমার। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগীর যে কি যন্ত্রণা সে ত' আর জানলে না, মরতে ত' বসেছিলাম এবার। আপদ বিদেয় হলেই ভাল হত, কি বল ?'

'কি যে বল ! তাহলে তোমার লিফট্, এই ভোজ সবই যে মাঠে মারা যেত রিণ'—হাসতে হাসতে তারক রিণার থুতনিটা ধরে নাড়া দেয়।

অ্যাপেণ্ডিসাইটিস ? সেট আবার কবে হল ? আমি ত' শুনলাম চারু বোসের বাচ্চাকে খালাস করবার জন্যে ছুটি নিয়েছিলে তুমি। সেটাকেই কি অ্যাপেণ্ডিসাইটিস বলে চালাচ্ছ নাকি ?

তা বেশ। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। সরকেল ত' আমায় আরও অনেক কিছু বলতে চেয়েছিল। আমারই ইচ্ছে ছিল না এ সব শুনবার। কিন্তু সে ছাড়ে না, আমাকে শোনাবার জন্য তারই গরজ বেশি। না হলে কি আর আমার মত অভাজনকে সরকেল আপ্যায়ন করে। কিন্তু যাই হোক এবার সরকেলকেও মনে মনে স্বীকার করতে হবে যে চারু বোস অন্তত অকৃতজ্ঞ নয়। সে তোমার উপকার করেছে। কারণ ভেবে দেখ, চাকরীই ত' জীবন, জীবন মানেই ত' সুখে আহ্লাদে খেয়ে পরে বাঁচা, সেদিক দিয়ে চারু তোমাকে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে। আমার মত লোক তোমায় কি

দিতে পারে ? পদ্মার বোবা দৃষ্টির মত এক নিরালম্ব শূন্যতায় আমি ঝুলছি। টুক করে কবে সবার চোখের সামনেই হয়ত খসে পড়ব। তার আগে যতদিন পারি তোমাদের এঁটো খুদ-কুঁড়োয় ভাগ বসিয়ে, অস্বস্তি আর অসুখের খোঁচায় সার্কাসের নেকড়ের মত সাড়া দিয়ে বেঁচে থাকি।......

বাতাসের ঝাপটায় শার্সির বাইরে হিস্ হিস্ শব্দ। রিণা রুমালে চোখ মুছল ? কাঁদছে নাকি ? 'তুমি কি আমায় কোনদিন ভালবাসতে পারবে না ?' তারকের কাঁধের পরে মাথা রেখে সে বলল।

'কেন ? একথা কেন রিণা'—রিণাকে হঠাৎ দুহাতে সাঁড়াশির মত জড়িয়ে চেপে ধরে তারক। নরম ঠাণ্ডা শরীরটাকে একটা দলা পাকিয়ে ফেলবার নিষ্ঠুর ইচ্ছেয় হাতের শিরাগুলো কিলবিল করে ওঠে। প্রায় চোখ বুজে তারকের বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে চায় রিণা। শার্সিতে বাতাসের ছোবল, কখনো বা বিদ্যুতের ঝলক।

আঃ—প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে রিণা। 'তোমার হাতে এটা কি ? মাদুলী ? ইস্ চামড়া কেটে বসে গেছে আমার। এটা পরেছ কেন ?'

তারক অপ্রতিভ হয়ে হাসে, 'খুব লেগেছে তোমার ?'

'লাগবে না ?' রিণা ধমকায়, 'দেখি ওটা'—জামার নীচে প্রায় বগলের কাছ থেকে মাদুলীটাকে টেনে নামাল সে। কালো সুতোয় বাঁধা চকচকে ধারাল মাদুলী একটা। 'হায় কপাল, তোমার আবার এতে বিশ্বাস হল কবে থেকে ? কি আছে এর মধ্যে ?'

'তারকেশ্বরের ফুলটুল কিছু হবে হয়ত, মা আনিয়েছেন। এতে সব ভাল হয়ে যায়। বাবা তারকেশ্বরের দারুণ পাওয়ার বাবা—' সুতোর মধ্যে আঙ্গুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারক বলল।

'বাঃ বেশ ! তারকেশ্বরের আশীর্বাদে বেঁচে আছ—তাই তুমি তারক জীবন ? তোমার নামের এমন খাসা মানে ত' আমি জানতাম না।'

'ইচ্ছে করলে সেই সাতশ রাক্ষসীর আত্মার মত এই মাদুলীর মধ্যে আমার জীবন আছে ভেবে এটাকেও তুমি তারকজীবন লাহিড়ী বলে ডাকতে পার।' জবাবটার মধ্যে খুব একটা রসিকতা আছে মনে করে তারক বেশ উৎসাহিত বোধ করল।

'খুব হয়েছে, নাও মিষ্টিটা শেষ কর এবার, ঝড় উঠবার আগেই পালাতে হবে।'

মনোযোগ দিয়ে ফিরনি খেতে খেতে তারক ভাবল, এটাও অনেকটা তোমার মতো আমার একটা অ্যাপেণ্ডিসাইটিস কেস। জগাছার কোন গুণিনের কাছ থেকে কর্মকার এটা আমায় এনে দিয়েছে। যে কোন ধরনের হাঁপানীর নাকি অব্যর্থ ওষুধ এটা। এর মধ্যে সেই গুণিন ভরে দিয়েছে মন্ত্রপুত এক দুষ্প্রাপ্য পোকা। যেটা নিঃশ্বাসের অভাবে এর মধ্যে আটকা পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে একদিন মরে যাবে আর সেই পোকাটার জীবন আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আমায় সুস্থ করে বাঁচিয়ে তুলবে। কে জানে সেই পোকাটা এখনও নিঃশ্বাসের জন্য ছটফট করছে কিনা। তুমি এ সব কথা শুনলে হয়ত এখনি আঁতকে উঠবে। ঘৃণা বা কোন আশঙ্কায় তোমার আশ্লেষবন্ধন হয়ত মুহূর্তের মধ্যে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হবে। ঘিনঘিন করে উঠবে হয়ত সমস্ত শরীরটা। অথবা সন্দেহ করবে আমিই সেই পোকাটা কিনা? যে সব রাস্তা বন্ধ সুড়ঙ্গের মধ্যে বসে একটুখানি নিঃশ্বাস, এক কণা জীবনের জন্যে দিনরাত ছটফট করে চলেছে।...

বেয়ারা বিল নিয়ে এল। রিণা ব্যাগ খুলে বেয়ারাকে পয়সা দিয়ে মোটা বখশিশ করল। সেলাম ঠুকে বেয়ারা চলে গেল। রিণার ব্যাগের মধ্যে যেন এক গোছা ইস্ত্রি করা টাকার বাণ্ডিল। তারক একটু ঝুঁকে পড়ে তার গলা ও বুকের মসৃণ খোলা জায়গাটায় মুখ লাগাতে যায়।

'এই কি হচ্ছে? আর দেরী করলে ট্রেলার বাসটা মিস করব; বৃষ্টি এলে ভোগান্তির অবধি থাকবে না—আজ চল।' উঠে দাঁড়াল সে।

বাইরে বাতাসটা আরও ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, আকাশে কালো মেঘ। 'একদিন বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করে, ভিজবে একদিন?'

'বেশত, এসো আজই—'

'না না, আজ হবে না, ট্রেলারটা ধরতে হবে আজ—'

'তবে থাক আজ—'

একবার ভিজলে নির্ঘাত তাকে বিছানা নিতে হবে সাতদিন, তারক জানে, তবুও বলল। কিন্তু টাকার কথাটা যে বলা হল না। এখন বললে কেমন হয়? 'রিন্'—

'উঁ'—মধুর এক ভ্রুভঙ্গি করে রিণা মুখটা বাড়িয়ে আনে। ভাবল, বোধ হয় একটা লাসট্ চুমু খাবে এবার তারক।

'আমি বলছিলুম যে···বলছিলুম···বুঝতে পারছি না, ঠিক কী ভাবে তোমায় বলব কথাটা।'

খুব সুন্দর করে হাসল রিণা, 'তোমাকে কিছুই বলতে হবে না, আমি সব বুঝতে পারি। এবার তুমি নিজেকে একটু বোঝবার চেষ্টা কর দেখি, জীবনটা মাতুলীর মধ্যে পুরেই ত' আর সত্যি সংসারে বাঁচা যায় না; সেভাবে বাঁচা আর না-বাঁচা দুই সমান। গোটা লাইফটাই কি কতকগুলো ভয় আর ভাবনার জন্য টিকিয়ে রাখবে তারকজীবন? একটু ভেবে দেখ। তোমার নিজস্ব একটা পরিচয় বা চেহারা বলেও ত' কিছু আছে—নাকি?'

রিণার বাস এসে গেল। 'চলি, কাল এসো কিন্তু—' বলেই একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তারককে দেখে উঠে পড়ল সে। কোন কথা বলার চেষ্টা করল না তারক। একরাশ ডিজেলের ধোঁয়া আর ঝোড়ো বাতাসের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে রইল। রিণা কি তাকে নিয়ে একটু ব্যঙ্গ করে গেল?

কিছুক্ষণ তেমনি চুপচাপ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে। হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাসের বেগ বাড়ছিল, সঙ্গে দু'এক ফোটা বৃষ্টি। মাথার যন্ত্রণা, বুকের ব্যথা, সর্দি ইত্যাদির কথা ভেবে গলার বোতাম

আটকে, জামার হাতাছুটো নামিয়ে দিয়ে এবার সে ধীরপদে তার বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে চলতে শুরু করল। রিণার শেষ কথাগুলো তাল গোল পাকিয়ে যেন একটা অর্থহীন পেণ্ডুলামের মত কেবলি মাথার মধ্যে ঘা দিচ্ছিল। সে ভেবে দেখল, আসলে কিছুতেই কিছু না। ব্যাক্তিত্ব, সত্তা, আমার পরিচয়, জীবন—এ সবই কতকগুলো গালভরা কথার ধোঁকাবাজি। কতগুলো সাংঘাতিক রকমের জটিল ব্যবস্থার টানাটানিই আসলে আমাকে টিকিয়ে রেখেছে। তারাই আমার নাম, আমার পরিচয়।

আমার রক্তের মধ্যে আছে এক সাপ যে মরতে মরতেও জেগে ওঠে, আমার শরীর হাঁপানীতে, যন্ত্রণায় অহর্নিশ ধুঁকছে, আমার অন্ধ মা, বিধবা পদ্মা, তার ভাবী ও বর্তমান বাচ্চারা সবাই চেয়ে আছে এই মরণাপন্ন একটি মুখের দিকে। তুমি গোপনে চারুর বাচ্চাকে তোমার পেটে জায়গা দিয়েছ—সে কথা আমি জেনেও জানবো না কোনদিন, তুমিও জানতে পাবে না কখনো আমার সংসার বা শরীরের সঠিক খবর। কারণ তা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না মোটেই। তোমায় ঠিক ভাল না বাসলেও তোমার প্রতি আমার আকর্ষণের হেতু আছে। হয়তো এ প্রয়োজন, হয়তো বা অভ্যাসও। এবং এই সবগুলি প্রয়োজন ও অভিসন্ধির সঙ্গে রফা করার নামই হচ্ছে তারকজীবন লাহিড়ী। ইচ্ছে করলে একে অনেকগুলো হন্যে হওয়া লোভ আর আবেগের এক কথায় প্রকাশও বলতে পার।

টিপটিপে বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া ধুলোর কুণ্ডলী পাকিয়ে তুলছিল চারদিকে। আশেপাশের মানুষগুলো বাস কিংবা ট্রামের হাতল লক্ষ্য করে পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। তারকও তার মাদুলীটাকে বগলের সঙ্গে চেপে ট্রাম ঘুমটির দিকে ছুটল। প্রচণ্ড এক ঝড়ে চারদিক ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল দ্রুত। ক্রমশ তার মধ্যে এক সময় তারকজীবন লাহিড়ী হারিয়ে গেল।

অনি

. . . .

অসীম রায়

'তোমরাই বলতে না বাবা, বাংলা দেশের রেনেসাঁটা বোগাস ?'

এইরকম একটা কথা বোধ হয় অনি আমাকে বলতে চায়। কিন্তু আমাদের সংলাপে বেশির ভাগ সময় কারো ঠোঁট নড়ে না। কারণ ঠোঁট নড়লেই সংলাপ বন্ধ হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। ঠোঁট নড়লেই সে যে আমার রক্তমাংস অস্থিমজ্জার অংশ সেই সচেতনতা যা মৌনে প্রকট তা হারিয়ে যায়। আর আমি এই দুর্লভ সংলাপকে কথা বলে নষ্ট হতে দিতে চাই না। অনি-র পাতলা গোঁফের পাশে একটা চাপা প্রায় সর্বক্ষণ সদাজাগ্রত হাসিটার দিকে চেয়ে আমি মৌনে বলি, 'কিন্তু বিদ্যেসাগরটা ? ওটা বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, যাই বলো বাপু।'

দিন সাতেক আগে বিদ্যেসাগর প্রসঙ্গ অনি-র মা তুললে অনি বলেছিল, 'বিদ্যেসাগরের চুষিকাঠি দিয়ে কদ্দিন মা ঘুম পাড়িয়ে রাখবে ?' সেই জবাব আবার তার কচি গোঁফের ফাঁকে হাসির মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। আমি এতক্ষণ পর একটু নড়েচড়ে বসি। গলা ঝাড়তে ঝাড়তে এই মৌন ইন্দ্রজাল ছিন্ন করার চেষ্টায় বলি, 'তোর সর্দিটা সেরেছে ?'

অনি অপ্রস্তুতভাবে হাসে। তার কালো বিষণ্ণ চোখ দুটো আমার দিকে মেলে হঠাৎ বলে, 'তোমাদের উনিশশো আটচল্লিশটা —যখন তোমরা সশস্ত্র বিপ্লব করতে রাস্তায় নেমেছিলে—আর আজকের মধ্যে অনেক কারাক। তখন তোমাদের পেছনে কেউ ছিল না, আর এখন সমস্ত পৃথিবীর মেহনতী মানুষ আমাদের পেছনে।'

আমি আতঙ্কে আমার ছেলের দিকে চেয়ে থাকি। এর উত্তরে আমি কি বলব তা আমার ঠোঁটস্থ আর তার প্রতিক্রিয়ায় আমার ঘরে আসা যে অনি বন্ধ করে দেবে তাও প্রায় অবধারিত। আমরা দু'জন গত এক বছর ধরে এই অন্ধকারে কানামাছি খেলছি, কেউ কাউকে ছুঁতে পারছি না, কেউ কাউকে বোধ হয় ছোঁবার চেষ্টাও করছি না। তার চেয়ে অনি যদি কথা না বলে আমার ঘরে একটুক্ষণ বসে থাকে তা হলে বোধ হয় আমার পিতৃত্বের বুভুক্ষা অনেকখানি মেটে। আমি সরব হতে গিয়েই জোর করে হাই তুলতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমার মন গজরাতে থাকে বয়স বয়স অনি, বয়স, রক্ত ফুটছে তোর শরীরে। এই রক্ত-ফোটা সারা দেশের ছেলেগুলোকে আমি পুষব মণ্ডামিঠাই দিয়ে, তারপর যেই রক্তের তোলপাড় শান্ত হয়ে আসবে, এই তিরিশ পেরোলেই তোদের ছেড়ে দেব। তখন তোদের মন বিচার করবে, বুদ্ধি পরখ করবে, কোন জিনিস মানবার আগে দু'বার ভাববি, ঝাঁপ দেবার আগে তাকাবি, আর জীবনের এই মায়ায় অক্টোপাসের শুঁড়ে আবদ্ধ হবি। এই কয়েকটা বছর, এই দশ বারোটা বছর যদি দেশের ছেলেগুলো লাফ দিয়ে পার হয়ে বুড়ো হয়ে যেতে পারত। কারণ বাংলা দেশের তারুণ্য তো কখনই পরিণতি পাবে না, ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে তার জয়ধ্বজা তো কখনও মিলাবে না সূর্যরাঙা দিগন্তে। তা সব সময় অন্তত ইংরেজের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় থেকেই এক অসমাপ্ত মহত্ত্বের প্রতীক মাত্র। এই অসমাপ্ত মহত্ত্বের শৌর্য আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে অনি। আমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে। আমি আর দেখতে চাই নে।'

আমার কথাগুলো যেন অনি বুঝতে পারে। তার পাতলা গোঁফের ফাঁকে আবার তার সাম্প্রতিক ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে। আর আমি তার মা-কে বলা আমার সম্পর্কে কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাই, 'আসলে বাবা তার নিজের অতীত থেকে বেরোতে পারছে না। কারণ বাবা আর পলিটিকাল এলিমেন্ট নন। বাবা ভাবছে তাদের

সময় যেমন পুলিসের মার খেয়ে আন্দোলন গুটিয়ে গিয়েছিল এবারেও তাই হবে। একবারও তাকিয়ে দেখছে না চারদিক। শুধু নিজে কি করেছিলেন এককালে কেবল তারই স্বপ্ন দেখছেন। ওসব কথা লোকে ভুলে গিয়েছে, ভুলে যাওয়াই ভাল। ওসব অতীত পুজো করে কিছু হয় না। আমরা যুদ্ধ শুরু করেছি শেষ করব।'

অনির শেষ কথাটা হাতুড়ির মতো আমার মাথায় পড়ে। আমি পলিটিক্স থেকে সরে গেছি সত্যি কথা কিন্তু কোন স্লোগান হৃদয়ে রক্ত সঞ্চার করে, শ্রেণী সংবদ্ধ করে নতুন প্রতিজ্ঞায় তা বুঝবার ক্ষমতা বোধ হয় এখনও হারাইনি। অনিদের স্লোগানে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আছে যা আপাতদৃষ্টিতে ভাবের কথা, মেলোড্রামার কথা, কিন্তু তার প্রচণ্ড রোখ আমায় স্পর্শ করে। এই কথাগুলো যেন শুধু চীৎকার করে না, বস্তুত আমাদের বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের অস্তিত্বের শিকড় ধরে নাড়া দেয়। যদি এরকম একটা ব্যাপার হত, আমি চারপাশের কেউ নই, আমি বাঙালী মধ্যবিত্ত নই আমি জার্মান কিংবা পাঞ্জাবী, তা হলে লোকে যেমন সিনেমায় দেখে তেমনি এই বাংলা দেশের নতুন কাহিনীকে দেখতাম দূর থেকে, উত্তর ভারতীয় ঔদাসীন্যে হাই তুলে বলতাম, মিলিটারি ডাকলে হয় না? কিন্তু আগুন এত কাছে যে, তার আঁচ গায়ে এসে লাগছে, ঘটনা এখন বিচার-বিশ্লেষণের উর্ধ্বে এখন এমন এক স্বয়ম্ভুতা অর্জন করেছে, এমন আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয়ে রোজ প্রাতঃকালে উদিত হচ্ছে খবরের কাগজে যে বিপ্লবের ইতিহাস ভূগোল যা যৌবনে পড়েছি এবং বহু কাল পর্যন্ত এই মধ্যবয়সী জীবনে স্রোতে ভেসে যাওয়া কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে থেকেছি তা সব ভুলতে বসেছি। আমি এখন নিজেই চমকে উঠি নিজের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তায়। ছেলেটাকে যখন টেনে বুড়ো বানানো যাবে না তখন বিলেত পাঠানো যায় না, অন্তত দিল্লী বোম্বে কিংবা আহমেদাবাদ। এই সব অপরিণত মস্তিষ্কের চিন্তা অথবা বাহাত্তুরে চিন্তা আমাকে মাঝে মাঝে

পেয়ে বসে আর সঙ্গে সঙ্গে পিতৃত্বের অক্ষমতায় চিড়চিড়ানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অন্তত অনিদের বিপ্লবটা যদি বছর পাঁচেক পরেও আসত আমার রিটায়ারমেণ্টের সময় তা হলে বোসবাবুকে হাতেপায়ে ধরে কর্পোরেশানের একটা লাইটিং ডিপার্টমেণ্টের পোস্টে ঢুকিয়ে দেওয়া যেত। বাপের জায়গায় ছেলে এ ঐতিহ্য অনেক অফিসের মতো আমাদের অফিসেও আছে। কিন্তু পাঁচ বছরে আমাদের দেশের কি চেহারা হবে এই সব ত্রিকালজ্ঞ ভাবনার চেয়েও আমার একটা প্রশ্নই কাঁটার মতো বিধে থাকে বুকের মধ্যে, উঠতে বসতে খচখচ করে—ছেলেটাকে পাঁচ বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারব তো ?

অনি বোধ হয় উঠে পড়বে। আমাদের মানসিক সংলাপ খুব বেশিক্ষণ চালানো যায় না। অন্তত আমার ভাল লাগলেও অনির বোধ হয় আপত্তি আছে। সেও অস্থিরতা বোধ করে। আমিও করি। আমি এবার মুখ খুলি, 'রূপনারায়ণপুর জায়গাটা বেশ, না অনি।

'বড্ড একঘেয়ে, বড্ড নির্জন। কিছু করার নেই, ঘুমনো ছাড়া। তা ছাড়া আর কিছু দিন থাকা সম্ভব ছিল না। দাতুর ওপর চাপ হচ্ছিল। তুমি বলেছিলে বটে থাকতে, কিন্তু আর বেশী দিন থাকলে বোধ হয় ওদের অসুবিধে হত।'

বিলেতে নয়, রূপনারায়ণপুরে পাঠিয়েছিলাম ছেলেকে, আমার এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠামশাই সেখানকার স্টেশন মাস্টার। মাস ছয়েক আগে যখন সামনের বড় রাস্তায় পুলিসের গাড়িতে বোমা পড়ায় একজন পুলিশ মরল আর তার তিন ঘণ্টা পর আততায়ী কাছেপিঠে বসে বসে চিঁড়েভাজা খাচ্ছে এই গভীর প্রত্যয়ে পুলিস এসে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে অনিকেও নিয়ে গেল এবং পুলিস লক-আপে তাদের নিয়ে ফুটবল খেলার পর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল ভাঙা অনি ফেরত এল দু'দিন পর। তারপর থেকে ঘন ঘন পুলিসের লোকের যাতায়াত। আমার স্ত্রীর স্নায়ুরোগের সূত্রপাত তখন থেকেই।

মাঝরাতে হাওয়ায় দরজার পাল্লা নড়লেই ঘুমের মধ্যে নীহার চেঁচিয়ে ওঠে। আমি মরিয়া হয়ে চিঠি লিখি আমার স্টেশন মাস্টার জ্যাঠার কাছে। জ্যাঠা কোনো বাবাজীর ভক্ত, ভালমানুষ। নির্জনতায় আঁকপাঁক করেন। চিঠি লেখবার কয়েক দিনের মধ্যেই রাজী হয়ে গেলেন।

'আসলে আমি কাওয়ার্ড। আমাদের দরকার আজ মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া, সুগতর মতো। আমি তা পারছি না। সেইটাই তো আসল সমস্যা। আর তোমার কথা শুনলে বাবা হাসি পায়। মানুষ কি কুকুর বেড়াল যে, তাকে দু'বেলা খেতে দিলে আর আদর করে গায়ে হাত বুলোলেই তার সমস্যা মিটে যাবে?'

আমরা এতক্ষণ যে বন্ধুত্বের মৌন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছিলাম অনি তা দু' হাতে ছিন্নভিন্ন করে দিল। আমরা যে দু'জন বাপ ছেলে দুই সমান্তরাল রেখা ধরে দৌড়চ্ছি কথা বললেই তা একেবারে স্পষ্ট। চুপ করে থাকলে এতদিন একসঙ্গে এতগুলো সকাল-সন্ধে-রাত্রির সান্নিধ্যের স্মৃতি যেন আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ ছাপিয়ে এক গভীর অন্তরঙ্গ পরিবেশ তৈরী করে, সমস্ত বৈরী বোধগুলো ভোঁতা হয়ে যায়। এমন কি মৌনে বোধ হয় সম্ভাবনাও লুকানো আছে। একসঙ্গে বেঁচেবর্তে থাকার সম্ভাবনা চুপ করে থাকার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের দু'জনের রক্তে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। অনির আঘাত আমাকে মুখর করে তোলে।

'অনি, তোরা কি একটা মেড-ইন-বেঙ্গল বিপ্লব সৃষ্টি করতে যাচ্ছিস?'

অজান্তে কথাগুলো আমার ঠোঁট ছিটকে বেরিয়ে যায়। কথাটার গুরুত্ব হালকা করার জন্যে আমি টেবিলে রাখা পেন্সিলটা দু'বার নাচিয়ে দিই।

'মানে?' অনির সেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোর মধ্যে আমি আবার বাংলা দেশের সেই তরুণ সমাজকে দেখি যারা এখন অসি

ধারণ করেছে। কিন্তু সেই হুসিয়ারি আমাকে শান্ত করে না। প্রবল অস্থিরতায় আমি চেঁচিয়ে উঠি, 'মেড ইন বেঙ্গল ছাড়া কী বল? কোন দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে আছে যে, ব্যক্তিগত খুনের মাধ্যমে বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়? তুই একটা দেশ দেখা—রাশিয়া, চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম?'

'তুমি যা শিখেছো বাবা সেগুলো ভুলে যাও। নতুন বিপ্লব ঘটছে চারপাশে সেখানে তৈরী হচ্ছে বিচারের নতুন মানদণ্ড। এ সম্পর্কে তো তোমাকে পড়তে দিয়েছিলাম? ভাল করে পড়েছিলে?'

অনির স্থির শান্ত কণ্ঠ আমাকে আরও অস্থির করে তোলে। বস্তুত তা যে আমার সমস্ত অস্তিত্বকে ব্যঙ্গ করে আমার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা বিচার-বিশ্লেষণ এক মুহূর্তে নস্যি বানিয়ে দেয়।

'পড়েছি, পড়েছি। কিন্তু ওগুলো তো সব আপ্তবাক্য। সব ধরে নেওয়া হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণ জেগে উঠেছে, গ্রামে গ্রামে ক্ষেতে খামারে চাষীর মনে শ্রেণীঘৃণা উদ্দীপ্ত। আসলে কি জানিস, তোরা তোদের নিজের মনের মাধুরী দিয়ে তোদের ভুবন সৃষ্টি করছিস কিন্তু বিপ্লব, বস্তুভিত্তিক বাস্তব অবস্থার ওপর বিপ্লব দাঁড়ায়।'

বলবার শেষে আমার মনে হল আমি একটা দারুণ বলে ফেলেছি। নিজের বিশ্লেষণী শক্তিকে মনে মনে তারিফ করে আমি অনির দিকে তাকাই। কিন্তু অনি যেন এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে কথাগুলো বার করে দিয়েছে। এ কথাগুলো তার কাছে যেন এমন যা নতুন করে ভাবায় না, যা আর পাঁচটা কথার মতো শোনা কথা।

'আসলে তুমি মন দিয়ে পড়নি যে লেখাগুলো দিয়েছিলাম তোমাকে পড়তে।'

এবার আমি আমাদের সন্ধ্যের মৌন ব্রত একেবারে ভুলে

যাই। অনির প্রতি যেন আমার কোন দায় নেই, সে শুধু প্রতিপক্ষ মাত্র। চারপাশে যাই ঘটুক যে তাণ্ডবই চলুক না, আমাদের একসঙ্গে গত বিশটা বছরের ইতিহাস তা কি লুপ্ত করে দিতে পারে? এই আত্মবিশ্বাস ঝুলে পড়ে এক নিমেষে।

'আমি তো বলছি তোদের একটা প্রয়োজন ছিল। বাস্তবিক বিপ্লবের নাম করে সবাই যখন নিজের কেরিয়ার করছে তখন তোদের অপরিসীম আত্মত্যাগ···'

একটা হাত শূন্যে তুলে অনি প্রতিবাদের ভঙ্গীতে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে বলে, 'এই সব বস্তাপচা কথা, এই সব স্তোকবাক্য আর ব'লো না। সবাই বলে তাই তোমাকেও বলতে হবে? বিপ্লবটা কি খবরের কাগজে সম্পাদকীয় লেখা কিংবা ককটেল পার্টি? বিপ্লবে মৃত্যু ত্যাগ অবধারিত। মানুষ আজ মৃত্যুঞ্জয়ী। সে সুগতর মতো মৃত্যুকে জয় করেছে বলেই বিপ্লব অবধারিত।'

এগুলো অবশ্য সে ঠোঁট খুলে বলে না। কিন্তু আমি ঠিক শুনতে পারি। এইসব কথাগুলো তার মার সঙ্গে হয়। আমার সঙ্গে ঠোঁট খুলে কথা বেশী দূর এগোয় না। সামান্য এগোতে না-এগোতেই ছেদ পড়ে। এ ব্যাপারে অনি একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। আমার বিচার বিশ্লেষণী মন যখন নড়েচড়ে ওঠে, তখনই সে চুপ মেরে যায় আর তখন তার মৌন মুখ থেকে তার উক্তিগুলো আমি ঠিক ঠিক শুনতে পাই।

তার হাত-তোলা তীক্ষ্ণ সুকুমার শ্যামলা মুখখানার দিকে তাকিয়ে অবসন্ন বোধ করি। চেঁচিয়ে উঠি, 'তবু অনি, আর একটু সবুর কর। এইসব আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের ভস্ম করে দিস নে। আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয় বছরের পর বছর।'

একটা চাপা হাসি খেলে যায় তার ঠোঁটের দু পাশে, 'তোমরা যেমন গত বার বছর জ্বালিয়ে রেখেছো।' স্পষ্ট করে শুনতে পারি অনির উত্তর। আমিও ছাড়ার পাত্র নই, বলি, 'আসলে আমাদের

দুর্বলতা আমাদের অক্ষমতার সাফাই গাইছি। সত্যিই দেশ স্বাধীন হবার পর যখন আমরা রাস্তায় নেমেছিলাম 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, বলে তখনই একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তখনই একটা মোড় ফেরার সময় ছিল। তা হলে আজ সারা দেশ জুড়ে, অন্তত আমাদের বাংলা দেশে, তরুণদের এমন মরিয়া হয়ে মাথা কুটতে হত না।...আমার সেদিনটা বেশ মনে পড়ে। আমরা রাস্তায় নেমে মিছিল করে জেলের তালা ভাঙতে চলেছি, আর সানগ্লাস পরে মেয়েরা ক্রিকেট খেলা দেখতে ইডেন গার্ডেন ময়দানে ভিড় জমিয়েছে, আর আমরা পড়ে পড়ে মার খেয়েছি।'

প্রশান্ত হাসিতে সারা মুখ ভরে যায় অনির। তার আত্মবিশ্বাসের সেই হাসি আমার গালে যেন জুতো বসিয়ে দেয়। 'আর এখন? এখন কী হচ্ছে দেখছো না? সারা কলকাতা এখন মুক্তাঞ্চল হতে চলেছে। মধ্যবিত্ত ন্যাকামির কোন স্থান নেই। রাস্তায় বেরোতেই বারুদের গন্ধ নাকে আসে না? এই পথেই বিপ্লবের দিন এগিয়ে আসছে।'

আমি আড়ষ্টতায় থমথম করি। পঁচিশ বছর আগে যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে, সেই দিনগুলো আবার মনের মধ্যে ফিরে আসে। বিপ্লবের পদধ্বনি তখন দিন রাত আমাদের রক্তে বেজে চলেছে। তারপর দু-তিন বছরের মধ্যেই সে জোয়ার যখন চলে গেল, তখন আত্মবঞ্চনার পাঁজরা হাড়গুলো পাঁক ঠেলে উঠে এল। আমার এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী দৌড়ল অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মের বস হতে, আর আমি হাত কচলাতে কচলাতে দাঁড়ালাম আমার এক বন্ধু দূর সম্পর্কের মামা, কলকাতা কর্পোরেশানের এক ডেপুটি মেয়রের সামনে। তারপর যে-কোন ঘটনাকেই মার্ক্সবাদ দিয়ে সমর্থন খোঁজা হতে লাগল। এক সার্বিক আত্মবঞ্চনার ইতিহাসের পাতা আমাদের যৌবনের সামনে খুলে গেল। এর চেয়ে অনিদের

ব্যাপারটা কি আরও স্পষ্ট নয়? আরও তাৎপর্যপূর্ণ নয়? এ কি নিত্যই পুনরাবৃত্তি, না পুর্নজন্ম?

আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনি আমার বইয়ের শেলফের দিকে এগিয়ে যায়। মার্ক্স লেনিন স্ট্যালিন মাও সে তুং-এর বইগুলোয় ধুলো পড়ছে। সে অন্যমনস্কভাবে একটা ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে তাকের ধুলোগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে থমকে যায়। আমি একবার আড়চোখে তাকাই কোন বিশেষ বই দেখছে। লেনিন, না মাও সে তুং?

'তোমার কি মনে হয় না বাবা, তোমার এই বর্তমান হাত-কচলানো অস্তিত্বের জন্যে সামান্য কয়েকটা পয়সার জন্যে দরকার হলে দুর্নীতি করে এবং তাকে গালভরা যুক্তি দিয়ে সমর্থন করে বেঁচে থাকার সঙ্গে এই সব বইয়ের কোনো যোগ আছে। এ সব বই এরকম যাদুঘরে মানায় না। এইরকম মৃত বারবার একই বৃত্তের মধ্যে যান্ত্রিক সংক্রমণের সঙ্গে বিপ্লবের এই জোয়ারের কোনো যোগ নেই। তোমার পঞ্চাশটা বছরে বিপ্লবের জন্যে তুমি যা না করেছো, তার চেয়ে সুগত তার একুশ বছরের জীবনে অনেক বেশী করেছে তার আত্মদানে। সে তার আত্মদানের মারফত বিপ্লবের দাবানল সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। তুমি করেছো তোমার বিশ্লেষণী শক্তি নিয়ে তোমার ধুলোয় ভরা মার্ক্সবাদী বই নিয়ে?'

অনি এবার জানলার বাইরে পশ্চিমের আলোর দিকে চেয়ে আছে। বোধ হয় বয়স বাড়ার জন্যেই হোক আমি আজকাল এই পশ্চিমের আলো দেখতে ভালবাসি। আর সেদিকে চেয়ে আমার চোখ আটকে যায়। কলকাতার পড়ন্ত শরতের শেষ বেগনী বাহার যাদবপুরের আকাশে। বেগনীর পাশেই জাফরানী রং ধরেছে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে আমি আবার নিজের অতীতের দিকে চাই। অনির নিঃশব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কথাগুলো আমাকে ওলটপালট করে দেয় ওদের স্লোগানের মতো। সত্যিই কি আমি যাদুঘরে বাস করছি, আমার মার্ক্সবাদী যাদুঘরে? কারণ সত্যিই তো

রাজনীতি মানেই সেই নীতি, যা মানুষকে এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যায়। বিপ্লবের জোয়ার চলে যাবার পর পাঁকে কাদায় আমরা কি লক্ষ্য হারিয়ে ফেলিনি সেই কাদায় বাড়িঘর দোর বাঁধার চেষ্টা করে? সেই ক্ষয়কে জয় করবার জন্যে মর্মান্তিক পেটি বুর্জোয়া চেষ্টায়? তা ছাড়া আমরা কি করতাম? সঙ্গে সঙ্গে আমার বিশ্লেষণী শক্তি মাথাচাড়া দেয়। এক সার্বিক আত্মহত্যার পথ উন্মুক্ত করতাম সারা দেশ জুড়ে এবং সে চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শহীদ হতাম?

আমি পেন্সিলটা হাতে তুলে আবার নাচাতে থাকি নিজের অস্থিরতা ঢাকবার জন্যে। অনি হেসে ফেলে আমার দিকে চায়। এ হাসিতে ব্যঙ্গ নেই, মজা-পাওয়া তরুণের চমৎকার উজ্জ্বল হাসি। আমিও সে হাসিতে যোগ দিই। আমার মনে হয় আমার শরীরের রক্তসঞ্চালন যেন এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে আসে।

বছর দুই আগে সবে কলেজে-ঢোকা অনির রাফ খাতার পেছনে একটা লাইন দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম—'আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে।' 'এটা কার কবিতা রে?' অনি অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল, 'জীবনানন্দ দাশ। নাম শোননি?' আমি আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করতে সে মাথা নিচু করে বললে, 'রূপসী বাংলা বইটার নাম। চমৎকার কবিতা'। আমি তখন ভাবছিলাম ঐ লাইনেই তলে তলে হয়তো অনি এগোচ্ছে। আর আমি যদিও কবিতা-টবিতা বুঝি না, তবে তা বিপজ্জনক নয় ভেবে আশ্বস্ত ছিলাম। কিন্তু গত দু বছরের রূপসী বাংলার রূপ যেমন পাল্টাতে লাগল, অনির রূপও পাল্টে গেল। অনির সেই চেঁচিয়ে খোলা হাসি বন্ধ হয়ে গেল। পাড়ার এক চিলতে জমিতে খোলা ড্রেন, ভাঙা ঘুঁটে-লাগানো পাঁচিল আর আবর্জনার গাদার পাশে ক্রিকেট খেলার অসহ্য ছোট মাঠে তার ক্রিকেট-পেটানোও উঠে গেল। তার মুখ ক্রমশ থমথমে গম্ভীর। আর মাঝে মাঝে আয়ত চোখে চুপ করে চেয়ে থাকা। এই চলল। তারপর হঠাৎ থানায় ডাক পড়ল। তখন থানার ও-সি ছিল আমার

সহপাঠী। জানতাম না। বিশেষ করে নিজের রাজনীতির সঙ্গে এককালে সংস্রব থাকায় থানা পাড়ায় হাঁটতাম না। আমি চিনতেও পারিনি। কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে এমন গুরুত্বপূর্ণ চেহারা বানিয়ে ফেলেছে যে, চেনবার কোনো উপায় ছিল না। চায়ের সঙ্গে এটা সেটা আলাপের পর হঠাৎ বললে, 'ছেলের দিকে একটু নজর-টজর দিস। বাজে দলে মিশছে।' আমি ঘাঁটাইনি। চায়ের শেষ চুমুকের স্বাদ বিসর্জন দিয়ে পালিয়ে আসি। আসবার মুখে আমাকে বোধ হয় সান্ত্বনা দেবার জন্যেই সহপাঠীটি বললে, 'অবশ্য অনেক সোস্যিও-ইকনমিক ফ্যাকটর আছে, আই অ্যাডমিট। তোরাও তো পলিটিকস করেছিস। এখন বুঝতে পারছিস তো, ভায়োলেন্স দিয়ে কিছু হয় না।' মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিছু বলিনি। ভায়োলেন্স ভাল কি মন্দ তা নিয়ে সারা দেশের নেতারা রোজ কাগজ ভর্তি করছেন। আমি কর্পোরেশানের লাইটিং ইন্সপেক্টর, আমি কি বলব? এইরকম আত্মবিশ্লেষণে সান্ত্বনা খুঁজি।

কিন্তু গত গ্রীষ্মেও যে অবস্থা ছিল, এখন তা স্বপ্ন এই শরত-শেষে। পাড়ায় বোমা বিস্ফোরণ এবং সেজন্যে অনির হাজতে মার খাওয়া তাকে তার পন্থা আঁকড়ে ধরতে আরও উদগ্র করে তুললে। তারপর থেকে বাড়ির পাট মিটিয়ে দিল। হঠাৎ হঠাৎ আবির্ভাব হত আর মা-র সঙ্গে দেখা করেই হত অন্তর্ধান। মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে এমন একটা প্রত্যক্ষ জীবন্ত রূপ ছিল, যা আমার সঙ্গে তার সম্পর্কে ছিল না। তার মা তাকে বকতেন, গাল দিতেন আবার বুকে জাপটে আদর করতেন। এর মধ্যে একটা প্রচণ্ড রক্তমাংসের টান ছিল। অনির মা কখনও তাকে ভয় করতেন না, বরং উল্টে ঠাট্টা করতে ছাড়তেন না। মেয়েদের এই প্রত্যক্ষ শারীরিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে সমস্ত প্রশ্নের সমাধান খুঁজবার চেষ্টা আমি পাশের ঘরে বসে বুঝবার চেষ্টা করতাম আমার ব্যর্থ মনোরথে। তারপর এক আশ্চর্য ঘটনা-ঘটল, আমার বাড়ির ওপর আমারই রাজনৈতিক

দলের আক্রমণ। যে দলের পতাকার তলায় আমার যৌবনকে দাঁড় করিয়ে একদা রাজপথে নেমেছিলাম, এমন কি এখনও পুরাতন বন্ধুত্বের সূত্রে যে দলের সঙ্গে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে যুক্ত, সেই দলের ছেলেরা গত মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা এল অনির খোঁজে। তাদের হাতে লাঠি, লোহার রড, দা, ছোরা, পাইপ গান। বোমা ছুড়তে ছুড়তে সমস্ত পাড়া কাঁপিয়ে এল সেই তরুণ দল, যাদের দাদা-মামার সঙ্গে একদা আমি রাজনৈতিক সংগ্রাম করেছি। আমি হতভম্বের মতো চেয়েছিলাম সেই আততায়ীদের মুখমণ্ডলের দিকে কিন্তু দেখলাম তাদের একজনকেও আমি চিনি না, তারাও আমাকে চেনে না। আমি এই অদ্ভুত মেলোড্রামার জন্যে মোটেই তৈরী ছিলাম না। বাইরের চেঁচামেচি হট্টগোলে জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে ধন্দ হয়ে গিয়েছিলাম। আর আমার কানের চারপাশ দিয়ে খিস্তির বুলেট ছুটতে লাগল। একজন তরুণ এগিয়ে এসে বললে, 'বেশ তো ভুঁড়ি বাগিয়েছো ঘুষ খেয়ে খেয়ে।' আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'দে না ফাঁসিয়ে।' তারপর প্রবল লাথির ধাক্কায় দরজার একটা পাল্লা ভেঙে ঝুলতে লাগল। তখন হঠাৎ আমার খেয়াল হয়, অনি এসেছে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আর সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে কাণ্ডীয় নর্তকের উল্লম্ফনে আমি ভাঙা দরজা জাপটে ধরে দাঁড়িয়ে থাকি উদ্যত তরোয়ালের সামনে। মনে হল আমি যেন ধড়হীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। কারণ সামনে সেই হিংস্র কোলাহল আর সার সার আততায়ীর পলকহীন চক্ষু আমার দৃষ্টি ও শ্রবণের বাহিরে। হঠাৎ আগের জন্মে দেখা একটা মানুষের মুখ যেন উঠে এল সেই হিংস্র মুখমণ্ডলের মুখের ওপর। একটা মোটা ভারী আদেশের গলা বেজে উঠল, 'এখানে না, এখানে না। যা করবে বাড়ির বাইরে, এ বাড়িতে না।' তারপর আমার কিছু মনে নেই। বোধ হয় চৈতন্য লোপ পেয়েছিল। জ্ঞান হলে দেখলাম স্ত্রী আমার মুখচোখে জলের ছিটে দিচ্ছেন। অনি বাড়ি নেই।

হঠাৎ আমি আমার আত্মচিন্তার জগৎ থেকে ধড়মড় করে উঠি অনির কাশির আওয়াজে। অনি বোধ হয় উঠছে। আর বেশীক্ষণ বসে থাকা তার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে।

'অবশ্য আমাদের মধ্যেও যে প্রশ্ন নেই তা নয়।' আমি কান খাড়া করে বসি। অনেক দিনের অভুক্ত লোক যেমন হ্যাংলার মতো বাড়া ভাতের দিকে চেয়ে থাকে আমি সেইভাবে চেয়ে থাকি আমার ছেলের দিকে। অনি বোধ হয় নীচু গলায় স্বগতোক্তি করে, 'এই যেমন সবাই বলে, তুমি বলো, দেশের বেশির ভাগ গরীব মানুষকে নিয়েই বিপ্লব। কিন্তু কি করা যাবে বলো? তাদেরকে তো জাগাতে হবে, পথ দেখাতে হবে। তোমরা যে পথে গিয়েছিলে, সে পথে তো দেখলে, সে পথে খালি মিনিস্টার হওয়া যায়, বিপ্লব আসে না।'

আমি কিছু বলি না। আমাদের মৌন সংলাপের সন্ধ্যায় এইরকম স্পষ্ট সহজ মুখর মুহূর্ত খুব কম। যখন আমাদের ঠোঁট নড়ে ওঠে তখন হয় আমি জ্ঞান দিই উত্তেজিতভাবে নিজের অতীত-বর্তমানের সমর্থনে আর অনির কাছ থেকে আসে এক একটা বক্রোক্তি। আমি হ্যাংলার মতো অনির তীক্ষ্ণ সুকুমার মুখখানার দিকে চেয়ে থাকি যেন তাকে আমি এই শেষবারের মতো দেখছি। 'এখন এত দূর এগিয়ে যদি কমজোর হয়ে পড়ি, আমার সহকর্মীরা আমাকে ক্ষমা করবে না।' আস্তে আস্তে সে বলে।

'আমি তোকে দিল্লী পাঠিয়ে দেব' পাগলের মতো হঠাৎ চীৎকার করে উঠি।

গভীর সহানুভূতিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে অনি কিছুক্ষণ। তার সেই ধীর চাহনির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয় আমিই বোধ হয় অনির ছেলে। পিতৃত্বের স্বাভাবিক পরাজয় আমি সেই মুহূর্তে স্বীকার করি।

অনি বললে, 'তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে না বাবা। রাস্তায় দেখলে পুলিস গুলি করে মারবে, বাড়িতে এলে অন্য পার্টির লোক

চড়াও হয়ে মারবে। আর যদি চাকরি-বাকরি করব ভাবি তা হলে আমার বন্ধুরাও ছেড়ে দেবে না। আমার জন্যে চেষ্টা করো না বাবা।' অনি উঠে পড়ে আমি চোখ বুজি। চোখ খুলে দেখি অনি চলে গেছে।

তারপর ক'দিন আমি আর কাগজ দেখি না, রেডিও খুলি না। রাজনৈতিক আলাপ যেখানেই হয় সেখান থেকে পালিয়ে আসি। এরকম অবস্থায় লোকে সচরাচর যা করে যথা মদ্যপান সে চেষ্টাতেও ত্রুটি ছিল না; কিন্তু আমার জ্ঞান এত টনটনে যে, মাল খেয়ে দুঃখ ভুলে থাকার ন্যাকামিতে আমার গা ঘিনঘিন করে। অভিভাবক হওয়ার দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক জ্ঞান শুনি, আমার আত্মীয়-স্বজনের কেউ কেউ আমার রাজনৈতিক অতীতকে ধিক্কার দিয়ে যান। এগুলো আমাকে স্পর্শ করে না। কারণ যে ভবিষ্যৎ অনিবর্তনীয় নিয়তির মতো তা থেকে পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য তো আমার নেই। আমার এক হিতাকাঙ্ক্ষী আমার ছেলের মঙ্গলার্থে ছেলেকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার পরামর্শ দেন যাতে তার প্রাণ বাঁচার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু আমি সেই পলায়ন চাই না। সেই পলায়নে সাময়িক সমাধান থাকতে পারে কিন্তু অনি তাতে রক্ষা পাবে না তা আমি নিশ্চিত। বরং আমার সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর তা ছাড়া এই অসি হাতে বাঙালী তরুণ তো আমাদেরই উত্তরাধিকার। যারা আজ নেই সেই অসংখ্য তরুণদের বিজয়কেতন তো আজ অনিদের হাতে। আজ যদি অনিরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় আমার কিছু বলার নেই। অন্তত এটুকু বুঝেছি আমার জ্ঞান দেওয়া সাজে না। জ্ঞান দিতে গেলে রণক্ষেত্রে নামতে হবে, যুদ্ধে যেতে হবে। অনিরা যে সব প্রশ্ন তুলেছে তাকে আপ্তবাক্য দিয়ে ধামাচাপা না দিয়ে তার মোকাবিলা করতে হবে। সে ক্ষমতা আমার নেই, কারুর আছে কিনা জানি না। তাই চোখ থেকেও আমি অন্ধ কান থেকেও আমি বধির।

সেদিন ভোরেই ফোনটা পেলাম। মর্গ থেকে অনির দেহ খালাস করার অনুমতি পুলিস দিয়েছে। আমি ফোনের জন্যে তৈরী ছিলাম। স্পষ্ট মনে আছে, গলা কাঁপেনি যখন ফোন তুলেই প্রশ্ন করেছিলাম 'পুলিসকে বোমা মেরেছিল অনি?' আর উত্তর না শুনেই দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছিলাম, 'পুলিসের গুলিতে মরেছে?'

আমার কোন সাড়া ছিল না। কারণ এ তো অনির মৃত্যু না, এ আমারও মৃত্যু, আমার সমাজবাদ স্বপ্ন দেখার মৃত্যু, লেনিন স্তালিন মাও সে তুংয়ের মৃত্যু। খালি একটা ব্যাপারে আমি চমকে উঠেছিলাম যখন হাঁক উঠল, 'চোর অনি, চোর অনি-কেউ এসেছেন?' আমি ধড়মড় করে উঠে পড়ি। বরাবর আমার ধারণা ছিল অনির্বাণ মুখার্জীর নাম চেষ্টা করলেও অবিকৃত থাকে, তার ওরফে নাম গুলে কিংবা হরে বানানো মুশকিল। কিন্তু নাম পাল্টানোর এই ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার তারিফ না করে পারি না' আমার সঙ্গীটি অস্ত্রবিশেষজ্ঞ। তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে অনির ক্ষতস্থান দেখে ফিরে এসে বললেন, 'খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে।' কিন্তু নিজের মৃত দেহের সামনে এলে মানুষের কি কোন বক্তব্য থাকে? আমি ঘাড় ফিরিয়ে খোলা জানলার বাইরে চেয়ে থাকি। ঘুঁটে লাগানো একটা বেঁটে নিমগাছ প্রথম শীতের রোদ পোয়ায়। নীচে এক ফালি হলদে জমিতে দুটো শালিক ঝগড়া করে। অনির রাফ্‌খাতায় অনেক দিন আগে দেখা সেই কবিতার লাইনটা আমার মনে আসে, 'আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে।'

জীবন

....

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

চারদিক ফরসা হয়ে গেল। ভোর। রাত ভাল ছিল। একটা কালো পর্দার মতন ঝুলছিল। একটা ঢাকনা। বাপ্, কী ঘুটঘুটে অন্ধকারই না গেছে। মাথার ওপর বিস্তর তারা জ্বলছিল যদিও। কিন্তু সেসব অনেক দূরে, মাটি থেকে অনেক উঁচোয়। কাজেই তার কাজের কোনোরকম ব্যাঘাত ঘটেনি। নির্বিঘ্নে সব সারতে পেরেছে।

হুঁ, ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, একটা কালো আবরণ। আর চারদিক এমন চুপচাপ থমথম করছিল। এই নীরবতাও একটা পর্দার মতন আবরণের মতন তাকে ঘিরে রেখেছিল। যে জন্য নিশ্চিন্ত মনে সে তার নিজের কাজ সমাধা করেছে। গোলমালের মধ্যে এসব হয় না। খারাপ লাগে। মনে হয় চারদিকে জীবন, আর এ আমি কী করছি! জীবনের গোলমালের মধ্যে জীবন শেষ করা, চিরকালের মতন ফুঁ দিয়ে বাতি নিবিয়ে দেওয়া—বিচ্ছিরি লাগে।

না, কোনো শব্দ ছিল না চরাচরে। কেবল থেকে থেকে হাওয়া উঠে গাছের পাতা সোঁ সোঁ করছিল। কিন্তু সেটাকে শব্দ মনে হচ্ছিল না আওয়াজ মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল কেউ বড় বড় শ্বাস ফেলছে। যেন কেউ কারো নাক চেপে ধরে রেখেছিল, তারপর নাকটা ছেড়ে দিতে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলছে, বড় করে শ্বাস টানছে। রাত্রে সব কিছু অদ্ভুত অন্য রকম মনে হয়।

কিন্তু এখন ভোর হয়ে গিয়ে অন্ধকার ঢাকনাটা সরে যেতে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে না কি। গাছে গাছে অসংখ্য পাখি কিচিরমিচির করছে। জীবনের কলরব।

কাজেই লাস দুটোর দিকে তাকাতে তার এত খারাপ লাগছিল।

ছেলেটার চোখে দুটো কিছুতেই বুজছে না। বউ চোখ বুজে আছে। বউ জানত এমন একটা কিছু করবে মনে মনে ঠিক করে সে দুজনকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালাবার নাম করে এই জঙ্গলের মধ্যে চলে এসেছে।

সন্ধ্যাসন্ধি তারা এখানে এসে পৌঁছেছিল। এই ডালপালা ছড়ান গাছটার নিচে, জায়গাটা একটু পরিষ্কার, কাঁটা ঝোপটোপ তেমন ছিল না, তিনজন বসে পড়েছিল। তারপর সে ঠিক করল রাতটা এই গাছতলায় থেকে যাবে। অন্ধকারে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে ওইটুকুন একটা ছেলে নিয়ে হাঁটার কোনো মনে হয় না। অবশ্য আগেও হাঁটা হয়েছিল প্রচুর। প্রায় সারা দিনই তাদের হাঁটতে হয়েছে, কাজেই রাতটা এখানে থেকে যেতে বউ রাজী হয়েছিল। বেচারাও কি আর হাঁটতে পারছিল। না খেয়ে খেয়ে শরীরে ছিলই বা কী। তা ছাড়া কদিন আগে আতুড়ে একটা সন্তান নষ্ট হয়েছে না?

পুঁটলিটার দিকে এখন তার চোখ পড়ল। যেমন এখন দিনের আলোয় সে বুঝল এটা শিরীষ গাছ। রাত্রে চিনতে পারেনি।

কিন্তু তা হলেও অন্ধকারে সব কিছু চোখ-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। এখন ফরসা হতে সব আবার অচেনা অন্যরকম ঠেকছে। যেন এটা তার পুঁটলি না, অন্য কারো, এখানে ফেলে রেখে গেছে। বা যেন এই গাছতলায়ও সে ছিল না। অন্য গাছের নীচে দুজনকে নিয়ে বসেছিল।

একদৃষ্টে পুঁটলিটার দিকে সে চেয়ে রইল। কিছুই ছিল না সঙ্গে আনার। থালাবাসন অনেক দিন আগেই গেছে। কেবল কিছু ছেঁড়া

জামাকাপড় একটা অ্যালুমিনিয়ামের ফুটো বাটি আর বোধ করি ঘেণ্টুর একটা নতুন জামা আছে। নতুন মানে মাস চারেকের পুরোনো। তখনও তার কাজ ছিল। কারখানা খোলা ছিল। ঘেণ্টু একদিন কি নিয়ে খুব কান্নাকাটি করেছিল বলে জামাটা সে কিনে দিয়েছিল।

এই জামা ঘেণ্টু আর গায়ে দেবে না।

একটা পুরোনো কাঁথা দিয়ে পুঁটলিটা বাঁধা হয়েছে। কাঁথার কাজ কবেই শেষ হয়ে গিয়ে ছিঁড়েকেড়ে ন্যাতা হয়ে গেছে, তাই ওটা দিয়ে পুঁটলি জড়ান।

তা হলেও কাঁথাটার কথা তার মনে আছে। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। কাজ থেকে ফিরে নুন লঙ্কা দিয়ে সে চালভাজা খাচ্ছিল। ঘেণ্টু তখন পেটে। মাথা গুঁজে বউ কাঁথা সেলাই করছিল। হ্যারিকেনের আলোয় লাল সুতো দিয়ে পদ্মফুল তুলছিল।

হুঁ, ঘেণ্টুর ঐ ডোরাকাটা হলুদ জামাটা, কিছু ছেঁড়া কাপড়চোপড় অ্যালুমিনিয়ামের একটা ফুটো বাটি আর আড়াই শ' গ্রামের মতন চিঁড়ে সঙ্গে এনেছিল তারা। রাস্তায় ক্ষুধা পেলে ঘেণ্টু খাবে। তা এখানে বসে ঘেণ্টু চিঁড়েটা খেয়েছে। সামনের ওই পুকুরটা থেকে সে নিজে গিয়ে জল এনেছিল। ঘাসের ওপর মগটা কাত হয়ে পড়ে আছে। ফুটো বাটির সঙ্গে টিনের মগটাও এসেছে। এই তাদের বাসনকোসন। অনেক করে বলতে বউ এক মুঠ চিঁড়ে গালে ফেলে জল খেয়েছিল। চিঁড়ে জল খাবার পর পুঁটলি থেকে বউ একটা ছেঁড়া শাড়ি বের করে বিছানার মতন করে ঘেণ্টুকে শুইয়ে দিয়েছিল। খেতে বসেই ঘেণ্টু খুব ঢুলছিল। সারাদিন এত হাঁটা। মাঝে মাঝে কোলে নিতে হয়েছিল। বউ একবারও ছেলেকে কোলে নিতে পারেনি। নিতে হয়েছিল তাকেই। তার শরীরেও কি আর কিছু আছে। খানিকটা কোলে করে হেঁটে আবার ঘেণ্টুকে নামিয়ে দিয়েছে। এক একবার তার এমন হাঁপ ধরছিল।

নিজের সরু কব্জিটার দিকে চোখ রেখে এখন সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। না খেয়ে, স্রেফ উপোস থেকে থেকে—অথবা যারা না খেয়ে আধপেটা খেয়ে পা পা করে মরণের দিকে এগোচ্ছিল, হুঁ ঘেণ্টু, তার স্ত্রী—তাদের জন্য, চব্বিশ ঘণ্টা দুশ্চিন্তা করে তার শরীরের এই হাল হয়েছে।

ঘেণ্টু শুয়ে পড়তে বউ-ও একটু কাত হয়েছিল। বেচারার চোখও ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। আশ্চর্য, সে নিজে শোয়নি, ঠায় বসে রইল। একটা পেঁচা যেন এই শিরীষ গাছটার মাথায়, খুব করে দুবার ডেকে উঠেছিল। আওয়াজের মধ্যে ওই একটা আওয়াজই তার কানে এসেছিল। বিদঘুটে শব্দ। একবার তার মনে হয়েছিল শব্দটা বুঝি ঐ তারা-জ্বলা আকাশ থেকে ছিটকে পড়ে গাছের মাথায় আটকে গিয়ে ঝুলছিল। হঠাৎ তার এমন মনে হয়েছিল কেন। তার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। তখনি গাছটার দিকে সে চোখ তুলেছিল।

বউ তাকে শুয়ে পড়তে পেড়াপীড়ি করেছিল। সে শোয়নি। বলেছিল তোর এক ঘুম হয়ে যাক তারপর আমি একটু শোবো—সাপখোপ বাঘ ভালুক কত কি থাকতে পারে জঙ্গলে, সকলের এক সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়াটা ঠিক না।

নিশ্চয় বউ তখন থেকে সন্দেহ করছিল। না, কেবল তখন থেকে হবে কেন। সন্দেহ করেছিল আগেই। নিশ্চয় পুঁটলি বাঁধার সময় ছোরাটা দেখে বেচারা কিছু আঁচ করেছিল। সব জিনিষ যখন বেচে দিয়েছে, টিনওয়ালার কাছে ঘেণ্টুর টিনের ভাঙ্গাচুরা খেলনাগুলি পর্যন্ত। হঠাৎ এমন একটা চকচকে ছোরা সে পেল কোথায়, আর ওটা দিয়ে কী কাজ হবে বউ কি একবারও ভাবেনি। নিশ্চয় ভেবেছিল। মুখ ফুটে কিছু বলেনি। মুখ ফুটে কোন্ দিনই বা ও কিছু বলতে পেরেছে। চিরকাল মুখচোরা লাজুক মানুষ। অমন নিরীহ মেয়েছেলে তার কম চোখে পড়ে।

হুঁ, চার মাস ঘর ভাড়া বাকি পড়তে বাড়িওয়ালা রোজ কুকুরের

মতন তাড়িয়ে দিতে চাইছিল। তখন বউকে সে একদিন বলেছিল, তাদের নিয়ে গোবিন্দপুর তার মামার কাছে চলে যাবে। মামার চাষবাস আছে। সেখানে গিয়ে সে খেটে খাবে।

দু' মাসের ওপর তার কারখানা লক-আউট হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়ে বেকার থেকে থেকে দুটো প্রাণীকে নিয়ে সে মরতে বসেছিল, হুট করে একদিন মামার কথা বলতে বউ কি বিশ্বাস করেছিল? কারণ এমন এক মামা আছে তার কোন্ গোবিন্দপুর গাঁয়ে আগে তো তার মুখে শোনা যায়নি।

কাজেই বউ তখন থেকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিল। নিশ্চয় এমন কোনো জায়গায় সে তাদের নিয়ে যাচ্ছে, যেখান থেকে তারা আর কোনো দিন ফিরবে না, বা সেখানে গিয়ে পৌঁছোবার পর তাদের আর বাঁচবার দরকার হবে না, রক্ত মুখে তুলে একটা কাজ একটা চাকরি জোটাবার জন্য তাকেও আর ছুটোছুটি করতে হবে না।

কিন্তু ঠিক এই গাছতলায় আজ রাত্রের মধ্যেই যে ব্যাপারটা সে সেরে ফেলবে এটা হয়তো বউ চিন্তা করতে পারেনি।

হুঁ, আগে সে বউয়ের বুকেই ছোরা বসিয়েছিল। কেননা, সে এটা জানত, বউয়ের যদি ঘুমটা ভেঙ্গেও যায় তবু বেচারা চেঁচামেচি করবে না। ঘেণ্টু জেগে গিয়ে ভয় পাবে এই ভেবে চুপ করে থাকবে, চুপ করে থেকে মরবে। অসম্ভব ধৈর্য রাখত মানুষটা।

অবশ্য ঘেণ্টুটাও আর জাগেনি। ফুসফুসের কাছে ছোরাটা পুচ করে একটুখানি বসিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। আর শ্বাস ফেলেনি। ঘুমের মধ্যেই মরেছে।

তবু এখন দিনের আলোয় দেখা যাচ্ছে ঘেণ্টুটা খোলা চোখে চেয়ে আছে। বউয়ের চোখ দুটো একদম বোজা।

তার খুব ইচ্ছে করছিল ধারে কাছে তুলসীপাতা থাকলে ছিঁড়ে এনে ঘেণ্টুর চোখ দুটো ঢেকে দেয়। বউয়ের বোজা চোখের পাতায়ও তুলসীপাতা দেওয়া যেত। আত্মাটা একটু শান্তি পেত।

কোথায় আর এখন তুলসীগাছ খোঁজাখুঁজি করবে। চোখ ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখল সে। পূব দিকটায় ডালিমদানা ফেটে পড়ার মতন অবস্থা। এখনি রোদ উঠবে। দিনের আলোটাই তার খারাপ লাগছিল। আর রাজ্যের পাখির কিচিমিচির। সারা রাত কোথায় ছিলি ইতরের দল!

চোখ তুলে গাছটার দিকে তাকিয়ে সে ভেংচি কাটার মতন চেহারা করল। তারপর একদলা থুথু ফেলল। রাত জাগার দরুন মুখের ভিতরটা লবণ লবণ লাগছে।

অবশ্য জিভের স্বাদফাদ নিয়ে এখন আর সে মাথা ঘামায় না। এখন একটা মূল ভাবনা তার মাথার ভিতরটা গোলমাল করে দিচ্ছে।

যে জন্য দিনের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘেণ্টুর মার চোখের ভিতরটা দেখতে চেয়েছিল।

ঘেণ্টু বুঝত না। পাঁচ বছরের অবোধ শিশু। ওর তাকিয়ে থাকা চোখ বুজে থাকা এক কথা। কাজেই ছোঁড়া যে মরে গিয়েও ঘোলাটে চোখে তার দিকে চেয়ে আছে এই জন্য মোটেই সে পরোয়া করে না।

ভাবছিল এই মেয়েটির কথা, যাকে একদিন নরসিংপুর গ্রাম থেকে বিয়ে করে এনে ঘরে তুলেছিল। যার নাম কাজল। যদি ঠিক এই সময়টায় ও চোখ মেলে দেখত যে তার ঘরের পুরুষ এখনও এই গাছটার নিচে চুপচাপ বসে আছে, একটার পর একটা বিড়ি টানছে, কেমন ভয়ানক চমক খেত, অবাক হত না?

তাই তো, পুঁটলির ভিতর ছোরা দেখে এবং রাতারাতি তাদের দু'জনকে নিয়ে কোন্ এক মামার কাছে সে যাচ্ছে শুনে বেচারা ঠিকই সন্দেহ করেছিল। কিন্তু তার সন্দেহটা কি কেবল তাদের দু'জনকে নিয়ে হয়েছিল? যে মানুষটা হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে মাইলের পর মাইল তাদের নিয়ে যাচ্ছে সেই পুরুষকে দিয়েও কি তার সন্দেহ ছিল না।

নিশ্চয় ছিল। না হয়ে যায় না। কেননা এই পুরুষ চব্বিশ ঘণ্টা তাদের খাওয়া পরার চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুরে ঘুরে শরীর পাত করছিল, দরজায় দরজায় ঘুরছিল একটা কাজের জন্য চাকরির জন্য, কোথাও ভরসা পায়নি, রাত্রে ঘরে ফিরে দেওয়ালে মাথা ঠুকেছে, যদি বউ বোঝাতে গেছে, হাত ধরে প্রবোধ দিতে গেছে, তার হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছে, বিকৃত গলার কান্না শুনে কতদিন ঘেণ্টু ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে চমকে উঠে কাঁদতে আরম্ভ করত।

তা ছাড়া রাস্তায় আসতে আসতে অন্তত দশবার বউকে সে বুঝিয়েছিল, যদি আমি বাঁচি তোরাও বাঁচবি। আবার উল্টোটাও বলেছিল, যদি তোরা মরিস আমাকেও মরতে হবে। এক দণ্ড আমার তখন বেঁচে থাকা চলবে না, সম্ভব হবে না। হয় এক সঙ্গে বাঁচা, হয় একসঙ্গে তিনজনের শেষ হয়ে যাওয়া। এই কথার অর্থ কি!

নিশ্চয় কাজলের বুকের মধ্যে শেষ সময়েও কথাটা গাঁথা হয়ে ছিল। অর্থাৎ আসলে তারা কেউ বাঁচবে না, তিনজনের একজনও না, উপোস থেকে বাঁচা সম্ভব না। কাজেই সে শেষ হবে, ঘেণ্টু শেষ হবে এবং তারপর তার সোয়ামী, ঘেণ্টুর বাবা, ঘরের কর্তা।

সঙ্গের ছোরাটা এই জন্যই।

কর্তা আগে বউকে মারবে, ছেলেকে মারবে, তারপর নিজের বুকে সেটা বসিয়ে দিয়ে নিজে শেষ হবে।

কিন্তু এখন?

সে প্রায় বেকুব হয়ে গেছে তার নিজের ব্যবহারে।

তখন ভেবেছিল দু' দুটো খুন করার পর একটু দম নিয়ে একটা বিড়িটিড়ি খেয়ে তারপর ছোরাটা বুকের ঠিক মাঝখানে বসিয়ে ওদের পাশে লুটিয়ে পড়বে।

আশ্চর্য একটা বিড়ি খেল, তারপর আর একটা ধরাল, সেটা শেষ করে আবার একটা। আপন মনে বিড়ি টেনে চলল, কবারই হাওয়া

উঠে গাছের পাতার সরসর শব্দ হল, তারপর অন্ধকার ফিকে হতে লাগল, জ্বলজ্বলে তারাগুলি ক্রমে মেদামারা চেহারা ধরল, তারপর কখন ভোর হয়ে চারদিক ফরসা হয়ে গেল বুঝতেই পারল না। তাজ্জব বনে গেল সে। অথচ ছোরাটা কোলে নিয়ে বসে আছে। তার এই ব্যবহারটাকে কী বলা যায়! তাকেই বা এখন কী আখ্যা দেওয়া চলে। কাজেই সে চিন্তা করছে, কাজল চোখে দেখছে না, কিন্তু ওর আত্মাটা তো এখনও ধারে কাছে ঘুরঘুর করছে। সোয়ামীকে এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে আত্মাটা কেমন দুঃখ পাবে? ভাববে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাদের দু'জনকে বাড়ি থেকে এতটা পথ হাঁটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে এনে খুন করল। অথচ নিজের বেলায় সে কিছুই করল না। ছোরাটা আর একবারও হাতে নিচ্ছে না। কেমন স্বার্থপর সে, কতখানি দরদ ছিল তার ছেলে আর বউয়ের জন্য এখন একবার মানুষ এসে দেখুক।

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের ওপর এমন একটা ঘেন্না হল, তারপর চোখ ফেটে জল। মুখের নোনতা স্বাদটা মজে গিয়ে গলার কাছটা তেতো তেতো লাগছিল।

শালার পাখিদের চেঁচামেচি যেন আর থামছে না, থচ্চরের ঝাঁক—চুপ চুপ! গাছের দিকে চোখ তুলে বড় করে একটা ভেংচি কাটল সে, একটা ঢিল ছুঁড়ল। কিন্তু পরের ঢিলটা কুড়োতে গিয়ে তার হাতটা স্থির হয়ে রইল, দূরে একটা শিমূল গাছের গুঁড়ির কাছে তার দৃষ্টিটা দ্রুত ছুটে গিয়ে হঠাৎ যেন আছাড় খেয়ে পড়ল।

কি ব্যাপার! এই জঙ্গলে মেয়েছেলে? হুঁ, পরিষ্কার দেখছে সে একটি মেয়ে শিমূলতলার ওই ঝোপের পাশে একলা চুপচাপ বসে আছে।

তৎক্ষণাৎ সে উঠে দাঁড়াল। কোলের ছোরাটা ছিটকে ঘাসের ওপর পড়ল।

ছোরা পড়ে রইল। লাস দুটো পড়ে রইল। এক পা এক পা

করে সে শিমূল গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। যুবতী। কাজলের বয়সী। পায়ের কাছে একটা রক্তমাখা কাটারি পড়ে আছে। তিন হাত দূরে ঘাসের ওপর দুটো লাস। একটা বয়স্ক মানুষ, একটি শিশু। ঘাসের ওপর আঠা আঠা এত কালচে রক্ত। যেন এখনি দুটো একটা মাছি উড়ছে।

বেশ খানিকটা সময় চোখ গোল করে সে দাঁড়িয়ে রইল। নিশ্বাস ফেলতে পারছিল না। মেয়েছেলেটার কালো ডাগর চোখ বেয়ে টপটপ জল পড়ছে। মুখের ডৌল অনেকটা ডিমের মত কাজলের মুখ গোল চেপ্টা। কাজলের চেয়েও রং এক পোছ ফরসা। অথবা যেন লাল রোদের ছটা লেগে ফ্যাকাশে হয়েও মুখটা এত উজ্জ্বল লাগছে।

হুঁ, ডালিমদানা ফেটে গিয়ে সূর্য উঁকি দিয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে ওদিকটা দেখে আবার সে এদিকে চোখ রাখল। হঠাৎ কি করবে বুঝতে পারছিল না।

অগত্যা একটু কেশে গলার আওয়াজ দিল।

যুবতী চোখ তুলল, তাকে দেখল, কিছু বলল না।

আর এক পা এগিয়ে গেল সে। এখানেও পুরোনো ময়লা শাড়ি পেতে বিছানার মতন করা হয়েছিল, কাঁথার বদলে একটা ছেঁড়া লুঙি জড়ান বেশ বড় পুঁটলি, পাশেই একটা কলাই করা ফুটো থালা পড়ে আছে। সব কিছু দেখে ব্যাপারটা তখনই সে বুঝে গেল।

'সোয়ামী নাকি ?' আস্তে প্রশ্ন করল সে।

'হুঁ', যুবতী মাথা নাড়ল, 'সোয়ামী আর পেটের ছেলে।'

শুনে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে কেমন যেন বিকৃত করে ফেলল সে। পাশের কাঁটানটের ঝোপের গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিল। একটু পরে আবার যুবতীর দিকে তাকাল।

'উপোসকাপাসে দিন কাটছিল বুঝি ?'

যুবতী ঘাড় নাড়ল।

'তা মরদকে দিয়ে এমন শক্ত কাজটা না করিয়ে নিজে করলে কেন?'

'আমার মরদের সাহস ছিলনা, ভেতরটা দুবলা, বলল, তুই আমাদের দুটোকে শেষ কর, তারপর তুই নিজেরটা নিজের হাতে পারবি।'

একটা তেতো ঢোঁক গিলে রক্তমাখা কাটারিটার ওপর একবার চোখ বুলোলো সে। দু' পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকা মরা পুরুষটাকে দেখল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তালুর চুল নেই। দাঁত বেরিয়ে আছে। যেন দু' পাটার দাঁত এক সঙ্গে এঁটে গেছে। তাই হবে হয়তো, চিন্তা করল সে, কাটারির কোপ লেগে খুব যন্ত্রণা পেয়েছিল, পাছে চিৎকার করলে ছেলের ঘুম ভেঙ্গে যায় তাই দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা সহ্য করেছিল। মরা বাচ্চাটাকে দেখল সে। বাচ্চাটা চোখ বুজে আছে। পুরুষটা চেয়ে আছে। এখানেও হতচ্ছাড়া পাখিগুলির চেঁচামেচি।

হলুদ রঙের গোল গোল রোদ শিমুল পাতার ফাঁক দিয়ে সোনার আংটি হয়ে যুবতীর মাথার চুলে পিঠে নাচানাচি করছিল।

'এখন তবে কি ঠিক করলে?' আস্তে বলল সে।

'নিজেরটা তো নিজে সাহস পেলাম না।' যুবতী আঁচলে চোখ ঢাকল। ফুঁপিয়ে একটু কাঁদল। তারপর আঁচল সরিয়ে মুখ তুলল। 'আপনি এই কাটারিটা দিয়ে আমায় শেষ করে যান।'

শুকনো গলায় হাসল সে।

'আমারও যে একই অবস্থা, বউটাকে ছেলেটাকে শেষ করলাম তারপর নিজের বেলায় অস্ত্র ধরতে সাহসে কুলোল না'

চোখ মুছে ফ্যালফ্যাল করে যুবতী এই পুরুষটিকে দেখল। একটু ভাবল। তারপর মাটির দিকে চোখ নামাল।

'তবে এখন কি করবেন ঠিক করেছেন?'

'ভাবছি মেয়েছেলে হয়েও তোমার যখন সাহস আছে তোমার ঐ

কাটারিটা দিয়ে আমাকে শেষ করে দাও। আমাদেরও ঐ একই অবস্থা চলছিল। উপোস করে করে দিন আর কাটছিল না।'

'লাস ছুটো কোথায় ?'

'ঐ যে' আঙুল দিয়ে সে শিরীষ গাছটা দেখাল। 'ঘেণ্টু ও কাজল ওখানে শুয়ে আছে।'

যুবতী কিন্তু সেদিকে চোখ ফেরাল না। একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। যেন নিজের মনে বলল, 'চারদিকে কেবল উপোসকাপাস চলছে, এক একটা পরিবার এই করে করে সাফ হয়ে যাচ্ছে।'

'তোমার সোয়ামী কারখানার মানুষ ছিল বুঝি, ওখানেও লক-আউট চলছিল ?'

যেন কথাটা বুঝল না, বড় বড় চোখ করে যুবতী তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর মাথা নাড়ল।

'লোকের খেতে জন খাটত, দু দুবার বান হয়ে আমাদের উত্তর দেশটা এখন জলের নিচে, জন খাটাবে কে। লাগাড়ে চোদ্দ দিন কেবল শাক খেয়েছি তিনটি প্রাণী। বাচ্চাটা এমনিও মরত, শেষ দিকে হাগা আরম্ভ হল, দেখুন হাড় পাঁজর কেমন বেরিয়ে আছে।'

বাচ্চার দিকে সে তাকাল না। ধপ করে যুবতীর পায়ের কাছে ঘাসের ওপর বসল।

'যে যাবার গেছে, যারা গেল তারা রক্ষে পেল, এখন তুমি নিজে কি ঠিক করলে, আমায়ই বা কি করতে পরামর্শ দেবে '

ঘাড় গুঁজে পায়ের নখ দিয়ে যুবতী ঘাস খুঁটছিল। এক দৃষ্টে চেয়ে দেখল সে। বোঝা যায় একদিন রক্ত টুসটুস করত ঐ পলকা নরম নখের নিচে। ওপরে গোলাপী আভা ফুটত। উপোসে কাপাসে সব ক'টা নখ এখন মরা মাছের আঁশের চেহারা ধরেছে। ঘাস খোঁটা শেষ করে যুবতী করুণ চোখে তার মুখটা দেখল।

'আমি মেয়েছেলে, আমি আপনাকে কী পরামর্শ দেব ! আমারটাই আমি বলছি, কাটারি দিয়ে কুপিয়ে আমায় শেষ করুন, না হলে

সোয়ামীর কাছে আমার অধর্ম্মের শেষ থাকবে না, চিরটাকাল তার চোখে পাপী হয়ে থাকব।' আবার ডাগর চোখের কোণে জল দাঁড়াল।

'পারব না।' ঘাসের দিকে চোখ রেখে সে জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'তোমার ঐ নরম গায়ে আমি কাটারি ছোঁয়াতে পারব না।'

চোখে জল নিয়ে যুবতী হঠাৎ কেমন করে জানি হাসল।

'আপনি পারবেন না, আমিই কি আপনার গায়ে অস্ত্র তুলতে পারব।'

'তবে কি করা।' বিরক্ত হয়ে সে আর এক দলা থুথু ছিটোলো। পাখির কিচিরমিচির অনেকটা কমেছে। রোদের কোলে সাদা সাদা মেঘ দেখা দিয়েছে। জোরে হাওয়া ছাড়ল।

সেদিকে চোখ রেখে যুবতী উদাস গলায় বলল, 'আপনি আমায় বিনাশ করতে পারছেন না, আমি আপনাকে বিনাশ করতে পারছি না। তবে তো দেখছি নতুন করে বাঁচার কথা ভাবতে হয়, নতুন করে জীবন শুরু।'

'তাই আমি চাইছি সোন্দরী, তাই আমায় করতে দাও।' খপ্ করে যুবতীর হাতটা সে মুঠোর মধ্যে টেনে নিল।

যুবতী ঈষৎ লাল হল। ঘাড় নিচু করে বলল, 'কিন্তু পেটের ভাতের জন্যে গায়ের কাপড়ের জন্যে আবার যে আপনাকে রক্ত মুখে তুলে ছুটোছুটি করে মরতে হবে গো মশাই।'

এবার সে থমকে গেল। গাছের আগায় একটা কাঠঠোকরা ঠকঠক করে কাঠ ঠোকরাচ্ছিল।

মানুষের মুখ

দিবোন্দু পালিত

বাড়ি পোঁছে বিভূতি শুনল অজয় তখনো ফেরেনি। সন্ধ্যের আগে কেউ এসে ডেকেছিল ; অজয় তখন খাচ্ছে। ডাক শুনে মুখের খাবার ফেলে চটপট বেরিয়ে যায়। কিছু পরে খেয়াল হতে দরজা খুলে প্রথমে বাসন্তী, তারপর মণিকা বাইরে এসে দেখে কেউ কোথাও নেই। আজকাল এমনিতেই রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে থাকে; আশঙ্কা ও দুর্ভাবনায় আজ আরো বেশি ফাঁকা লাগছিল। শোনা যাচ্ছে পাইপগানের গুলিতে আজও একজন মারা গেছে।

নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ি ফিরেছিল বিভূতি। বাস রাস্তা থেকে আধ মাইল গলি পেরিয়ে আসতে আসতে বার দুয়েক মানুষের গলার শব্দ পেয়েছিল, কয়েকটা কুকুর এবং একটি পাগল ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়েনি। হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনেছিল বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে। অন্ধকার গলির দিকে তাকিয়ে তখনই ভেবেছিল বিভূতি—সে কোন অন্যায় করেনি, কোনোদিন কারুর পিছনে লাগেনি। ন্যায়ত তার খুন হবার কারণ নেই। এই ভেবে ঘড়িটা হাত থেকে খুলে পকেটে রেখেছিল।

এখন মণিকার কথা শুনে সামান্য আশ্চর্যও হল না। উদাসীন গলায় শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কে এসেছিল ?'

মণিকা জানে না। দুপুরে বেরিয়ে, বিকেলের ডাকের চিঠি হাতে নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিল অজয়। এলাহাবাদ থেকে মা কণিকার বিয়ের কথা লিখেছে; মণিকা তখন চিঠি পড়াতেই ব্যস্ত ছিল। বাসন্তীর কথায় হুঁশ হয়। অজয় আবার বেরিয়ে যাবে এবং আর ফিরবে না জানলে দরজায় পাহারা দিত।

এতো কথা বিভূতিকে বলা যায় না। বলেই বা লাভ কী!

'গলা শুনে তো মনে হল শীতল—'

'কোন শীতল ?'

'দোতলা লাল বাড়িটাতে থাকে। অজুর বন্ধু—'

'শীতল কী করে হবে ? বসতে বসতে বিভূতি বলল, 'গত রবিবার ওকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।'

মণিকা আর কিছু বলতে পারল না। আশঙ্কা থেকে শীতলের নামটা মুখে এসেছিল—যদি বিভূতিকে কোনো ক্লু দেওয়া যায়। অজয় সম্পর্কে আলাদা কোনো জ্বালা অনুভব না করলেও এই ব্যাপারে সে পুরোপুরি নির্বিকার থাকতে পারেনি। সন্ধ্যে থেকে এতোটা সময় পর্যন্ত শ্বশুর শাশুড়ীকে সামলেছে, অজয়ের ছোট দীপককে আটকে রেখেছে ঘরে। পাশের বাড়ির বিশ্বনাথ বিভূতির সমবয়সী এবং বন্ধু, তাকেও খবরটা দিতে গিয়েছিল, যদি কিছু করা যায়। খুনের খবরটা সেখানেই শোনে। 'বিভূতি ফিরলে একবার খবর দেবেন।' বিশ্বনাথ বলল, 'এর মধ্যে না ফিরলে একটা কিছু করা যাবে।' এখন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত।

বিশ্বনাথের কথাটা স্বামীকে বলে দরজার পর্দা টানতে গেল মণিকা। তারপর বলল, 'কোথায় আর যাবে! নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। তুমি যেন আর এতো রাত্তিরে গোঁয়াতুর্মি করে খুঁজতে বেরিও না।'

বিভূতি উচ্চবাচ্য করল না। দূরে পর পর বিস্ফোরণের শব্দে তার কাঁধ দুটো সামান্য নুয়ে এলো। মনে হল গলাটা শুকিয়ে আসছে।

এই নিয়ে এ-পাড়ায় খুনের সংখ্যা সাতে দাঁড়ালো। অন্যান্য পাড়া

নিয়ে অনেক বেশি হবে। হিসেবটা মনে থাকে না। খুনটুন এখন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে—এতো স্বাভাবিক যে সকালে উঠে কাগজে খুনের খবর না পেলে স্নায়ুগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে কেমন, স্পষ্ট অস্বস্তি বোধ করে বিভূতি। শুধু মৃত্যু ও গণ্ডগোলের সংবাদের জন্যে আজকাল সকালে ও রাত্রে সে নিচু স্বরে আকাশবাণীর খবর শোনে। রাস্তা দিয়ে হাঁটে খুব সাবধানে, ভিড় বাঁচিয়ে নিজেকে একটুও আহত না করে। হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করে বুকের মধ্যে শিশুর মতো ঘুমিয়ে আছে হৃৎপিণ্ড। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে সে হঠাৎ জীবনের মর্ম বুঝতে শিখেছে।

বিছানায় পা ঝুলিয়ে চুপচাপ বসে থাকল বিভূতি। বারান্দা থেকে ভেসে-আসা ননীমাধবের কাশি শুনলো। শুকনো কাশি ; উত্তেজনা বা পেট গরম হলে এ-রকম হয়। নিজের ঘরে ঢোকার আগে প্যাসেজে ইজিচেয়ারে বসে থাকতে দেখেছিল বাবাকে—অন্ধকারে বিষণ্ণ পড়ে থাকার ধরন দেখেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল। আটটার বেশি রাত হলেই স্বভাবে বলে ওঠে, এতো রাত হল। আজ বলেনি। যতো রাতই হোক, সে তবু ফিরে এসেছে। অজু ফেরেনি।

নিজের ভিতর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল বিভূতি। রক্তাক্ত ছুরিসমেত শীতলকে পুলিসে ধরার পর অজু সম্পর্কেও কিছুটা দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছিল মনে। পারতপক্ষে বাড়ি থেকে না বেরুনোর জন্যে সাবধান করে দিয়েছিল অজুকে। সতেরো বছরের ব্যবধান থেকে কোনো উপদেশ লক্ষ্যে পৌঁছয় বলে মনে হয় না। চাপা হাসিতে অজুর ঠোঁট দুটো বেঁকে গিয়েছিল অল্প। তা হলেও এ-রকম হবে ভাবেনি। আশঙ্কার অনুভূতিটা এখন কিভাবে প্রকাশ করবে বুঝতে পারল না।

এখন বেরুতে হবে ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। কিছুদিন থেকেই নিজেকে প্রাণপণে ভালোবাসতে শুরু করেছে বিভূতি। এই ভালোবাসা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক করে দেয় তাকে। সাঁইত্রিশ বছর

পেরিয়ে এলো—অর্ধেকের বেশি—এখন ক্রমশ এগিয়ে যাবে মৃত্যুর দিকে। আজকাল সে চা খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে, রোজ সকালে ডিম খায় একটি করে। একবুক ঠাণ্ডা ডাবের লোভে টিফিনে অফিস থেকে দূরে চলে যায় লোকচক্ষুর আড়ালে। অফিস থেকে ফেরার পথে ইতিমধ্যে একদিন মিষ্টির দোকানে ঢুকে দুশো রাবড়ি কিনে খেয়েছিল। আগের দিন রাতে তাদের অফিসের পরেশ দাস খুন হয়।

মণিকা ফিরে এলো। থমথমে মুখ। টেবিলের ওপর নিঃশব্দে খাবারের প্লেট নামাতে দেখে বিভূতি জিজ্ঞেস করল, 'কী হল! এতো রাতে খাবার কেন?'

মণিকা জবাব দিল না। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে বলল, 'চা খাবে?'

'না।'

'বেরুতে হলে এই বেলা ঘুরে এসো। যেতেই যখন হবে—'

বলতে বলতে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মণিকা।

বিভূতি জানত তাকে বেরুতে হবে। জানত, অজু সম্পর্কে শেষ সংবাদ আনার দায়িত্ব তার। ননীমাধবের ঘন ঘন শুকনো কাশি, এতো কাণ্ডের পরেও বাসন্তীর কিছু না বলা এবং মণিকার বিরক্ত মুখ, এ সবই তাকে সচেতন করার জন্যে। এতোক্ষণ বসে বসে সে অন্ধকারে নির্জন রাস্তায় হাঁটছিল। মুহূর্তে মুহূর্তে বোমার শব্দ নেই, ভিড় ও জটলা নেই, লোকজনের ছুটোছুটি নেই—নিরাকার জলের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছে বিভূতি। জলের ভিতর ছুঁড়ে দেওয়া পয়সাটা খুঁজে আনতে হবে। না হলে কাশি থামবে না ননীমাধবের, বাসন্তী মুখ দেখাবে না এবং ক্রমশ ক্রুর হয়ে উঠবে মণিকা। সে যেখান দিয়ে হাঁটবে, ছায়ার মতো গোটা সংসারের দুর্ভাবনা অনুসরণ করবে তাকে।

মণিকা ঠিকই বলেছিল, বিভূতি ভাবল, যেতে হলে এখনই বেরিয়ে পড়া ভালো।

ভাবা মাত্র উঠে দাঁড়ালো বিভূতি। উঠতে গিয়ে হাঁটু দুটো কেঁপে উঠল ঈষৎ। গলায় শুকনো ভাবটা যাচ্ছে না। বিছানার একপাশে কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে তার বছর দুয়েকের মেয়ে। বড়োটির বয়স নয়; গোলমাল শুরু হবার মুখে মণিকা তার ছেলেকে বালীগঞ্জে দাদার কাছে রেখে এসেছে—ওদিকে উপদ্রব কম। এই মুহূর্তে ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বিভূতি ভাবল, কপালে থাকলে অজু না ফিরুক, সে নিশ্চিত ফিরে আসবে। এবং নিঃশ্বাস চাপল।

মণিকা ঘরে ঢুকেছিল। বিভূতি বেরুচ্ছে দেখে বলল, 'খেলে না?'

'না।'

মণিকা চুপ করে গেল। তারপর বিভূতির গড়িমসি ভাব দেখে বলল, 'বিশ্বনাথবাবুকে ডেকে নিও।'

তাড়াতাড়ি ফেরার কথাটা আর বলল না। একটু আগে বাসন্তীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে, ছেলেপিলেকে শাসনে না রাখলে এরকমই হয়। একজনের দায় আর একজনকে ভুগতে হবে কেন? বাসন্তী কম কথার মানুষ। বলেছিল, ছেলে তো আমারও। মণিকা আর এগোতে পারেনি। ননীমাধব মরলে বাড়ির অংশ পাবে; না হলে বিভূতিকে আলাদা থাকার পরামর্শ দিত।

বিভূতি বেরিয়ে যেতে ঘরে দাঁড়িয়ে মণিকা ভাবল, সত্যি সত্যিই যদি অজু না ফেরে! দীপকের বয়স বারো, সাবালক হতে এখনো অনেক দেরি। বাসন্তীর সঙ্গে কথাবার্তায় এরপর তাকে আর একটু সাবধান হতে হবে।

বিভূতি বুঝতে পারল না রাস্তায় বেরুবার আগেই কেন সে বার বার রাস্তায় পৌঁছে যাচ্ছে! প্রাণের মায়া? এমন যদি হবে সে অজুর খোঁজে বেরুলো এবং আর ফিরল না। একটু আগে ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মমতায় ভরে উঠেছিল বুক—সে কি নিজের জন্যে! এই চিন্তায় গলা ঘেমে উঠল। জিবে দাঁত বসিয়ে নিজেকে অনুভব করল বিভূতি।

'টর্চ লাগবে?'

জায়গাটা অন্ধকার। দু' প্রান্তের আলো নিবিয়ে মনের ভারসাম্য বজায় রাখছে ননীমাধব। বেসামাল মনে হলে কাশছে। কথা শুনে মনে হবে এতোক্ষণ তার রওনা হবার অপেক্ষায় ছিল!

'টর্চ কী হবে!'

দাঁড়াবে না ভেবেও দাঁড়িয়ে পড়ল বিভূতি। ননীমাধব সম্ভবত আরো কিছু বলবে।

'তোর যতো হয়রানি।' স্টেজ ভাবলে বিভূতি এখন স্টেজে একা। নেপথ্য থেকে সিরসিরে গলায় ননীমাধব বলল 'হারামের নুন বোঝে না! ঘরের লোকের সামান্য দায়িত্ব নিতে পারে না, এরা নাকি সমাজ বদলাবে!'

'এ-সব ভেবে লাভ কী!'

'না, লাভ কিছু নেই। তবে—, থেমে বলল ননীমাধব, 'আছে কি নেই এ-খবরটা তো পাওয়া দরকার।'

বিভূতির মাথা থেকে পা পর্যন্ত গভীর ঠাণ্ডা নেমে গেল। চিন্তাটা এতোক্ষণ ক্রিমির মতো উত্যক্ত করছিল তাকে। বাঁচিয়ে দিল ননীমাধব। কথা শুনে মনে হচ্ছে ননীমাধব তৈরি, শুধ্ খবরটা পেতে চায়। অজুকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তাকে নিতে হচ্ছে না।

স্তব্ধ হাত বাড়িয়ে ননীমাধব বলল, 'টর্চটা রাখো।'

তেলোয় ঠাণ্ডা ধাতুর স্পর্শে চিনচিন করে ওঠে রক্ত। যেমনই হোক, এটাকে অবলম্বন বলে ধরা যায়। অন্ধকারে ননীমাধবের মুখের একটা আদল ধরা পড়ে মাত্র। ইচ্ছে করলে এখন টর্চের আলো ফেলে চোখের ওপর কাঁচাপাকা ভুরু নামানো ননীমাধবের কঠিন মুখটা দেখে নিতে পারে। বিশ্বাস হয় না এই লোকটিই তার জন্মদাতা! কিংবা বলা যায়, নিজে না গিয়ে আমাকে পাঠাচ্ছো কেন! এখনো কিছুদিন আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল!

না, থাক। ননীমাধব ভয় পাবে।

শক্ত মুঠোয় টর্চটা চেপে ধরল বিভূতি। উত্তেজনাটা থিতিয়ে আসতে দিল।

'সন্ধ্যের আগে বেরিয়েছে শুনলাম। আমাকে একটা ফোন করলে না কেন!'

'নিজে বেরিয়েছিলাম।' গলা পর্যন্ত কাশি উঠে এলো ননীমাধবের সম্ভবত সে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। সামলে নিয়ে বলল, 'ফোন করব কোত্থেকে! দোকানপাট সব হুটহাট বন্ধ হয়ে গেল!'

'বিশুদের বাড়িতে ফোন আছে—'

ননীমাধব জবাব দিল না। শুনল কি না বোঝা গেল না। মাথাটা হেঁট করে সামনের দিকে ঠেলে দিল অল্প। তারপর হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে খাড়া উঠে দাঁড়ালো।

'তোর বেরুতে ভয় করছে?'

ঋজু স্পষ্ট উচ্চারণ। যেন কুড়ি বছর পিছিয়ে গিয়ে কথা বলল ননীমাধব, এতো কৈফিয়ত চাইছ কেন! এতোক্ষণের অভিজ্ঞতা দিয়ে একে মেলানো যায় না।

নিজেকে গুটিয়ে নিল বিভূতি।

'ভয় পাবার কথা হচ্ছে না। চার ঘণ্টা পরে আমি তাকে কোথায় খুঁজবো!'

'খুঁজতে হবে না। পারলে থানায় একটা খবর দিয়ে এসো।'

আর কিছু শুনতে চাইল না ননীমাধব। হেঁটে গেল আস্তে আস্তে। হয়তো এরপর বাসন্তীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে; কিছু বলতে চাইবে, পারবে না। তারপর দু' আঙুলে রগ টিপে ধরে বসে পড়বে। এখন কিছু বলার সময় নয়। তাকে বেরুতে হবে।

রাস্তায় পা দিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বিভূতি তার গভীর একাকীত্ব টের পেল। জ্যোৎস্নায় অবারিত কুকুরগুলো কেউ জেগে, কেউ

ঝিমিয়ে বিচরণ করছে সন্তর্পণে। শীত শেষ হয়ে আসছে। খুচরো হাওয়ায় কপালের ঘাম শুকিয়ে এলো। আজ বিকেলে যা'র মৃত্যু হল, মনে হচ্ছে ছুঁয়ে-যাওয়া আলগা হাওয়ায় মিশে আছে তার নিঃশ্বাস। যারা খুন হয়, মৃত্যুর আগে তারা কোন্ কথা ভাবে! যারা খুন করে. খুন করার আগে তারা কোন্ কথা ভাবে! একটি মুহূর্তে এসে তারা কী পরস্পরকে চিনতে পারে! ইতিমধ্যে যদি অজুকে খুন করা হয়ে থাকে তাহলে···, পরবর্তী ভাবনা এসে বিভূতির কণ্ঠরোধ করল। তার হাত-পা শিথিল হয়ে এলো ; এবং স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করল, এক চাঁই বরফের চাপে কাপড়ের নিচে তার পুরুষাঙ্গ ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে।

ইচ্ছে করলে বিভূতি এখন ফিরে যেতে পারে। দরজায় কান লাগিয়ে বসে আছে মণিকা ; পায়ের শব্দে ছুটে এসে দরজা খুলবে। অজু ফিরবে না, বা খুন হতে পারে, এমন ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। এটা ঠিক, ফিরে গেলে ননীমাধবও কিছু বলবে না। বললেও করার কিছু নেই। বাড়িটা তুমি বানিয়েছো, তোমার কর্তৃত্ব বলতে ওইটুকু। কিন্তু, আমি চাকরি করি, সংসারের যাবতীয় ঝামেলা এখন আমাকেই পোহাতে হয়—অজুকে নয় ; ভেবে ছাখো, অজুর চেয়ে আমার জীবনের দাম অনেক বেশি। এইভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করল বিভূতি। কিন্তু, যাকে জোর পাওয়া বলে পেল না। চোখের সামনে তেলতেলে মুখ নিয়ে বার বার ফিরে আসছে অজু। বলা যায় না, অজু হয়তো এখনো বেঁচে আছে। এই মুহূর্তে সে হয়তো বিভূতিরই আবির্ভাবের অপেক্ষা করছে—ছোটবেলায় পুকুরের জলে ডুবতে ডুবতে যেমন চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'দাদা, !' সেইরকম বা অনুরূপ কোনো প্রার্থনায় নুয়ে আসছে ক্রমশ। এ-সময় বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকা দরকার।

বিভূতির শরীর ফুঁড়ে তিরতির করে ঘাম বেরুতে থাকল। তখন সঞ্চয় ছিল ঢের বেশি, অজু না বললেও সমস্ত পেশী জড়ো করে ঝাঁপ

দিতে পারত। জীবনের বিভিন্ন স্বাদ—গার্হস্থ্য ও শারীরিক নানারকম স্বাদ—তাকে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে বাঁচার দিকে। এই দুরবস্থা থেকে অজুই তাকে বাঁচাতে পারে, যদি সে এক্ষুণি ফিরে আসে।

বিপন্ন চোখ তুলে সামনে তাকাল বিভূতি। বহুদূর পর্যন্ত রাস্তা পড়ে আছে শব্দহীন, এলোমেলো হাওয়ার ঘষা লেগে পিচের ওপর শব্দ উঠছে খসখস। একটা শালপাতা উড়তে উড়তে তার পায়ের কাছে সরে এলো। বাঁ দিকে ঘুরে রাস্তাটা যেখানে পুকুরের দিকে চলে গেছে, মনে হচ্ছে সেখান দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে হেঁটে গেল কয়েকজন। ক' মুহূর্ত পরে চাকা ঘষটাতে ঘষটাতে টালমাটাল একটা গাড়ি ছুটে গেল। সম্ভবত পুলিসের গাড়ি—নিঃশব্দ কৌতূহলে কুকুরগুলো দৌড়ে গেল সেদিকে। দূরে পর পর বিস্ফোরণের শব্দ। ভারী রোলারের মতো ফাঁকা রাস্তাটা গড়াতে গড়াতে ঢুকে পড়ল বিভূতির বুকের মধ্যে। অজু ফিরল না।

বিভূতি হাঁটতে শুরু করল। সে এখন আর কিছুই ভাবছে না। বিশ্বনাথ বলেছিল খবর দিতে। আপাতত ভাবল, বিশ্বনাথকে সঙ্গে নিয়ে বেরুবে। তারপর থানায় যাবে বা যা-হোক কিছু করবে। বিশ্বনাথ সঙ্গে থাকলে মৃত্যুর সম্ভাবনা কম; অতর্কিত আক্রমণে তাদের মধ্যে যে-কেউই খুন হতে পারে। বিশ্বনাথের কিছু হলে সে দুঃখ বোধ করবে ঠিকই, কিন্তু নিজে তো বাঁচবে!

দরজায় কলিং বেল টিপে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বিভূতি। জানলা বন্ধ। দৃশ্যমান নয় বলেই ভিতরে অনেকদূর পর্যন্ত নিশুতি ছড়িয়ে পড়েছে মনে হয়। আবার বেল টিপতে আলোর স্যুইচের শব্দ হল। মৃত্যু সম্ভাবনার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তার ইন্দ্রিয়গুলোও সম্ভবত প্রখর হয়ে উঠেছে, না হলে এতো সূক্ষ্ম শব্দটা কানে পৌঁছুতো না।

'কে?'

'আমি।'

জানলাটা খুলে গেল। বিভূতি চিনতে পারল না।

'বিশ্বনাথ আছে তো ?'

'দেখছি।'

পায়ের নিচে মাটি খুঁজল বিভূতি। এখন প্রতিটি মুহূর্তই মনে হচ্ছে মূল্যবান। বাড়ি ফিরে ঘড়িটা তুলে দিয়েছিল মণিকার হাতে। তখনো দশটা বাজে নি। সাধারণত তার ফিরতে এতো রাত হয় না। সহকর্মী পরেশ দাসের মৃত্যু উপলক্ষে ছুটির পর শোকসভা বসেছিল। ভাঙতে ভাঙতে দেরি হয়ে গেল। বেরিয়ে শুনল নর্থ-এ হাঙ্গামা, ট্রাম-বাস বন্ধ। তখন কি করবে না ভেবে ভাবতে ভাবতে শেয়ালদার দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল। ষ্টেশনে পৌঁছে হঠাৎ খেয়াল হল ট্রেন থেকে নেমে বাড়ির দিকে অনেকটা হাঁটতে হবে তাকে। বিপজ্জনক রাস্তা—অফিসে আসার সময় ওদিকে পুলিসের গাড়ি ও মিলিটারী কনভয় ছুটে যেতে দেখেছিল। যদি কোনো কারণে ধরে বা জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে যায়, কবে এবং কি অবস্থাতে ছাড়বে বলা যায় না। ইত্যাদি ভেবে সে আবার হাঁটতে শুরু করে। অনেকটা এগিয়ে একটা পাবলিক বাস পায় এবং উঠে পড়ে। পরেশ দাস না মরলে তার এই হয়রানি হত না।

'ওর তো খুব জ্বর।'

রাত কতো বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তা ও অন্ধকারের দিকে পিছন ফিরে বাণীকে দেখল বিভূতি।

'জ্বর!'

কপালে গোল সিঁদুরের টিপ ধেবড়ে গিয়ে নাক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। নাকের তলায় ও চিবুকে বিজবিজ করছে ঘাম। সম্ভবত মশারির ভিতর থেকে উঠে এলো বাণী। শিকের ফাঁকে মুখটা ঠেলে দিতে মৃদু উত্তেজনা শুরু হল বিভূতির বুকে। তিনদিন পরে মণিকা আজ চুলে তেল দিয়েছিল, সিঁদুর পরেছিল গাঢ় করে। দরজা বন্ধ করার আগে হঠাৎই গা ঘেঁষে এসেছিল। বিভূতি না ফেরা পর্যন্ত বসে বসে হাই তুলবে।

'মণিকা আসেনি ?'

'হ্যাঁ।' আঁচল টেনে গলায় জড়ালো বাণী। 'তখন থেকেই জ্বর! ঘুমুচ্ছে। না হলে বেরুতো।'

সোজাসুজি বাণীর মুখে চোখ রাখল বিভূতি। ইচ্ছে করল ক্রূর হতে। ফর্সা ঘামে-ভেজা কপালে সিঁদুর না রক্ত! ইচ্ছে করল ফিরে যেতে। সে যতোক্ষণ না ফিরবে ননীমাধব জেগে থাকবে। না, সে ধরা পড়তে চায় না।

বিশ্বনাথ বেরুবে না। রাত জুড়ে ঘুমোলে জ্বর ছেড়ে যাবে—কাল সকালে দাড়ি কামিয়ে অফিসে যেতে অসুবিধে হবে না কোনো। যে যার নিজের নিয়মে চলছে। তার কোনো নিয়ম নেই। আপাতত আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে গেল।

'মণিকা আপনাকে ছাড়ল!'

অন্ধকারে টর্চের আলো ফেললে ফুটে বেরোয় দগদগে ক্ষত। খুব দূর দিয়ে ট্রেন চলে যায় হুড়মুড় করে—ছমছমে হাওয়ায় গা ঝাড়তে ঝাড়তে ফিরে-আসা কুকুরগুলি ছুটে যায় আবার। দূরত্বময় তাদের ডাকের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন শালপাতা ও কাগজের কুচির উড়ে যাওয়ার সম্পর্ক থাকে না কোনো। প্রতিটি শব্দই মনে হয় অপরিচিত আক্রমণের রহস্যে ভরা।

জবাব না দিয়ে রাস্তায় নেমে এলো বিভূতি। আলো নিবে যাবার পর এখন সবকিছুই অসম্ভব প্রকৃতিস্থ অসম্ভব শীতল; মনে হয় পৃথিবীর শেষতম মানুষ হেঁটে গেছে এই রাস্তা দিয়ে। বিপ্লব আসছে, কথাটা প্রায়ই কানে আসে—হয়তো এই পথেই বিপ্লব আসবে। বিভূতি এ-সব বোঝে না। সে পড়ে থাকে গভীর অনিশ্চিতির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ভয়ে খাড়া হয়ে ওঠে মেরুদণ্ড!

পরেশ দাস অন্তর্হিত হবার পরের দিন ভোরে বাড়ির দরজায় চটের থলিতে ঢাকা তার কাটামুণ্ড পাওয়া গিয়েছিল। পুলিস এলো কুকুর নিয়ে। কাটামুণ্ডের ঘ্রাণ নিয়ে দুলতে দুলতে কুকুরটা চলে যায়

অনেক দূর পর্যন্ত—যেখানে ওর বিচ্ছিন্ন ধড়টি পাওয়া যায়। এ-সব গল্প বিভূতি শুনেছে অফিসে বসে। নির্জীব শিশুকে কোলে তোলার মতো করে স্বামীর কাটামুণ্ডটি বুকে তুলে ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়েছিল পরেশের অন্তঃসত্বা স্ত্রী। মাস দুয়েকের মধ্যেই বাচ্চা হবে তার। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলল, মুণ্ডু বলেই এমনটি করা সম্ভব হয়েছিল। বেশ বড়োসড়ো শরীর পরেশের, ভারী ধড় ওভাবে তোলা মেয়েমানুষের কাজ নয়।

আকস্মিক ভয়ে টর্চটা পড়ে গেল বিভূতির হাত থেকে। সামনে দুধের ডিপো। পাশ দিয়ে ঘোড়ার নালের মত বেঁকে গেছে গলিটা কিছুদূর গিয়ে আবার মুখ তুলছে বাস রাস্তায়। বাঁক ধরে এগোলে পুকুর, শিব মন্দির, তার পরেই কিছুটা ফাঁকা জমি। এক সময় পুকুরসমেত জমিটা কেনার সাধ হয়েছিল ননীমাধবের। দু মেয়ের বিয়ে দিতে দিতেই সর্বস্বান্ত হল। তারপর কিছুদিন ওই পুকুরে ছিপ ফেলে বসে থাকত মাছের আশায়। সুচতুর মাছের দল সম্ভবত দিনের পর দিন ফাঁকি দিয়ে গেছে তাকে—এখন আর ওমুখো হয় না।

মনে হচ্ছে কারা যেন গলির ভিতর থেকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে। একদলা কফের মতো হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে এলো বিভূতির। একবার ভাবল শব্দের মুখোমুখি হবার আগেই ছুটে বড় রাস্তার দিকে এগোবে। সাহস হল না। রাত্রে ওখানে পুলিস পিকেট থাকে।

ত্রস্ত পায়ে ডিপোর পিছনের দেওয়াল ঘেঁষে সরে গেল বিভূতি—ভালো হয় যদি অন্ধকারে এখন সে সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনজন যুবককে ডিপোর সামনে দিয়ে ছুটে যেতে দেখল। টর্চটা ছিটকে পড়ল দূরে, না সে নিরাপদেই আছে। কুকুরের চীৎকার থেমে যাবার পর ঘর্মাক্ত শরীরে দ্রুত গলির ভিতরে ঢুকে পড়ল বিভূতি। সম্ভবত এ-যাত্রা বেঁচে গেল। বাকি রাস্তাটুকু যেতে পারলে থানায় পৌঁছুবে এবং খবর দিয়ে বলবে, দয়া করে আমাকে

বাড়ি পৌঁছে দিন। ইতিমধ্যে অজু ফিরে এলে ভালো। না হলে ননীমাধবকে বলবে, আর কিছু করার ছিল না। আমাকে ছেড়ে দাও।

দ্রুত হাঁটতে লাগল বিভূতি। ঘামে-ভেজা সর্ব শরীরে এখন সে প্রচণ্ড জোর পাচ্ছে। হাল্‌কা জ্যোৎস্নায় জড়ানো পুকুরটা পেরিয়ে খুব সহজে পৌঁছে গেল শিবমন্দিরের কাছাকাছি। শিবমন্দির পেরোতে গিয়ে আবার থম্‌কে দাঁড়ালো। মুহূর্তে অসাড় হয়ে এলো হাত পা। চাপা গোঙানির শব্দ। চোখ তুলে দেখল, মন্দিরের পাশে নিমগাছের গোড়া বরাবর পড়ে আছে একটা শরীর! মাথাটা নড়ছে অল্প অল্প, আঃ, আঃ, মাঝে মাঝে শব্দ উঠছে মুখ থেকে।

'অজু!' ভয়ার্ত গলায় চীৎকার করে উঠল বিভূতি। শব্দটা কান পর্যন্ত পৌঁছল না। দেখে মনে হয় যুবক। না, অজু নয়। অজুর মাথার চুল এতো ছোট নয়, শরীর এমন লম্বা নয়। আর একটা ফাঁড়া পেরিয়ে এলো বিভূতি। এখন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে চলে যেতে হবে।

যুবকটি পেট থেকে হাত তুলল। জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত জ্যান্ত তার চোখ। মুখ বিকৃত করে একবার ঘাড় তোলার চেষ্টা করল, পারল না। শুকনো জিবে ঠোঁট চাটতে চাটতে কোনোরকমে বলল, 'বাঁচান।' তারপর 'জল—আঃ, একটু জল—'

কথাটা শুনেও শুনল না বিভূতি। বিস্ফারিত চোখে ও শুধু দেখল হাঁ করা পেটের ভিতর থেকে যুবকটির দল পাকানো নাড়িভুঁড়ি ঢলে পড়েছে মাটির দিকে। অন্ত্রের চেহারা এ-রকমই হয়—গলায় থুতু টেনে বিভূতি ভাবল, বলা যায় না, যারা খুন করেছে তারা, বা আর কেউ এখুনি এসে পড়তে পারে। নিঃশ্বাসে কাঁচা রক্ত ও অন্ত্রের ঝাঁঝালো গন্ধ উঠে এলো বিভূতির। বলা যায় না, গন্ধটা হয়তো তার শরীরেও ছড়িয়ে পড়ছে। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রবল, হয়তো এই গন্ধই তাকে সনাক্ত করবে। এই ভেবে সে অন্ধের মতো ছুটতে শুরু করল।

আলো পেল বড় রাস্তায় পৌঁছে। তার সামনে দিয়ে একটা খালি বাস চলে গেল। অনতিদূরে খড়ের আগুন জ্বেলে গোল হয়ে বসেছে রিকশাওয়ালারা। ডানদিকে পুলিস পিকেট এবং বাঁ দিকে থানা। থেমে দাঁড়িয়ে বুকভর্তি হাওয়া টানল বিভূতি। এবং ভাবল, অজু হলে সে নিশ্চয়ই ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করত। ভাবল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এ-পাড়ায় খুনের সংখ্যা সাত থেকে আটে দাঁড়াবে। একদিনে কী দুটোর বেশি খুন হওয়া সম্ভব! ভাবল, অজু হয়তো নিরাপদেই আছে, হয়তো ফিরে আসবে।

তারপর এতোক্ষণ অননুভূত পুরুষাঙ্গ বের করে স্বাভাবিক মানুষের মতো রাস্তার ধারে নর্দমায় পেচ্ছাপ করতে বসল।

সে এবং আমি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ঠিক কোন্ জায়গায় যে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি, মনে পড়ছে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে, রাস্তা পার হয়ে ব্রীজের কোণা দিয়ে, সোজা এগিয়ে লেকের ভেতর দিকের পথটা ধরেছিলুম। চেনা পথ—প্রায়ই তো যাই। হঠাৎ একি। কোথায় এসে পড়লুম!

অন্ধকার এ রাস্তায় থাকেই—কিন্তু আজ যেন কেমন ঠেকছে! এ জায়গা তো চিনি না। লেকটা যেন পদ্মার মত বড় হয়ে গেছে—পেছনের-পীচের পথটা মুছে গেছে, সেই সাজানো গাছগুলোও তো নেই। চেয়ে দেখি বুনোফুলের জঙ্গল—বোঝা যাচ্ছে আলোকলতায় ছাওয়া আর তাতে ঝিকমিক করছে জোনাকী। দুত্তোর—ঢাকুরিয়ার লেকের পাশ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে এ আমি কোথায় এলুম! যাক গে, ভেবে লাভ নেই। পা ব্যথা করছিল—সামনে একটা বেঞ্চিও দেখলুম। ঝুপ করে বসে পড়লুম তার ওপর। তখন কোত্থেকে চোস্ত চোঙা প্যাণ্ট্‌পরা সেই লোকটাও এসে গেল।

সে এসে বললে, 'দাদা, একটা বিড়ি দেবেন?'

বললুম, 'আমি বিড়ি খাই না—সিগ্রেট আছে।'

সে বললে, 'ভুৎ, সিগ্রেটে নেশা হয় না'—এই বলে আমার পাশে বসে পড়ল। আমি সামনের জল আর জোনাকী দেখতে লাগলুম, সে

খুচ খুচ করে পা চুলকোতে লাগল। বোধহয় মশায় কামড়াচ্ছিল তাকে।

তারপর বললে, 'দাদা, আমার সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?'

তারার মেটে মেটে আলোয় তাকে এবার খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। বললুম, 'কী করে বলি, আপনাকে তো চিনি না। তবে মনে হচ্ছে আপনি বছর ত্রিশেকের একজন লোক, চোঙা প্যান্ট্ পরে আছেন আর আপনাকে মশায় কামড়াচ্ছে!'

'না—সে কথা জিজ্ঞেস করছি না। আচ্ছা, আপনার কি মনে হচ্ছে না যে আমার গুরু-দশা হয়েছে, বাবা মারা গেছেন—আর আমি সাহায্যের জন্যে আপনার কাছে হাত পাতছি?'

অ। তাহলে ঝুলির ভেতর থেকে বেড়াল বেরুলো।

বললুম, 'না—মনে হচ্ছে না। গুরু-দশাই যদি—তবে আপনার খোঁচা খোঁচা দাড়ি কোথায়! বেশ কামিয়ে এসেছেন যে।'

'ধরুন, বাবা আজই মারা গেছেন।'

'ধরব না। তা হলে ঘাট থেকে কাচা পরে আসতেন—চোঙা প্যান্ট্ থাকত না, পায়ে জুতোও না।'

সে বললে, 'ও, তাহলে হল না।'

আমি বললুম, 'না।'

আবার সে খুচুর খুচুর করে পা চুলকে ভেবে নিলে একটু।

'আচ্ছা দাদা, আমি তো একজন স্কুল-মাষ্টার হতে পারি। ঘরে অনেক পুষ্যি, হঠাৎ ডিসকার্গড্ হয়ে গেছি—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'কী হয়ে গেছেন?'

'ডিসকার্গড্! ডিসকার্গড্! মানে চাকরী চলে গেছে। তাহলেও কি আপনি আমায় কিছু সাহায্য করবেন না?'

আমি বললুম, 'না করব না।'

'কেন—বেচারী স্কুল-মাস্টারেরর ওপর আপনার কি শীম্পাতি নেই?'

'আপনি স্কুল-মাস্টার হতেই পারেন না।'

'কেন?'

'তা হলে আপনি ডিসকার্গড্ বলতেন না—ডিস্‌চার্জড্ বলতেন। শীম্‌পাতি বলতেন না, সিম্‌প্যাথী বলতেন। আর চোঙা প্যাণ্ট্ কখনো পরতেন না।'

সে নার্ভাস হয়ে গেল।

'এতেও তবে হল না?'

'একেবারেই না।'

সে একটু হতাশ হয়ে এবার কান চুলকোতে লাগল। আর আমি বসে বসে জল আর জোনাকি দেখতে লাগলুম।

একটু থেমে সে আবার বললে, 'আচ্ছা দাদা?'

আমি বললুম, 'হুঁ—শুনছি।'

'আমি তো একটা বারোয়ারী পুজোর জন্যে আপনার কাছে কিছু চাঁদা চাইতে পারি।'

'কী পুজো!'

'এই ইয়ে—ধরুন সর্বজনীন দুর্গা পুজো?'

আমার মন ক্রমশঃ কঠোর হচ্ছিল—বাইবেলে যেমন লেখা আছে: অ্যাণ্ড ফারাওজ্ হার্ট ওয়জ হার্ডেন্‌ড্! বললুম, 'ইয়ার্কি পেয়েছেন? জষ্ঠি মাসে দুর্গাপুজোর চাঁদা?'

'আমরা একটু আগেই আদায়-টাদায় করি।'

'করেন না—বাজে কথা।'

'তা হলে বাজে কথা—' সে আমার সঙ্গে একমত হল। তারপর আবার অন্য কান চুলকে নিয়ে বললে, 'দি আইডীয়া। কাল পাড়ায় সার্বজনীন শনিপুজো, একদম কালেক্‌শান হয় নি স্যার। কিছু দিন।'

আমি মোটা গলায় বললুম, 'আজ মঙ্গলবার। বুধবারে শনিপুজো হয়, কে কবে শুনছে?'

সে বললে, ঠিক-ঠিক, খেয়াল ছিল না। আজ মঙ্গলবারই তো বটে। তা হলে গন্ধেশ্বরী পুজো?'

আমি জিজ্ঞেস করলুম: 'কে গন্ধেশ্বরী?'

এবার সে মাথা চুলকে বললে, 'তা বটে, তা বটে। গন্ধেশ্বরী যে কে সেটা আমারও ঠিক জানা নেই। আচ্ছা দাদা, একটা বাসন্তীপুজো করা যায় না এসময়ে?'

'শাট আপ।'

'ধেৎ, আপনি খালি দমিয়ে দিচ্ছেন।'—খুব মন খারাপ করে বসে থানিকটা, তারপর আবার পা চুলকোতে লাগল খুচ খুচ করে।

'দাদা?'

'হুঁ।'

'আমি একজন বেকার।'

'বেকার অনেকেই।'

'আমাদের গবরমেণ্ট বেকার-ভাতা দেয় না।'

'সে আমি জানি। বছর চারেক আমিও বেকার ছিলুম। এক পয়সাও কেউ দেয়নি।'

'এখন তো চাকরী করেন—তাহলে আমায় কিছু বেকার-ভাতা দিয়ে যান।'

বললুম, 'আমি কেন বেকার-ভাতা দিতে যাব? আমি কি গবরমেণ্ট?'

'আপনি গবরমেণ্ট নন?'

'কস্মিন কালেও না। কোন্ দুঃখে হতে যাব?'

'আমি ভেবেছিলুম, আপনি গবরমেণ্ট্ হলেও হতে পারেন। তা হলে এটা ডেফিনিট যে আপনি আমাকে এখন কিছু বেকার-ভাতা দেবেন না?'

'ডেফিনিট। কিছুই দেব না। আমাকে কে দিয়েছিল?'

'অ। ও লাইনেও হল না।'

বললুম, 'না—কোন চান্স্ নেই।'

সে আবার খুব বিমর্ষভাবে বসে থাকল খানিকটা আর আমি জোনাকী দেখতে লাগলুম। কিছুটা সময় গেল।

তারপর হঠাৎ ভীষণ খুশি হয়ে উঠল সে।

'ইউরেকা দাদা—পেয়েছি।'

'কী পেলেন?'

'আমি কে, সেটা বুঝেছি।'

'কী সেটা, শুনি?'

'আমি একজন ছাঁটাই শ্রমিক।'

'কোথাকার?'

একটা বিখ্যাত কারখানার নাম করল সে।

আমি খুশি হয়ে বললুম, 'বটে—বটে সম্পর্কে আমার এক ভাইপো ওই কারখানার একজন ফোরম্যান তাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারব, আপনি সেখানে কাজ করতেন কি না।'

'অ। তাহলে ফোরম্যানকে জিজ্ঞেস না করে আপনি আমায় কিছু দেবেন না? না।'

'এদিকেও কিছু হল না দাদা?'

'না।'

'হুঁ।'—খুব উদাস ভাবে একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আচ্ছা দাদা, আমি যদি নিতান্তই একজন অনাথ বালক হই—'

'আপনি মোটেই বালক নন'।

'কারো কারো একটু বাড়ন্ত গড়ন থাকে দাদা।'—সে খুব বিনীত হয়ে গেল 'আমি যদি নেহাতই একজন অনাথ বালক হয়ে যাই—আপনি কি আমায় পোষ্যপুত্র নিতে পারেন না?'

আমি খাবি খেয়ে বললুম, 'পোষ্যপুত্র! হরিবল্!'

'কেন, খুব কুপুত্র হব ভাবছেন? দেখবেন মোটেই না। আপনার হাত-পা টিপে দেব, শুলে মশারি ফেলে দেব, মাইরি স্যার—কখনো

পকেট মারব না, আর আপনি মারা গেলে এমন জাঁকিয়ে শ্রাদ্ধ করব না—'

'শাট্‌ আপ।'

'আচ্ছা—আচ্ছা হয়েছে। মারা যাওয়ার কথায় চটে যাচ্ছেন দেখছি। তাহলে আমাকে আপনার বাড়ির রাখাল করুন—চারটি খেতে দেবেন, আমি আপনার গরু চরাব।'

বললুম, 'আমার গরু-টরু নেই, রাখালও চাই না।'

'যাঃ—মিটে গেল!'—বুক-ভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'তা হলে কিছুতেই কিছু হল না দেখছি! একটু দিন না তবে ফিল্ম্‌ লাইনে ঢুকিয়ে? ষ্টার হয়ে যাই?'

বললুম, 'বকবেন না? ওই চেহারা নিয়ে? ছোঃ ভূতের পার্টও দেবে না। ফিলিমের ভূতদেরও ভালো চেহারা হয়।'

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'সব ব্লকড্‌ দেখেছি। কিছুতেই কিছু করা গেল না। আচ্ছা—তবে দাদা মস্তানই হয়ে যাই, কী বলেন? বেশ বড়ো একখানা ছোরা বের করি—অ্যাঁ?'

'অ্যাঁ!!'

আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম। সামনের জলটা খিল খিল করে হেসে উঠল, মিটমিট করে চাপা হাসি হাসল জোনাকীরা।

আধ হাত লম্বা ছোরার ফলা এগিয়ে ধরে খুব নরম গলায় বললে, 'এবারও কি দয়া হবে না দাদা? কিছু দেবেন না?'

ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'সব দেব, সব। কেবল প্রাণটা রাখতে চাই—মানে ওটা দিতে অসুবিধে আছে।'

ভয়ের চমকে ঘুম ভেঙে গেল। বৃষ্টির রাত্রে স্বপ্ন দেখছিলাম। স্বপ্নের কোন মানে হয় না। তবু সন্দেহ হতে লাগল, এই স্বপ্নটার বিশ্রী—খুব বিশ্রী মানে আছে একটা।

মৃত্যুর এপারে এবং ওপারে

প্রফুল্ল রায়

খবরটা এল দিনের শেষে।

শীতের এই অবেলায় রোদের রঙ বাসি হলুদের মতন ; তার তাপ দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে। লাটাইতে সুতো গুটানোর মতন শেষবেলার রোদটুকু কেউ যেন খুব তাড়াতাড়ি টেনে নিচ্ছিল।

আজ ছুটির দিন। বাড়ির সামনে এক চিলতে ঘাসের জমিটায় ইজিচেয়ার পেতে শুয়ে ছিলাম। এখান থেকে যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, আমাদের এই শহরের বাড়িঘর বেশির ভাগই পুরানো, দীন, ভাঙাচোরা। আচমকা এক আধটা নতুন। কোথাও একটানা নিশ্চল ঢেউয়ের মতন টিনের চালের বস্তি, আঁকাবাঁকা রাস্তা, কাঁচা নর্দমা। মাঝে মধ্যে দু-চারটে ঢ্যাঙা চেহারার গাছ অনেক উঁচুতে মাথা তুলে আকাশের গায়ে বিঁধে রয়েছে। দূরে কারখানার চিমনি। তারপর সব ঝাপসা এর মধ্যেই ওখানে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে বুঝিবা।

আকাশের যেদিকে কুয়াশা তার ঠিক উল্টোদিকে প্রকাণ্ড লাল বলের মতন সূর্যটা স্থির হয়ে আছে, তার গা ঘেঁষে ক'টা পাখি উড়ছিল। পাখির ঝাঁক, সূর্য, ধ্বংস-স্তূপের মতন বাড়িঘর—সব একাকার হয়ে শীতের এই বিকেল যেন আলৌকিক একখানা ছবি।

আমাদের এই শহর কলকাতার কাছে, বলা যায় তারই অংশ। কলকাতার তো শেষ নেই ; ইতির পর 'পুনশ্চর' মতন বেড়েই চলেছে অবশ্য এ শহরের পরিচয় দেবার মতন আলাদা একটা নাম আছে ; ধরা যাক রানীবাজার !

সেই দুপুর থেকে ইজিচেয়ারটায় পড়ে আছি। প্রথম প্রথম টাটকা উজ্জ্বল রোদে বেশ আরাম লাগছিল ; সমস্ত শরীর দিয়ে সূর্যের আরক শুষে নিচ্ছিলাম। কিন্তু এখন, এই অবেলায় দিন যত জুড়িয়ে আসছে, বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো হিমও মিশতে শুরু করেছে। খানিক আগে থেকেই টের পাচ্ছি গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

এবার উঠে পড়তে হবে। উঠতে যাব সেই সময় চোখে পড়ল, সামনের খোয়া-ওঠা নোংরা রাস্তা আর কাঁচা নর্দমা পেরিয়ে লোকটা এ পারে ঘাসের জমিতে চলে এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম।

লোকটা মধ্যবয়সী। মাথার চুল কাঁচায়পাকায় মেশানো। দশ বারো দিনের জমানো দাড়ি-গোঁফ মুখময় কাঁটার মতন ফুটে আছে। শক্ত চোয়াল, ভারী ঠোঁট, ভাঙা গাল, ছোট ছোট চোখ অনেকখানি ভেতরে ছড়ানো মোটা নাক, পেটানো লোহার মতন চেহারা। পরনে ময়লা ধুতি আর লং ক্লথের হাফ শার্টের ওপর জ্যালজেলে একটা চাদর এলোমেলোভাবে জড়ানো।

মুখটা চেনা-চেনা মনে হল। কিন্তু কোথায় দেখেছি, এই মুহূর্তে মনে করতে পারলাম না।

আমি তাকিয়েই আছি ; প্রায় পলকহীন, বড় বড় পা ফেলে লোকটা আরো কাছে এসে পড়ল।

আধ ফোটা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কাকে চাই !'

লোকটা বলল, 'আপনাকে !' তার স্বর খাদে-বসা ভাঙা-ভাঙা।

কাছাকাছি আসতে আরো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতন মনে হচ্ছে লোকটাকে। লক্ষ্য করলাম, তার চোখের

সাদা জমি টকটকে লাল, রক্তের ডেলার মতন। চোখ দুটো শুকনো না, ঘোলাটে জলের ভেতর ডুবে আসছে।

লোকটার চোখেমুখে চেহারায় এমন কিছু সঙ্কেত রয়েছে যাতে আমার স্নায়ুগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে। অনুভব করছি, বুকের গভীরে কোথায় একটা ছায়া পড়েছে। অস্বস্তি আর উদ্বেগ নিয়ে আমি তাকিয়েই থাকলাম।

আগের মতন ভাঙ্গা গলায় লোকটা এবার বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

খুবই বিব্রত বোধ করলাম, 'না, মানে ঠিক—তবে চেনা-চেনা—'

লোকটি বলল, 'আমি মন্মথ, মন্মথ দাস। সেই পয়ারপুরে—'

বাকিটুকু শেষ করার আগেই চিনে ফেললাম। ব্যস্তভাবে, খানিকটা আপ্যায়নের সুরে বললাম, 'বসুন—বসুন—'

সামনের একটা বেতের চেয়ারে কুণ্ঠিতভাবে বসল মন্মথ।

বলতে লাগলাম, 'অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম; প্রথমটা তাই ঠিক করতে পারি নি। তারপর আপনাদের খবর সব ভাল!'

'ঐ এক রকম।'

'সুবিনয়দা ভাল আছেন?'

জলপূর্ণ স্থির চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল মন্মথ। তারপর নামিয়ে ঝাপসা গলায় বলল, 'তেনার খবর নিয়েই এইচি।'

'কী, কী খবর?'

'আজ দুপুরবেলা সুবিনয়বাবু মারা গেচেন।'

মন্মথের কণ্ঠস্বর আমার হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা স্রোতের মতন নেমে গেল। মুহূর্তের জন্য মনে হল, আমার হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে শরীর থেকে খুলে যাচ্ছে। প্রতিধ্বনির মতন করে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মারা গেছেন!' মৃত্যুর কথাটা স্পষ্ট শুনবার পরও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।

আস্তে করে অপরাধীর মতন মাথা নাড়ল মন্মথ, 'হ্যাঁ।' তার

ভাবভঙ্গি দেখে বার বার মনে হচ্ছে সুবিনয়দার মৃত্যুর সবটুকু দায়িত্ব তারই।

খানিক আগে লোকটাকে দেখেই মনে হয়েছিল, একটা ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের দূত হয়ে এসেছে ও। আমার ধারণা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

সুবিনয়দার মৃত্যু সংবাদ শুনবার পর স্বাভাবিক হতে সময় লাগল। অনেকক্ষণ পর বললাম, 'হঠাৎ মারা গেলেন; কী হয়েছিল?'

'ক'দিন ধরেই জ্বর; খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আজ ভোর থেকে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। ডাক্তার ডাকবার আগেই মারা গেলেন।'

কৈফিয়ত চাইবার মতন তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'শরীর খারাপ চলছিল; আমাকে খবর দ্যান নি কেন? চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় বিনা ওষুধে লোকটাকে ম'রে যেতে দিলেন? রাসকেল—'

মন্মথের ঘাড় ভেঙে মাথাটা ঝুলে পড়ল। গলার ভেতর থেকে অস্পষ্ট ফিস ফিস করল সে, 'কী করব বলুন। সুবিনয়বাবু কাউকে খবর দিতে বারণ করে দিয়েছিলেন। উনি কেমন মানুষ আপনি তো জানেন। খবর দিলে বিপদ হত।'

মন্মথের অসহায়তা কিছুটা অনুভব করলাম। সুবিনয়দা যেমন জেদী তেমনি একগুঁয়ে এবং আত্মভিমানী। তার আপত্তি সত্ত্বেও আমাকে খবর দিলে ফলাফল ভাল হত না। এবার অনেকটা নরম গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'মৃত্যুর আগে সুবিনয়দা কিছু বলে গেছেন?'

'না।' বলেই কী যেন মনে পড়ে গেল মন্মথের। একটু চুপকরে থেকে দ্বিধাগ্রস্তের মতন সে মুখ তুলল। জড়ানো গলায় বলল 'তবে—'

স্থির উৎসুক চোখে মন্মথের দিকে তাকালাম, 'তবে কী?'

'এদানিং শরীর খারাপ হবার পর বন্দনাদিদির কথা খুব বলতেন।'

মন্মথের মুখ আবার নীচের দিকে ঝুলে গেল।

আমার সবটুকু বিস্ময় আর বিমূঢ়তা একসঙ্গে জড়ো হয়ে বিস্ফোরণের মতন ফেটে পড়ল, 'বন্দনা!'

আস্তে করে মাথা নাড়ল মন্মথ।

অনেকক্ষণ পর মন্মথ বলল, 'আমি আর বসতে পারব না। আপনি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন; আমার সঙ্গে যাবেন।'

আমার বিমূঢ়তা এখনও কাটে নি। বললাম, 'আপনার সঙ্গে কোথায় যাব?'

'কোথায় আর পয়ারপুরে। সুবিনয়বাবুকে নিয়ে শ্মশানে যেতে হবে না? আপনি ছাড়া তেনার আর কোন আত্মীয়স্বজনকে চিনি না। এই শেষ সময়ে আপনার লোক একজন থাকা দরকার; মুখাগ্নি তো করতে হবে।'

আমার কাছে মন্মথের ছুটে আসার কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সেই দুপুরবেলা সুবিনয়দা মারা গেছেন; এখন দিনের আয়ু ফুরিয়ে আসছে। সুবিনয়দার শব এতক্ষণে নিশ্চয়ই শক্ত হতে শুরু করেছে। এখান থেকে পয়ারপুর যেতে কম করেও ঘণ্টাতিনেক লাগবে। তার মানে আমরা পয়ারপুর পৌঁছে সুবিনয়দাকে নিয়ে শ্মশানে যেতে যেতে বেশ রাত হয়ে যাবে!

মন্মথও উঠে পড়েছিল। বললাম, 'দাঁড়ান; বাড়িতে বলে আসছি।'

বাড়ির ভেতর গিয়ে প্রথমে সুবিনয়দার মৃত্যু-সংবাদ দিলাম। জানালাম, পয়ারপুর যাচ্ছি, আজ রাত্তিরে আর ফিরব না।

কিছু টাকা পকেটে পুরে একটু পর মন্মথকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আমাদের এই শহরের ঠিক মাঝ-মধ্যিখানে রেল ষ্টেশন, তার ঠিক গা ঘেঁষেই বাস টারমিনাস। সেখানে গিয়ে মন্মথ আর আমি পয়ারপুরের বাসে উঠে বসলাম।

বাড়ি থেকে বাস টারমিনাস পর্যন্ত পথটুকু আমরা কেউ কথা

বলিনি। নিতান্ত অপরিচিতের মতন নীরবে পাশাপাশি হেঁটে এসেছি।

বাস ছাড়তে এখনও কিছু দেরি আছে কণ্ডাক্টাররা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে প্যাসেঞ্জার ডাকছিল, 'নবীনগঞ্জ—বিবির হাট—পয়ারপুর যাবেন বাবুরা, 'তাদের চিৎকার যেন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম না, আমার কানে অস্পষ্টভাবে তা বেজে যাচ্ছিল।

বাসে উঠবার পর মন্মথই প্রথম কথা বলল, 'সুবিনয়বাবুর আত্মীয়-স্বজনদের একটা খবর দেওয়া দরকার; আমি আবার তেনাদের ঠিকানা-টিকানা জানি না।'

আত্মীয়-টাত্মীয় বলতে সুবিনয়দার তেমন কেউ নেই। আমি ছাড়া এক জেঠতুতো দাদা আছেন; অনেক কাল কানপুরে প্রবাসী। তাঁর সঙ্গে সুবিনয়দার কোন রকম যোগাযোগ ছিল না। তবু বললাম, 'আমি খবর দেব'খন।'

'তাড়াতাড়িই দেবেন। কেউ দূরে থাকলে টেলি করবেন।'

'আচ্ছা।'

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে বসলাম, 'সুবিনয়দার খবর ও'র পার্টি অফিসে দিয়েছেন?'

মন্মথ চমকে উঠল। ব্যথিত করুণ চোখে আমার দিকে একটু তাকিয়ে পরক্ষণেই চোখ নামাল। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বিষন্ন ভারী গলায় বলল, 'না।'

মন্মথ আর আমার মাঝখানে মুহূর্তের জন্য ঘন কুয়াশার মতন কী নেমে এল। দু হাতে সেই কুয়াশা সরিয়ে এক সময় বললাম, 'এ খবরটা দিলে পারতেন; হাজার হোক লোক মরে গেছে। একদিন দলের জন্যে কী না করেছেন সুবিনয়দা!'

বিস্ময়ের সুরে মন্মথ বলল, 'সব জেনেশুনেও পার্টি অফিসে যাবার কথা বলছেন!' তার গলা ভয়ানক কাঁপতে লাগল।

উত্তর দেবার কিছু ছিল না; আমি চুপ করে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর মন্মথ খুব নীচু গলায় ফিস ফিস করল, 'তবে—'

'কী?'

'আপনার কাছে যাবার আগে বন্দনাদিদির বাড়ি গিয়েছিলাম। তেনাকে' সুবিনয় বাবুর খবরটা দিয়েচি।'

চাপা ক্রুদ্ধ সুরে চেঁচিয়ে উললাম, 'কেন —কেন গিয়েছিলেন তার কাছে? জানেন না, সুবিনয়দার কতখানি ক্ষতি করেছে সে? লোকটার জীবন একেবারে ধ্বংস করে দিল, তবু তার কাছে গেলেন?'

মন্মথ আমার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল। থতিয়ে থতিয়ে ভীরু গলায় বলল, 'ঠিক বুঝতে পারি নি। এদানিং মরবার আগে বন্দনাদিদির কথা খুব কইতেন সুবিনয়বাবু; তাই ভাবলাম—'

মানসিক কোন প্রতিক্রিয়া থেকে মন্মথ বন্দনার কাছে গিয়েছিল, কিছুটা অনুভব করতে পারলাম। ঈষৎ নরম সুরে এবার বললাম, 'সুবিনয়দার মৃত্যুর কথা শুনে বন্দনা কী বললে?'

'কিছু না; শুধু বোবার মতন তাকিয়ে রইল। অবিশ্যি—'

'কী?'

'খবরটা দিয়ে আর দাঁড়াইনি; সিদে আপনার বাড়ি চলে গিয়েছিলাম।'

আমি আর কোন প্রশ্ন করলাম না। কখন বাস চলতে শুরু করেছিল, জানি না। এতক্ষণ, সূর্যটা পশ্চিম আকাশের ঢালু পারে সুরু সুতোয় ঝুলছিল। সুতো ছিঁড়ে কখন যে সেটা টুপ করে গাছপালার আড়ালে নেমে গেছে তাই বা কে বলবে।

আমাদের বাস এখন একটা বড় মাঠের মাঝখান দিয়ে ছুটছে। দুধারে ফসলকাটা শূন্য খেত, মজা খাল, নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো। দূরে দূরে অস্পষ্ট আঁচড়ের মতন এক আধটা গ্রাম, কারখানার চিমনি।

মাঝে মাছে বাস থামে; দু-চারটে প্যাসেঞ্জার নামে এক-আধজন ওঠে; তারপরই আবার ছুটে।

সেই বিকেল থেকে বাতাসে হিমের কণা মিশতে শুরু করেছিল,

এখন তার সঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো অন্ধকার মিশছে। গাঢ় বিষাদের মতন শীতের এই মলিন সন্ধ্যা গাছপালা-মাঠ-আকাশ সব কিছু ঝাপসা করে দিচ্ছে।

জানলার ধার ঘেঁসে ছিলাম। শীতের নির্জন মাঠ, আবছা আকাশ, ঘন কুয়াশা—কোনদিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। সুবিনয়দার কথাই ভাবছিলাম।

কিছুদিন আগেও সুবিনয়দা ছিলেন সম্মান, প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষবিন্দুতে। তখন যদি তিনি মারা যেতেন, শীতের এই বিষন্ন সন্ধ্যার মতন আমাদের রাণীবাজার শহরের ওপর শোকের ছায়া নেমে আসত। সুবিনয়দার মৃত্যু-সংবাদ শুনবার সঙ্গে সঙ্গে রাণীবাজারের হৃৎস্পন্দন যেত স্তব্ধ হয়ে। গাড়িঘোড়া দোকানপাট বন্ধ হয়ে যেত। অন্তত কয়েক শ' নরনারীকে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে দেখতাম। কম করে পঁচিশ হাজার শোকাচ্ছন্ন মানুষ দীর্ঘ মৌন মিছিল করে শ্মশানে তাঁকে শেষ বিদায় জানাতে যেত। পরের দিন মিউনিসিপ্যালিটির সামনের প্রকাণ্ড মাঠটায় বিরাট শোকসভা বসত, কলকাতা থেকে বড় বড় নেতারা ছুটে আসতেন। জনমনে সুবিনয় মজুমদারের প্রভাব কতখানি, জাতিকে তিনি কী দিয়ে গেছেন, তাঁর সততা, তাঁর মহত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা নতুন করে শুনতে হত। কিন্তু হায়, মৃত্যুর সেই বিপুল সমারোহ সুবিনয়দার জন্য নয়। রাণীবাজার থেকে অনেক দূরে প্রায় নির্বাসনে করুণ বিষণ্ণ অগৌরবের মৃত্যু তাঁকে মাথা পেতে নিতে হল। অথচ কয়েক মাস আগেও কে ভাবতে পেরেছিল এমন নিষ্ঠুর পরিণাম তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।

·

সুবিনয়দাকে প্রথম দেখেছিলাম কবে? বছর বারো আগের সেই দিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে, চোখ বুজলে ছবির মতন দেখতে পাই।

পশ্চিম বাঙলার সুদূর মফঃস্বল থেকে জীবিকার খোঁজে সেদিন

আমি রাণীবাজারে এসেছিলাম। সুবিনয়দার সঙ্গে আমাদের লতায়-পাতায় কি রকম একটা আত্মীয়তা ছিল।

সে সময় রাণীবাজারে সুবিনয়দা ছিলেন সর্বভারতীয় একটা বড় রাজনৈতিক দলের স্থানীয় শাখার নেতা। তাঁর নাম, তাঁর খ্যাতি রাণীবাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে সমস্ত বাঙলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল, সুবিনয়দার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ভাঙিয়ে নিজের সুবিধা করে নেওয়া।

আগে থেকে চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করেছিলাম, সুবিনয়দা আমাকে সোজা পার্টি অফিসে চলে আসতে লিখেছেন। চিঠিতে আমার উদ্দেশ্য জানাই নি, শুধু লিখেছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

রাণীবাজারে নেমে সুবিনয়দা এবং তাঁর পার্টি অফিস খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয়নি। তখন তুপুর। পুরনো একতলা বাড়ির মাঝারি একখানা ঘরে পার্টির অফিস, সামনে দরজার মাথায় ছোট সাইনবোর্ড ঝুলছিল। ভেতরে গোটা তুই কাঠের আলমারি, খানকতক চেয়ার, তুটো টেবিল। একধারে তক্তপোশে ময়লা চিটচিটে বিছানা পাতা। সেই তুপুরবেলায় পার্টি অফিসে বিশেষ ভিড় ছিল না। তিন চারটি যুবক একটি তরুণী আর তুজন প্রৌঢ় চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিলেন।

মনে আছে, আমি ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে যুবকেরা চলে গিয়েছিল। তরুণী এবং প্রৌঢ় তুজন তখনও বসে। তরুণীর বয়েস সাতাশ আটাশের মতন, গায়ের রঙ উজ্জ্বল। মুখ চোখ কটা-কটা, সুশ্রী। মেয়েটির ঐশ্বর্য হচ্ছে তার স্বাস্থ্য, এমন সুদেহিনী কদাচিৎ চোখে পড়ে। পরনে সাদা খোলের সবুজ-পাড় শাড়ি আর হাতায় ফুলতোলা সাদাসিধে একটা ব্লাউজ।

প্রৌঢ়দের একজন গোলগাল, থলথলে। চোখ তুটি ছোট ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ। চাপা ঠোঁটে কাঠিন্য। অন্য প্রৌঢ়টি রীতিমত সুপুরুষ।

লম্বাটে মুখ, বড় বড় দূরমনস্ক চোখ, হাত দুটি অস্বাভাবিক লম্বা—প্রায় জানুর কাছাকাছি নেমে এসেছে। তাঁর দিকে তাকালে অরণ্যের মাঝখানে সমুন্নত ঋজু গাছের কথা মনে পড়ে যায়। পরনে খাটো ধুতি আর আধময়লা হাফ শার্ট, পায়ে মোটা চপ্পল।

তিনজনেই জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সুবিনয়দাকে আগে কখনও দেখিনি, তাই চিনতে পারছিলাম না। লম্বা সুপুরুষ প্রৌঢ়টি জিজ্ঞেস করেছিলেন 'কাকে চান ?'

কাঁপা গলায় উত্তর দিয়েছিলাম, সুবিনয় মজুমদার।

'আমিই সুবিনয়।'

দেশজোড়া যাঁর নাম সুবিনয় মজুমদার আমার সামনে বসে। থাক আত্মীয়তা, তবু হঠাৎ শীত লাগার মতন গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। পরক্ষণেই এগিয়ে গিয়ে অনেকখানি ঝুঁকে প্রণাম করেছিলাম।

বিব্রতভাবে পা সরাতে সরাতে সরাতে সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'আরে আরে, প্রণাম কেন ?'

মুখ তুলে বলেছিলাম, 'আজ্ঞে আমি অমিয়।'

সস্নেহে হেসেছিলেন সুবিনয়দা, 'তুমিই অমিয়? বেশ বেশ, বোসো। তোমার শেষ চিঠিটা পরশু দিন পেয়েছি।'

ওধারের তক্তপোশটায় গিয়ে বসতেই সুবিনয়দা আবার বলেছিলেন, 'রাস্তায় আসতে কষ্টটষ্ট হয় নি ?'

'আজ্ঞে না।'

'আমাদের পার্টি অফিস খুঁজে বার করতে অসুবিধে হয়েছিল ?'

'একটুও না। সাইকেল রিকশায় উঠে আপনার নাম বলতেই সোজা এইখানে নিয়ে এসেছে।'

এবার প্রশ্ন করে করে আমার বাবা-মা ভাই-বোন থেকে শুরু করে আমাদের সংসারের অনেক কথা জেনে নিয়েছিলেন সুবিনয়দা। তারপর কী মনে পড়তে দ্বিতীয় প্রৌঢ় এবং তরুণীটির দিকে ফিরে ছিলেন। তাঁরা তখনও উৎসুক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে।

সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

গোলগাল প্রৌঢ়টির নাম এতক্ষণে জানা গিয়েছিল—পরমেশ সান্যাল, সুবিনয়দাদের পার্টির লোকাল কমিটির সেক্রেটারি। মেয়েটির নাম বন্দনা দত্ত, সেও পার্টির স্থানীয় শাখার সভ্য, খুব ভাল কর্মী।

আমাকে দেখিয়ে সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'আর এ হল অমিয়—অমিয় চক্রবর্তী, আমার মাসতুতো ভাই।'

পরিচয় টরিচয়ের পর পরমেশ সান্যাল আর বন্দনার সঙ্গে আমার দু-একটা কথা হয়েছে। তারপর ওঁরা উঠে পড়েছিলেন।

বন্দনারা চলে গেলে ঘর ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। পার্টি অফিস সম্বন্ধে আমার আগেই কিছু ধারণা ছিল, সবসময় সেখানে মেলা লেগে থাকে। তার ওপর সুবিনয় মজুমদারের মতন নেতাকে একা পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। কাজেই এ সুযোগ ছাড়তে চাইনি। দ্বিধাগ্রস্তের মতন বলেছিলাম, 'আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি সুবিনয়দা।'

সুবিনয়দা বলেছিলেন 'সব শুনব । তার আগে স্নান টান করে খেয়ে নাও। অনেকটা রাস্তা এসেছ, নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।'

আগে লক্ষ্য করিনি, আমি যে তক্তপোশটায় বসেছিলাম তার তলায় হাঁড়ি-ডেকচি, এনামেলের থালা-গেলাস, ষ্টোভ, রান্নার নানারকম সরঞ্জাম। সুবিনয়দা ষ্টোভ বার করে রান্না চড়িয়ে দিয়েছিলেন। রান্না আর কী, স্রেফ ভাতে ভাত।

হাঁড়ির ভেতর একসঙ্গে চাল, আলু, ডিম-টিম ছাড়তে ছাড়তে সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'সেদ্ধভাত ছাড়া আমি আর কিছু রাঁধতে পারি না, তোমার কিন্তু খেতে খুবই কষ্ট হবে।'

বিব্রতভাবে বলেছিলাম, 'না-না, কষ্ট কিসের—'

'আসলে ব্যাপারটা কী জানো অমিয় ভালরকম রান্না যে শিখব তার সময় নেই। সারাদিনই পার্টির কাজ। তার ভেতর এক ফাঁকে চাট্টি ফুটিয়ে নিই। সমস্ত জীবন এইরকম চলছে।'

হঠাৎ একটা কথা মনে হতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি কি এই পার্টি অফিসেই থাকেন সুবিনয়দা ?'

'না হলে আর কোথায় থাকব ?' তক্তাপোশের ওপর ঢালা নোংরা বিছানা দেখিয়ে হাসতে হাসতে সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'ঐ যে অনন্তশয্যা পাতা রয়েছে। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত পার্টির কাজে কেটে যায় ; তারপর চোখের পাতা যখন আর মেলে রাখতে পারি না তখন ওখানে লম্বা হয়ে পড়ি।'

এবার আর উত্তর দিইনি ; কিছুটা অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিলাম যেন। ছেলেবেলা থেকে সুবিনয় মজুমদার নামে এই মানুষটির কথা শুনে এসেছি। আমার মনের মধ্যে তাঁর 'ইমেজ' কোন বিস্ময়কর রূপকথার নায়কের মতন। শুনেছি অসাধারণ ছাত্র ছিলেন সুবিনয়দা, ম্যাট্রিক এবং ইন্টারমিডিয়েটে স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। বাবা ছিলেন নামকরা অ্যাডভোকেট। শিল্পপতি, বড় বড় ব্যবসায়ী, আই-সি-এস অফিসার—সমাজের উচ্চ চূড়ের মানুষগুলোর সঙ্গে ছিল তাঁর খানাপিনা, চলাফেরা, ওঠাবসা। মোট কথা, লোভনীয় ফলের মতন একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুবিনয়দার হাতের কাছেই ছিল ; পেড়ে নেবার শুধু অপেক্ষা। কিন্তু থার্ড ইয়ারে উঠেই কি হয়ে গেল, রাজনীতি তাঁকে সম্মোহিত করল। একদিন দেখা গেল, পার্টির টানে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। সেই যে বেরুলেন, আর ফেরেননি। সুখের মোড়কে-ঢাকা ভবিষ্যতের কাম্য জীবন হাজার মাইল দূরে পড়ে রইল।

সুবিনয়দা অবিবাহিত। শুনেছি পার্টির জন্যই তাঁর ঘর-সংসার করা হয়ে ওঠেনি। রক্ত-মজ্জা-অস্থি-মেদ নিজের বলতে সব কিছুই তিনি পার্টির কল্যাণে উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু সুবিনয়দা যে পার্টি-অফিসেই থাকেন এবং নিজের হাতে রেঁধে খান, এতটা ভাবিনি।

একসময় সুবিনয়দার গলা কানে এসেছিল, 'ভাত ফুটতে থাক ; এসো আমরা স্নান-টান করে নি।'

পার্টি-অফিসের ঠিক পেছনেই টিনের চালের বাথরুম। সুবিনয়দা আর আমি একে একে স্নান করে এসেছিলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'এবার যে জন্যে এসেছ, বল—'

করুণ মুখে জানিয়েছিলাম, আমার একটা রোজগারের পথ চাই। চাকরি-বাকরি অথবা অন্য যে কোন রকমের জীবিকা। এবং সুবিনয়দাকে তার ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।

শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন সুবিনয়দা। অনেকক্ষণ পর ধীর শিথিল স্বরে বলেছিলেন, 'কিন্তু—' ছুরি দিয়ে দাগ টানার মতন তাঁর কপালে চিন্তার কটি রেখা ফুটে উঠেছিল।

ব্যাকুলভাবে বলেছিলাম, 'অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আমি জানি আপনার সঙ্গে অনেক লোকের জানাশোনা, আপনি একটু বলে দিলেই আমরা বেঁচে যাই।'

'অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে ঠিকই; অনুরোধ করলে তারা হয়তো রাখবেও। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো?'

আকণ্ঠ উদ্বেগ নিয়ে সুবিনয়দার দিকে তাকিয়েছিলাম।

সুবিনয়দা থামেননি, 'ব্যাপারটা হল তোমার জন্যে কারোকে বলার অসুবিধে আছে।'

রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন?'

'তুমি আমার আত্মীয় যে। লোকে বলবে সুবিনয় মজুমদার নিজের লোকের জন্যে উমেদারি করে বেড়াচ্ছে। তাতে পার্টির ইমেজ খারাপ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমার একটা কিছু না হলে আমাদের সংসারটা একেবারে ভেসে যাবে।' আমার গলা হতাশায় বুজে আসছিল।

সুবিনয়দা কঠোর নীরস গলায় এবার বলেছিলেন 'পার্টির ক্ষতি হয়, এমন কোন কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। তবু তুমি

যখন এসেই পড়েছ তখন দেখি কী করা যায়। তবে খুব একটা ভরসা কোরো না।'

সেদিন আমার যা মানসিক অবস্থা তাতে সুবিনয়দার ওপর রাগ হয়েছিল, ক্ষোভ হয়েছিল, দুরন্ত অভিমানে মন ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরে বুঝেছি, সুবিনয়দার ঐ কথাগুলোর মধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক চরিত্রের আভাস ছিল। সে চরিত্র দৃঢ় কঠিন, আপসহীন এবং সৎ। রাজনীতির ব্যাপারে সততা ছাড়া আর কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আমার এই বোঝাটা অনেক পরের ব্যাপার।

সুবিনয়দা আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় পার্টি অফিসে লোকজন আসতে শুরু করেছিল। তাদের বেশির ভাগই তরুণ কর্মী, ক'টি মেয়েও ছিল। আমার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সুবিনয়দা তাদের সঙ্গে আলোচনায় মেতে উঠেছিলেন।

ওদের আলোচনার মধ্যেই বন্দনা দত্ত আবার পার্টি অফিসে ফিরে এসেছিল। তার কিছুক্ষণ পর পরমেশ সান্যালও।

সেই তক্তপোশটার ওপরেই আমি বসে ছিলাম। সুবিনয়দারা কী বলছেন, সেদিকে আমার মনোযোগ ছিল না। নিজের কথাই শুধু ভাবছিলাম আর অন্যমনস্কের মতন পার্টি অফিসের খোলা দরজার বাইরে তাকিয়েছিলাম।'

তখন ঠিক দুপুরও না, আবার বিকেলও না রোদে সবে হলুদ আভা লাগতে শুরু করেছে। আকাশের গড়ানো পার বেয়ে সূর্যটা পশ্চিম দিকে অল্প একটু নেমে গেছে। পার্টি অফিসের সামনের রাস্তাটা তখন প্রায় নির্জন। কদাচিৎ দু-একটা লোক, এক-আধটা সাইকেল-রিকশা নজরে পড়ছিল।

মনোযোগ ছিল না তবু সুবিনয়দাদের টুকরো টুকরো কথাবার্তা আমার কানে আসছিল।

'ঢালীপাড়ার ঐ দিকটায় পোস্টারগুলো মারা হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'ওখানে আমাদের 'বেস' খুব উইক। প্রথম থেকেই ভাল করে নজর দেওয়া হয়নি। মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন এসে গেল তাড়াতাড়ি মিটিং ডাকা দরকার।'

'এখনও তোমরা মিটিং ডাকার কথা ভাবছ? ওদিকের পার্টি আসছে রবিবার মিটিং ডাকবে বলে শুনছি।'

'সে কি!'

'তোমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ বলে আর সবাই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে, এ কথা ভাবছ কেন?'

'তা ঠিক। কিন্তু ঢালীপাড়ায় ওদের দারুণ হোল্ড। তার ওপর মিটিং-টিটিং করতে দিলে আমাদের কোন চান্স থাকবে না। ওরা যাতে মিটিং করতে না পারে, দেখতে হবে। বার বার আমরা ওখানে হারছি আমাদের ক্যাণ্ডিডেটকে যেমন করে হোক জিতিয়ে আনতেই হবে।'

হঠাৎ সুবিনয়দার উত্তেজিত চড়া গলা শুনতে পেয়েছিলাম, 'সমীর—'

সমীর নামের ছেলেটা তক্ষুনি সাড়া দিয়েছিল, 'কী বলছেন?'

সুবিনয়দা বলছিলেন, 'ঢালীপাড়া সংগঠনের ভার দেওয়া হয়েছিল তোমাকে। এক বছর সময় পেয়েছিলে, কিন্তু তার মধ্যে কিছুই করে উঠতে পারনি। এখন অন্যেরা মিটিং করলেই তোমার আপত্তি!'

এবার পরমেশ বলেছিলেন, 'পলিটিকসে একটু-আধটু কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। ওটা এমন কিছু দোষের না। ওদের মিটিং ভেঙে দিলে আমাদের যদি কিছু লাভ হয় ক্ষতি কী?'

কঠিন গলায় সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'এ লাভে আমার বিশ্বাস নেই। যদি মনে কর আমাদের ক্যাণ্ডিডেট জিততে পারবে না, তা হলে এ বছর ক্যাণ্ডিডেট দিও না। পরের বার ভাল করে

অর্গানইজ করে দিও। কিন্তু নিজেদের সুবিধের জন্য অন্যের ওপর হামলা করতে যাওয়া, এতে আমার সায় নেই। আখেরে তাতে ফল ভাল হয় না।'

পরমেশ এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন, 'শুধু ঢালীপাড়ায়? নতুন বাজার, কাপড় পট্টি, রিফিউজি এলাকা—অনেক জায়গাতেই আমাদের 'বেস' উইক। আপনার যুক্তি মানলে তো এই সব জায়গায় ক্যাণ্ডিডেট দেওয়া যায় না।'

'না দেওয়াই উচিত। সস্তায় বাজিমাৎ না করে সংগঠনের দিকে নজর দাও, পার্টিকে দীর্ঘজীবী করতে চাইলে সংগঠন সবার আগে দরকার; পার্টির পক্ষে ওটা টনিক। একবার যদি ভিত তৈরী করে দিতে পার তারপর আর মার নেই। একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।'

'কী?'

'শুধু ইলেকশন জেতার জন্যে কোন পার্টির সৃষ্টি হয় না; হয় মানুষের কল্যাণের জন্যে।'

'কিন্তু—'

'বল—'

'ইলেকশন জিতে ক্ষমতা দখল করতে পারলে মানুষের আরো ভাল করা যায়। যেভাবেই হোক পাওয়ার দখল করাই আসল কথা।'

হঠাৎ ঘরের দূর প্রান্তে কে একজন সতর্ক চাপা গলায় বলে উঠেছিল, 'ও সব কথা এখন থাক সুবিনয়দা; পরে আলোচনা করা যাবে।'

তারপরেই লক্ষ্য করেছিলাম, সমস্ত ঘরখানায় অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এসেছে। এমন স্তব্ধতা যা আমার অন্যমনস্কতাকেও নাড়া দিয়েছিল। বাইরের রাস্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘরের ভেতর তাকিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছি। ঘরের সব ক'টা চোখ তখনও আমার ওপর স্থির, নিবদ্ধ।

বুঝতে পারছিলাম, আমার মতন একটা লোক যে পার্টির মেম্বার না, পার্টির সঙ্গে যার বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই—অফিস ঘরে বসে থেকে সুবিনয়দার আলোচনায় রীতিমত ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি। খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলাম, কিন্তু উঠে যে বাইরে চলে যাব, তাও পারছিলাম না।

সুবিনয়দার কাছে সেই যে এসেছিলাম, তারপর দিন তিনেক কেটে গেছে। আমি পার্টি অফিসেই আছি। সুবিনয়দা স্পষ্ট করে আমাকে কিছু বলেননি, তাই বাড়ি ফিরে যেতে পারছিলাম না। 'দেখি, কী করা যায়—' এরকম একটা ভাব সুবিনয়দার। আমাকে নিয়ে তিনি যে চিন্তায় পড়েছেন, টের পাচ্ছিলাম। আমারও সামনে পিছনে কোন পথ খোলা ছিল না। যতক্ষণ সুবিনয়দা স্পষ্টাস্পষ্টি 'না' বলে দিচ্ছেন ততক্ষণ রানীবাজারের মাটি কামড়ে পড়ে থাকব, ঠিক করেছিলাম।

এই তিন দিনে সুবিনয়দাকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। রানীবাজারে আসার পরদিনই জানতে পেরেছিলাম সুবিনয়দা তাঁদের পার্টির লোকাল কমিটির প্রেসিডেন্টও নন, সেক্রেটারিও না; সাধারণ একজন সভ্য মাত্র। তবে সেই সময়টা তাঁকে ট্রেজারারের কাজও চালিয়ে যেতে হচ্ছিল। কেননা যিনি কোষাধ্যক্ষ ছিলেন কিছুদিন আগে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে। যতদিন নতুন কেউ ট্রেজারার নির্বাচিত না হচ্ছেন, পার্টির 'আপার' কমিটি থেকে সুবিনয়দাকে এই দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছিল।

ইচ্ছা করলে অনায়াসেই সুবিনয়দা লোকাল কমিটির সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন। লোকাল কমিটিই বা কেন, তাঁদের সর্বভারতীয় দলে আরো অনেক অনেক উঁচুতে উঠতে পারতেন সে ডাকও তাঁর কাছে এসেছিল। কিন্তু এই রানীবাজারে যেখানে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু, বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠা, সেখান থেকে

কোথাও যেতে চান না সুবিনয়দা। এখানকার লোকাল কমিটিতে সামান্য একজন সভ্য হিসেবেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান তিনি; রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা বা ক্ষমতার দিক থেকে এর বেশী আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই।

লক্ষ্য করেছি, সাধারণ সভ্য হওয়া সত্ত্বেও পার্টির সবাই তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত; পার্টির ওপর তাঁর প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী ঈশ্বরের মতন। সুবিনয়দার চরিত্রে সারল্যের সঙ্গে দৃঢ়তা এমনভাবে মেশানো ছিল যা মুগ্ধ করে। সততা, সংযম, নিষ্ঠা এবং নীতির প্রতি আনুগত্য—সুবিনয়দার মধ্যে এতগুলো আকর্ষণের মেলা সাজানো ছিল।

তবে ট্রেজরার হিসেবে তাঁর কাজে আমার খটকা লেগেছে। তালাহীন একটা টিনের বাক্সে টাকা-পয়সা থাকত। পার্টির কাজে যখন যা দরকার সুবিনয়দাকে বলে ছেলেমেয়েরা সেখান থেকে নিয়ে যেত। সুবিনয়দা কোন হিসেব রাখতেন না। শুধু বলতেন, 'কে কি নিলি, লিখে রাখিস—'

সুবিনয়দাকে একলা পেয়ে একদিন বলেছিলাম, 'এ আপনি কী করছেন সুবিনয়দা; হিসেব টিসেব রাখুন। পরে গোলমাল হতে পারে।'

একদৃষ্টে আমাকে দেখতে দেখতে সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'বন্দনাও হিসেব রাখার কথা বলে। কিন্তু সামান্য ক'টা টাকার জন্যে ওরা আমাকে বিপদে ফেলবে ভেবেছ? কখনো না।'

আমার কান লাল হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারছিলাম, মানুষকে অবিশ্বাস করতে শেখেননি সুবিনয়দা। কিন্তু সেদিন কে ভাবতে পেরেছিল, মানুষের প্রতি অসীম বিশ্বাসের মধ্যেই সুবিনয়দার মৃত্যুবাণ শাণিত হচ্ছে।

সুবিনয়দা আমার চোখমুখ লক্ষ্য করে এবার নরম গলায়

বলেছিলেন, 'আসলে তোমরা আমাকে ভালবাস, তাই ওকথা বলেছ। আসলে টাকা-পয়সার ব্যাপারে দুর্ভাবনার কিছু নেই।'

যাই হোক, পার্টি অফিসে থাকার জন্য খুবই অসুবিধে হচ্ছিল। আমার দিক থেকে বটেই, সুবিনয়দাদের দিক থেকেও।

পার্টি অফিসে নানারকম কথাবার্তা হয়। দলের নীতি এবং সেই নীতির রূপায়ণ সংক্রান্ত আলোচনাই বেশি। তার ফাঁকে অন্য দলগুলোর উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতি নিয়ে রসালো ঝাঁঝালো মন্তব্য। তা ছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রভাব খর্ব করে নিজের দলকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ছক কাটা তো আছেই।

আমার মতন একজন বাইরের লোক সামনে বসে থাকলে গোপন রাজনৈতিক আলোচনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। আবেগ বা উত্তেজনার বশে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়লে ওরা থমকে যাচ্ছিল।

রাণীবাজারে কেন এসেছি, সুবিনয়দার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী, পার্টির লোকেরা ততদিনে জেনে গিয়েছিল। আমার সম্বন্ধে তাদের সহানুভূতি ছিল যথেষ্ট, কিন্তু হাজার হোক আমি বাইরের লোক। অষ্টপ্রহর পার্টি অফিসে শেকড় গেড়ে বসে থাকা এটা নিশ্চয়ই কারো কাম্য নয়।

আমি খুবই কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলাম। দিন তিনেক কাটাবার পর ঠিক করেছিলাম সুবিনয়দাদের আর অসুবিধে ঘটাব না। একটা উপায়ও মাথায় এসেছিল। সেদিন থেকেই সকালবেলা পার্টি অফিসে লোকজনের যাতয়াত শুরু হবার আগেই চা-টা খেয়ে বেরিয়ে পড়তাম, ফিরতাম দুপুরে। ফিরেই চান-খাওয়া সেরে আবার যে বেরতাম এবার ফেরার পালা মাঝরাতে সবাই চলে যাবার পর। মোট কথা, পার্টি অফিসে ভিড়ের এবং কাজের সময়টা বাইরে বাইরেই কাটিয়ে দিতাম।

রাণীবাজারে সেই প্রথম এসেছি। এখানকার রাস্তাঘাট অলিগলি মানুষজন, সবই আমার অচেনা। লক্ষ্যহীনের মতন ঘুরতে ঘুরতে দু-দিনেই কিন্তু টের পেয়ে গিয়েছিলাম, সুবিনয়দা এই রাণীবাজারের মুকুটহীন সম্রাট, মানুষের হৃদয়ের গভীরে তাঁর সিংহাসন পাতা। এমন কি বিরুদ্ধ দলগুলো, যাদের মত-পথ-আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা, তারা পর্যন্ত সুবিনয়দাকে শ্রদ্ধা করত তার সম্বন্ধে সম্ভ্রমের সুরে কথা বলত।

আরো দিনকয়েক পর সারা সকাল ঘোরাঘুরি করে দুপুরবেলা পার্টি অফিসে ফিরেই থমকে যেতে হয়েছিল। ভিড় অবশ্য ছিল না। কিন্তু পরমেশ সান্যাল আর বন্দনা তখনও বসে।

ঘরে পা দিয়েই আভাস পেয়েছিলাম, আমাকে নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছে। পরমেশ সান্যাল বলছিলেন, 'এভাবে চলতে পারে না। ভদ্রলোক পার্টির কেউ নন অথচ পার্টির অফিসে তাঁকে থাকতে হচ্ছে। এতে তাঁরও অসুবিধে। ওঁর যা অবস্থা তাতে চলেও যেতে বলা যায় না। আপনি ভদ্রলোকের জন্যে একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিন সুবিনয়বাবু।'

পরমেশ সান্যাল সুবিনয়দাকে সুবিনয়বাবু বলতেন। ওঁরা প্রায় সমবয়সী।

আমি বিপন্ন বোধ করছিলাম। এদিকে বিব্রতভাবে সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'অমিয়র জন্যে কী করা যায় বলুন তো পরমেশবাবু? আমি যে কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না।'

'সেদিনই তো বললাম, রামগঙ্গা জুটমিলের জি এম-কে একটা চিঠি লিখে দিন। ওঁদের মিলে চীপ ক্যানটিন খুলবে। আপনি লিখে দিলেই অমিয়বাবু ওটা পেয়ে যেতে পারেন।'

বুঝতে পারছিলাম আমার আড়ালে আমাকে নিয়ে সুবিনয়দাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'কিন্তু—'

পরমেশ সান্যাল জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন।

দ্বিধান্বিতের মতন সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'আমার মন এতে সায় দিচ্ছে না। প্রথমত, এভাবে সুবিধে নিতে যাওয়ার আমি বিরোধী। দ্বিতীয়ত, অমিয় আমার আত্মীয়—'

সুবিনয়দার এমন দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গি আমি প্রথম দিনই দেখেছি, তাঁর এ জাতীয় কথাও শুনেছি।

পরমেশ সান্যাল বলেছিলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আপনি তো সুবিধে নিতে যাচ্ছেন না। আর আত্মীয় হলেও মানুষ তো। পার্টি যখন মানুষের জন্যে আর আত্মীয়ও যখন মানুষ তখন তার জন্যে কিছু লিখলে অন্যায় হয় না।'

'আরেকটু ভাবতে দিন আমাকে।'

এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল বন্দনা। হঠাৎ পরমেশের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠেছিল, 'সুবিনয়দার যখন আপত্তি তখন এ চিঠি না-ই বা লিখলেন। সত্যি তো, ব্যাপারটা জানাজানি হলে পার্টির সুনাম বাড়বে না।'

এই ক'দিনে লক্ষ্য করেছি, বন্দনা সুবিনয়দাকে দারুণ শ্রদ্ধা করে। সুবিনয়দাও পার্টির অন্য ছেলেমেয়েদের চাইতে বন্দনাকে বেশী স্নেহ করেন। সেটা তার গুণে। নাওয়া-খাওয়া ভুলে সারাদিন হয়তো পোস্টারই আঁকতো; মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিত। সুবিনয়দাকে বাদ দিলে রাণীবাজারের স্থানীর শাখায় বন্দনার মতন এমন নিষ্ঠা, পরিশ্রমের এত ক্ষমতা, পার্টির নীতির প্রতি এত আনুগত্য আর কারো ছিল না।

পরমেশ সান্যাল অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন, 'আপত্তি—আপত্তি কিসের? একটা চিঠি লিখে দিলে যদি একটা সংসার বেঁচে যায়, আমার মতে লিখে দেওয়াই তো উচিত।'

যাই হোক, সুবিনয়দাকে বেশী ভাবাভাবির সুযোগ দেননি পরমেশ সান্যাল। পরের দিনই একরকম জোর করে তাঁকে দিয়ে

রামগঙ্গা জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজারের নামে একটা চিঠি লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রভাবের সুযোগ নিয়ে কোন রকম সুবিধা আদায় করার বিরোধী ছিলেন সুবিনয়দা। আজীবন তিনি এই নীতি পালন করে এসেছেন। কিন্তু আমার ব্যাপারে হয়তো তাঁর কিছু দুর্বলতা থাকবে। কিংবা পরমেশ সান্যালের চাপ, অনুরোধ, দিনের পর দিন পার্টি অফিসে পড়ে থাকা—সব একাকার হয়ে তাঁকে সাময়িকভাবে এমন বিচলিত করে তুলেছিল, যাতে আমার জন্য চীপ ক্যানটিনের উমেদারি না করে পারেননি। কিন্তু সেদিন কে ভাবতে পেরেছিল, রামগঙ্গা জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজারকে লেখা ঐ চিঠিটার মধ্যে সুবিনয়দার আরেকটা মৃত্যুবাণ লুকনো রয়েছে।

যাই হোক, চিঠিটা লেখা হয়ে গেলে চিন্তিত মুখে সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'এই চিঠি নিয়ে রামগঙ্গা জুট মিলে কে যাবে?'

পরমেশ সান্যাল বলেছিলেন, 'আমি যাব। অমিয়বাবুও আমার সঙ্গে যাবেন।'

সুবিনয়দা এবার নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন, 'আপনি গেলে আমার ভাবনা নেই। জেনারেল ম্যানেজারকে চিঠিটা দেখিয়েই কিন্তু ফেরত নেবেন। তাঁকে বলবেন, ব্যাপারটা যেন গোপন রাখা হয়। জানাজানি হয়ে গেল আমার চাইতে পার্টির ক্ষতি অনেক বেশি।'

'তা আমি জানি।' পরমেশ সান্যাল বলেছিলেন, 'চিঠিটা চেয়ে নিয়েই ছিড়ে ফেলব ; এ জাতীয় কোনো রকম ডকুমেণ্ট অন্যের হাতে থাকা ঠিক নয়।'

সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় পরমেশ সান্যাল আমাকে নিয়ে রামগঙ্গা জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজারের বাংলোয় গিয়েছিলেন। সুবিনয়দার চিঠি দেখে জেনারেল ম্যানেজার অবাক ; সুবিনয়দা যে এরকম চিঠি লিখতে পারেন সেটাই তাঁর বিস্ময়ের কারণ। ব্যস্তভাবে তিনি বলেছিলেন, 'মিস্টার মজুমদার কখনও তো কোনো অনুরোধ করেন

না ; এই প্রথম করলেন। আপনি ভাববেন না মিস্টার সান্যাল, অমিয়বাবু চীপ ক্যান্টিনটা পাবেনই। মিস্টার মজুমদার পাঠিয়েছেন ; তাঁর ক্যাণ্ডিডেটের কথাই আলাদা।'

এরপর সুবিনয়দার চিঠিটা চেয়ে নিয়েছিলেন পরমেশ সান্যাল। জেনারেল ম্যানেজারকে অনুরোধ করেছিলেন, ব্যাপারটা সংশ্লিষ্ট ক'জনের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ থাকে ; বাইরে প্রকাশ না পায়।

জেনারেল ম্যানেজার পরমেশ সান্যালকে আশ্বস্ত করেছিলেন ; তাঁর অনুরোধের মর্যাদা নিশ্চয়ই রাখবেন।

সেদিন পরমেশ সান্যালের ওপরে কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গিয়েছিল। ইনি ছাড়া কারো সাধ্য ছিল না আমার স্বপক্ষে সুবিনয়দাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নেয়। বার বার মনে হচ্ছিল, এই পরমেশ সান্যাল আমার পরিত্রাতা, আমাকে পুনর্জীবন দিয়েছেন। নইলে মৃত্যু—অবধারিত মৃত্যুই ছিল আমার নিয়তি।

জেনারেল ম্যানেজারের বাংলো থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পরমেশকে বলেছিলেন, 'আপনি আমাকে রক্ষা করলেন। আপনি ওভাবে না বললে সুবিনয়দা কিছুতেই চিঠি লিখে দিতেন না।'

পরমেশ সান্যাল হেসেছিলেন, 'সুবিনয়বাবু এসব ব্যাপারে বড় বেশী কঠোর।' একটু থেমে আবার, 'অনেস্টি টনেস্টি নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করেন। তাতে পার্টির ইমেজ বাড়ে একথা হাজারবার মানি। কিন্তু আশেপাশের মানুষগুলোর দিকেও তো তাকাতে হয়।'

চীপ ক্যানটিন বললেই খোলা যায় না ; তার জন্য টাকার দরকার। সেই টাকাও আমি গোপনে রামগঙ্গা জুট মিল থেকে পেয়েছিলাম। এ ব্যাপারে সুবিনয়দা অনুরোধ করেননি। ছিদ্র যখন পেয়েই গেছি তখন তার ভেতর দিয়ে ফাল হয়ে ঢুকে যাওয়াই তো উচিত। সুবিনয়দাকে না জানিয়েই তাঁর নাম করে টাকাটা আদায় করেছিলাম।

চীপ ক্যানটিন খুলবার পর পার্টি অফিসে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। রাণীবাজার রেল স্টেশনের কাছে একটা বাড়ি ভাড়া করে সুদূর মফঃস্বল থেকে বাব-মা-ভাই-বোনদের নিয়ে এলাম।

এদিকে ক্যানটিন নিয়ে এমন জড়িয়ে পড়লাম যে আর কোনদিকে মুখ তুলে তাকাবার সময় রইল না। রামগঙ্গা জুট মিলে আড়াই হাজারের ওপর শ্রমিক; অন্যান্য ষ্টাফও আড়াই শ'র মতন। সকাল-দুপুর-রাত্রি, তিন শিফ্‌টে কাজ চলে। এতগুলো লোকের টিফিন আর মিলের ব্যবস্থা ঐ ক্যানটিন থেকেই।

প্রথম প্রথম বেশি লোকজন রাখতে পারিনি; নিজেকেই অমানুষিক খাটতে হত। ভোরবেলা ক্যানটিনে চলে যেতাম, ক্লান্ত অবসন্ন শরীর টানতে টানতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মাঝরাত। ফিরেই টান হয়ে শুয়ে পড়তাম; সঙ্গে সঙ্গে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও গাঢ় ঘুমের ভেতর ডুবে যেত।

দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে গেল। এর ভেতর এই রাণীবাজার শহরে দু-দুবার মিউনিসিপ্যাল ইলেকসান হয়ে গেছে। একবার হয়েছে সাধারণ নির্বাচন।

আমার নিজেরও ওই সময়টুকুর মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ক্যানটিন চালিয়ে দু-চার পয়সার মুখ দেখতে পাচ্ছি। লোকে অবশ্য বলে, আমি—অমিয় চক্রবর্তী—নাকি লাল হয়ে গেছি। ব্যাঙ্কে টাকার পাহাড় জমছে।

লোকে যতটা রটায় ততটা ঠিক নয়। তবে ক্যানটিনের কল্যাণে এই রাণীবাজারে খান দুই বাড়ি করেছি, চারটে বোনকে পার করতে পেরেছি, ভাইগুলোর কারোকে ইঞ্জিনিয়ার করেছি, কারোকে ডাক্তার। এমন কি বেশি বয়েসে বাড়িতে তিনদিন নহবত বসিয়ে নিজেও একটা বিয়ে করে ফেলেছি। আজকাল আমাকে আগের মতন খাটতে হয় না। অনেক লোকজন রেখেছি; তারাই সব করে, আমার কাজ এখন হাল্কা।

যাই হোক, এই ক'বছরে স্নুবিনয়দাদের পার্টি অফিসে দু-একবারের বেশি যাওয়া হয়ে ওঠে নি। যাঁরা আমাকে পুনর্জীবন দিয়েছেন সেই স্নুবিনয়দা আর পরমেশ সান্যালের সঙ্গেও চার পাঁচবারের বেশি দেখা হয়নি। তবে খবর পাচ্ছিলাম, পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতির মতন স্নুবিনয়দা পার্টির সংগঠন নিয়ে সেই আগের মতনই মেতে আছেন।

ক্যানটিন আর বাড়ি এইটুকুর মধ্যেই চলাফেরা, গতিবিধি। তবু অস্পষ্টভাবে একটা কথা কানে আসছিল। আমি রাণীবাজারে আসার পর সারা দেশব্যাপী যে সাধারণ নির্বাচন ঘটে গেছে তারপর থেকেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভাঙন শুরু হয়েছিল। একেকটা দল দুভাগে তিন ভাগে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। এই আত্মবিভাজনের বীজ কোথায় লুকিয়ে ছিল, কে জানে। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছিল, দলীয় নীতি এবং সেই নীতি রূপায়ণের প্রশ্নে নেতারা এক-মন এক-আত্মা হতে পারছিলেন না। মতবিরোধ দলগুলোকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছিল।

সমস্ত দেশের অস্থির রাজনৈতিক আবহাওয়ায় যে বিষ ভেসে বেড়াচ্ছিল, তার স্পর্শ থেকে স্নুবিনয়দাদের দলও রক্ষা পেল না। নীতি এবং কর্মপন্থা নিয়ে সেখানেও উঁচু মহলের নেতৃত্বের মধ্যে সংঘর্ষ বাধল। পরিণতিতে পার্টি দুটুকরো হয়ে গেল। দলভাঙার আঁচ আমাদের এই রানীবাজারেও এসে লাগল।

আমার ক্যানটিনের ক্যাশিয়ার ছেলেটি, নাম অজয়, হঠাৎ একদিন এসে বলল, সুবিনয়বাবুর পার্টি অফিসে খুব গোলমাল হচ্ছে।

স্নুবিনয়দা যে আমার আত্মীয় সে কথা অজয় জানত। উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'গোলমাল কেন?'

'ওদের পার্টি ভাগ হয়ে গেছে। এখানকার ইউনিটও আর আস্ত নেই; তাই নিয়ে গণ্ডগোল। শুনলাম—'

'কী শুনলে ?'

'এখানকার ইউনিটের বেশির ভাগ মেম্বার সুবিনয়বাবুকে আর নেতা বলে মানতে রাজী না।'

'সে কী!' আমি চমকে উঠেছিলাম। সুবিনয়দা এ অঞ্চলের, বিশেষ করে পার্টি মেম্বারদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। পার্টি ভাগ হয়ে গেলেও সে শ্রদ্ধার ভাঁটা পড়বে এ ভাবিনি! সুবিনয়দার জন্য অজ্ঞাত ভয় বুকের ভেতর সেই মুহূর্ত থেকে জমতে শুরু করেছিল।

সেদিনই বিকেলের দিকে সুবিনয়দার খোঁজে তাঁদের পার্টি অফিসে গিয়েছিলাম। অজয় যা খবর দিয়েছিল, অবস্থা তার চাইতে অনেক খারাপ। পার্টি অফিসের সামনে তখন দু'দল ছেলেমেয়ে মুখোমুখি ঘুষি পাকিয়ে শ্লোগান দিচ্ছিল।

একদল বলছিল, 'সুবিনয় মজুমদার—'

'মুর্দাবাদ।'

'দলের নীতি ভাঙছে কে ?'

'সুবিনয়বাবু, আবার কে—'

'প্রগতিবাদের শত্রু কে ?'

'সুবিনয়বাবু আবার কে ?'

'সুবিনয় মজুমদার—'

'পার্টি ছাড়ো, পার্টি ছাড়ো—'

আরেক দল ছেলেমেয়ে সুবিনয়দার স্বপক্ষে শ্লোগান দিচ্ছিল।

লক্ষ্য করেছিলাম, সুবিনয়দা পার্টি অফিসের ভেতর বিমূঢ়ের মতন বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে সেদিন দেখা করতে পারিনি, একটা কথাও বলতে পারিনি। যারা শ্লোগান দিচ্ছিল তারা আমাকে পার্টি অফিসের ভেতর ঢুকতে দেয়নি।

দিন কয়েক পর আরো সাঙ্ঘাতিক খবর কানে এসেছিল। সুবিনয়দাকে নাকি পার্টি অফিস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে;

রেল স্টেশনের কাছে একটা মেসে গিয়ে তিনি উঠেছেন। খবর পেয়েই ছুটেছিলাম কিন্তু মেসে গিয়ে তাকে ধরতে পারিনি। মেস-ম্যানেজার জানিয়েছিল, ভোর বেলা উঠেই সুবিনয়দা বেরিয়ে যান; সারাদিন কোথায় কোথায় ঘোরেন, ফিরতে ফিরতে রাত দুপুর। অর্থাৎ মাঝরাত্তিরে না গেলে সুবিনয়দাকে ধরবার সম্ভাবনা নেই।

এরপর দ্রুত অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবার পর রানীবাজার-বাসীদের সঙ্গে আমিও দেখেছিলাম, এ শহরের দেয়াল পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে। পোস্টারগুলোতে লেখা ছিল, সুবিনয় মজুমদার সাময়িক কোষাধ্যক্ষ থাকার সময় পার্টির সাত হাজার টাকা তছরূপ করেছেন। দেখতে দেখতে আমার হৃৎপিণ্ড যেন থমকে গিয়েছিল।

পরের দিন আরো মারাত্মক ব্যাপার। রানীবাজারের দেয়ালে সেদিন অন্যরকম পোস্টার পড়েছে। সুবিনয় মজুমদার পার্টির সুনাম ভাঙিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের চাকরি-বাকরি এবং নানারকম সুযোগ-সুবিধা আদায় করে দিয়েছেন। পোস্টারগুলোর সঙ্গে সুবিনয়দার একটা চিঠির নকল রয়েছে। সেই চিঠিটা যাতে রামগঙ্গা জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে আমার নামে সুপারিশ ছিল। পড়তে পড়তে আমার চোখমুখ ঝাঁ-ঝাঁ করতে শুরু করেছিল। মনে মনে ঠিক করেছিলাম, যেভাবেই হোক, সুবিনয়দার সঙ্গে দেখা করবই।

সেদিনই মাঝরাত্তিরে মেসে গিয়ে সুবিনয়দাকে ধরেছিলাম। অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছিল তাকে এবং উদ্‌ভ্রান্ত। চেহারা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। পরনে চিটচিটে ময়লা ধুতি আর হাফ শার্ট। মুখময় মাসখানেকের জমানো দাড়ি গোঁফ; চোখ ভেতরে ঢুকে গেছে। চুল উসকো খুসকো কণ্ঠার হাড় ফুটে বেরিয়েছে। আমি মুখ খুলবার আগেই তিনি বলে উঠেছিলেন, 'আচ্ছা তুমিই বল

অমিয়, একটা পয়সাও কি আমি সরিয়েছি? আমি যখন ক্যাশিয়ার তখন কিছুদিন তো তুমি পার্টি অফিসে ছিলে—'

মুখ নীচু করে বলেছিলাম, 'আপনাকে তখনই বলেছিলাম, সুবিনয়দা হিসেব রাখুন। পার্টির ছেলেমেয়েরা যেভাবে খুশি টাকা নিয়ে যাচ্ছে; পরে গোলমাল হতে পারে। আপনি তো শুনলেন না—'

'হ্যাঁ মানুষকে বিশ্বাস করার পুরস্কার পাওয়া গেল।'

একটু চুপ করে থেকে সুবিনয়দা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, 'আমার নামে আজ কতকগুলো পোস্টার মারা হয়েছে। দেখেছ অমিয়?'

আমার ঘাড় ভেঙে মাথাটা ঝুলে পড়েছিল যেন, 'দেখেছি।'

'অথচ—অথচ, কেন আমাকে ও চিঠি লিখতে হয়েছিল তা তো তুমি জানো।'

অপরাধবোধে আমার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ না হলেও, সুবিনয়দার এই অসম্মান আর লাঞ্ছনার আধাআধির জন্যও আমি দায়ী। ক্লান্ত ফিস ফিস গলায় বলেছিলুম, 'জানি বৈকি।'

'তবু দেখ কিভাবে চিঠিটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে! আমি জানি, এর পিছনে কে আছে?'

'কে?'

'বুঝতে পারছ না?'

বিদ্যুৎ-চমকের মতন একটা কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। সুবিনয়দা বলেছিলেন রামগঙ্গা জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজারকে দেখিয়েই যেন চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলা হয়। তবে কি পরমেশ সান্যাল চিঠিটা নষ্ট করেননি? এমন মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগাবেন বলেই কি এতকাল রেখে দিয়েছিলেন?

কি ভেবে সুবিনয়দা আবার বলেছিলেন, 'আমাদের পার্টি দুভাগ হয়ে গেছে।'

'শুনেছি।'

'কারণটা জানো ?'

'পরিষ্কার জানি না।'

'কারণটা হল পার্টির কর্মপন্থা। উঁচু নেতৃমহলের একাংশ চান পুরনো নিয়মেই দল চলুক ; আরেক দল চান আমূল পরিবর্তন। এই নিয়ে দল ভাগ হয়ে গেল। আমি পুরনো পথেই বিশ্বাসী। এদিকে রানীবাজারের পার্টি ইউনিটের বেশির ভাগ লোকই চায় পরিবর্তন। তারা সরাসরি আমাকে অস্বীকার করতে চায়। আমি নাকি পার্টির কেউ না। কেউ যদি না হব, তাহলে সারা জীবন পার্টির জন্যে নিজেকে ডেডিকেট করলাম কেন ?' একটু থেমে বার কয়েক শ্বাস টেনে সুবিনয়দা আবার শুরু করেছিলেন, 'আমার যদি ভুল হয়ে থাকে, এসো বসি, আলোচনা করি। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পার, নিশ্চয়ই মেনে নেব। কিন্তু তার বদলে এসব কি নোংরামি! আমাকে পার্টি অফিস থেকে গায়ের জোরে ওরা বার করে দিলে, তারপর এই কুৎসা রটাচ্ছে। আমার সততা, সাধুতা, আমার সম্মান, মর্যাদা, চরিত্র—সব ওরা ধ্বংস করে দিতে চায়। কিন্তু তা হবে না।'

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম, একটা ফাঁস ক্রমশ ছোট হতে হতে সুবিনয়দার দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম, 'কী করতে চান আপনি ?'

'পরশু রানীবাজারের সব লোককে কাছারী পাড়ার মাঠে ডাকব! পার্টির অবস্থা, আমার কথা—সব তাদের কাছে খুলে বলব। সারা জীবন যাদের মধ্যে কাজ করেছি তারা অন্তত আমাকে বুঝবে, বিশ্বাস করবে।'

'পরশু দিনের ব্যাপার পরশু দিন হবে। আজ আপনি আমার সঙ্গে চলুন।'

'কোথায় ?'

'আমার বাড়িতে। এখন থেকে আপনি আমার কাছেই থাকবেন।' আমার জন্য সুবিনয়দা যে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত, এই ভাবনাটা আমাকে যেন হাজার নখে চিরছিল। আমি জানি, সুবিনয়দার সঞ্চয় কানাকড়িও নেই। কিভাবে মেসের খরচ চালাচ্ছেন, কে জানে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যদি তাঁর কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে পারি। অন্তত খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তা থেকে তাঁকে নিশ্চয়ই মুক্ত রাখতে পারব।

সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'তোমার বাড়িতে গিয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না অমিয়।'

'কেন?'

'নিজেই ভেবে দেখ।'

সুবিনয়দাকে হাজার কাকুতি-মিনতি করেও নিজের বাড়িতে আনতে পারিনি।

পরশুর মিটিং আর হয় নি; তার আগেই রানীবাজারের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছিল। ঝড়টা উঠেছিল নতুন একটা পোষ্টারকে ঘিরে। সুবিনয়দা নাকি পার্টি মেম্বার বন্দনা দত্তকে একা পেয়ে তার গায়ে হাত দিয়েছেন।

নিজের চোখে দেখেও প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারি নি; আমার মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করেছিল। মনে হচ্ছিল, সব রক্ত কপালের দু'ধারে দুটো শিরায় গিয়ে জমা হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে সে দুটো ফেটে যাবে। সেই অবস্থাতেই সুবিনয়দার মেসে ছুটেছিলাম। এই পোষ্টার নিশ্চয়ই সুবিনয়দার চোখে পড়েছে; এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

কিন্তু মেসে গিয়ে লাভ হয়নি, সুবিনয়দা ছিলেন না। কোথায় গেছেন। ম্যানেজার বলতে পারে নি। তবে এই খবরটা সে দিল, সুবিনয়দা আর ফিরবেন না।

উন্মাদের মতন এবার আমি ছুটেছিলাম বন্দনাদের বাড়ি। সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম 'আজকে কতক গুলো কদর্য পোষ্টার পড়েছে। সেগুলোতে আপনার সঙ্গে সুবিনয়দার নাম জড়িয়ে জঘন্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।'

আবেগহীন শীতল গলায় বন্দনা বলেছিল 'দেখেছি।'

'আপনি এর প্রতিবাদ করুন।'

'না।'

'কিন্তু এর পরিণাম বুঝতে পারছেন?'

'পরিণাম বুঝেছি বলেই তো প্রতিবাদ করব না।' বন্দনাকে অত্যন্ত হিংস্র আর উগ্র দেখছিলাম।

আমার সমস্ত অস্তিত্ব স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, 'তবে কি আপনার মত নিয়েই এ পোষ্টার লাগানো হয়েছে! ছি—ছি—'

বন্দনা চিৎকার করে উঠেছিল, 'গেট আউট—গেট আউট। বেরিয়ে যান—'

এ কোন বন্দনাকে সেদিন আমি দেখেছিলাম? এই কি সেই যাকে সব চাইতে বেশি স্নেহ করতেন সুবিনয়দা; পার্টির মেম্বারদের মধ্যে সে ছিল সুবিনয়দার কাছে সব চাইতে প্রিয়? বন্দনাও তো তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। কিন্তু কী এমন ঘটেছে যাতে বন্দনার এত পরিবর্তন?

পার্টির তহবিল তছরূপ বা স্বজনপোষণের ব্যাপারে রানীবাজারের মানুষ তেমন মাথা না ঘামালেও কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা তারা বিশ্বাসও করেনি, আবার অবিশ্বাসও করেনি। পোষ্টারের অভিযোগগুলো ছিল অনেকটা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু বন্দনার সঙ্গে জড়িয়ে যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল তাতে রানীবাজারের জনমত সম্পূর্ণ সুবিনয়দার বিপক্ষে চলে গিয়েছিল। পথেঘাটে চলতে ফিরতে আমি তা টের পাচ্ছিলাম। বন্দনার ব্যাপারটা একটা চটচটে অশ্লীল এবং মুখরোচক কেচ্ছা হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। চায়ের দোকানে পানের দোকানে, এমন কি রান্নাঘরেও ওই আলোচনা চলছিল। ভেবে পাচ্ছিলাম না এত বড় একটা দুর্নাম মাথা পেতে নিয়েও কেন বন্দনা প্রতিবাদ জানাল না?

যাই হোক মেস থেকে সেই যে সুবিনয়দা নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন তারপর কয়েক মাস কেটে গেছে এদিকে পরমেশ সান্যাল পার্টি অফিস দখল করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হয়ে বসেছেন।

হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, এখান থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে পয়ারপুর বলে একটা জায়গায় মন্মথ দাসের বাড়িতে আছেন সুবিনয়দা। মন্মথ দাস পার্টির মেম্বার না; সামান্য একজন কৃষক, সামান্য জমিজমা আছে। এক সময় সুবিনয়দা তার কিছু উপকার করেছিলেন। লোকটা অকৃতজ্ঞ নয়; দুঃসময়ে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে।

খবর পেয়েই পয়ারপুর গিয়েছিলাম। সুবিনয়দাকে দেখে চোখে জল এসে গিয়েছিল। এ সুবিনয়দা যেন আগের সুবিনয়দার ধ্বংস স্তূপ কিংবা আমি তার মৃতদেহ দেখছি। সে সময় নিজের শব যেন বয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকেছিলেন!

বদ্ধ কাঁপা গলায় বলেছিলাম 'কেমন আছেন সুবিনয়দা?'

জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'বেশ আছি,—বেশ। এখানেও খাদ্য আছে পানীয় আছে বায়ু আছে বাঁচবার মতন সবরকম উপকরণ রয়েছে। বেশ আছি বেশ, তোমরা এখানে আর এসো না। যাও, এক্ষুনি চলে যাও—'

উত্তর না দিয়ে উঠে পড়েছিলাম। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হচ্ছিল না। ফেরার সময় বার বার মনে হচ্ছিল, সুবিনয়দা আর বেঁচে নেই। পার্টি, রানীবাজার তার আদর্শ নীতি, সংগঠনের অফুরন্ত কাজ—এ সবই ছিল সুবিনয়দার সেখানকার মাটিতেই

পোঁতা। একটা বিরুদ্ধ প্রচণ্ড শক্তি প্রবল হাতে মূলশুদ্ধ তাঁকে টেনে উপড়ে এতদূরে এই পয়ারপুরে বিষণ্ন নির্বাসনের ভেতর ছুঁড়ে দিয়েছে।

সুবিনয়দা বেঁচে থাকতে আর পয়ারপুরে যাননি।

তারপর ?

তারপর আজ খবর এসেছে, সুবিনয়দা মারা গেছেন। মারা কি তিনি আজই গেলেন ? অনেক আগেই তাঁর চারপাশে তিল তিল মৃত্যু জমা করা হয়েছিল। আজ শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে যবনিকা পড়ল।

পয়ারপুরে মন্মথ দাসের বাড়ি যখন পৌঁছুলাম বেশ রাত হয়ে গেছে। শীতের রাত ; এর মধ্যেই চারদিক নির্জন হয়ে গেছে। এই নিশুতিপুরে ঝিঁঝিঁদের একটানা বিলাপ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

মন্মথের ঘরের দাওয়ায় ক'টা লোক ডেলা পাকিয়ে বসে ছিল। তাদের সামনে বাঁশের চালিতে সুবিনয়দার দেহ শোয়ানো রয়েছে। একধারে একটা হেরিকেন ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে অন্ধ হয়ে এসেছে।

হঠাৎ দাওয়ার আরেক কোণে একটি মুখের ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। বন্দনা—বন্দনা দত্ত এসেছে। এক পলক তাকিয়ে থেকে পরক্ষণেই ঘৃণায় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

মন্মথের বাড়িতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দাওয়ায় যারা বসে ছিল একসময় সুবিনয়দার শব সমেত বাঁশের চালি কাঁধে তুলে নিল। তারপর হরিধ্বনি দিয়ে শ্মশানের দিকে চলতে শুরু করল।

আগে আগে যাচ্ছে শব বাহকেরা। তাদের পেছনে মন্মথ, বন্দনা আর আমি। কোন রকম আড়ম্বর নেই, সমারোহ নেই। শীতের নির্জন রাতে অন্ধকার আর কুয়াশার ভেতর দিয়ে এমন স্বজনহীন করুণ শেষ বিদায় সুবিনয়দার জন্যে অপেক্ষা করছে, কে ভাবতে পেরেছিল।

শ্মশান মন্মথর বাড়ি থেকে মাইল চারেক দূরে, একটা মজা নদীর

ধারে। সেখানে পৌঁছেই মন্মথর লোকেরা চিতা সাজিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল। যতক্ষণ দাহ চলল বন্দনা আর আমি চিতার দু'ধারে বসে থাকলাম।

সুবিনয়দার দেহ নিশ্চিহ্ন হতে হতে ভোর হয়ে গেল। আমি আর মন্মথর বাড়ি গেলাম না, সোজা রেল ষ্টেশনের রাস্তা ধরলাম। এত ভোরে বাস পাওয়া যায় না, ট্রেনেই রাণীবাজার ফিরতে হবে।

অনেকখানি হাঁটবার পর হঠাৎ মনে হল, কেউ আমার পেছনে আসছে। মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলাম, বন্দনা। তাকে কিছু বললাম না।

আমার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ষ্টেশন পর্যন্ত এল বন্দনা, গাড়িতেও উঠল এবং মুখোমুখি বসল। এবারে তাকে ভাল করে লক্ষ্য করলাম। বন্দনার চোখ ফোলা ফোলা, আরক্ত, কালো মণি দুটো জলে ডুবে আছে।

ট্রেন ছাড়বার পর হঠাৎ ভাঙা ভাঙা গোঙানির মতন আওয়াজ করে বন্দনা বলতে লাগল, 'সুবিনয়দা এভাবে মারা যান, আমি চাই নি—আমি চাই নি। তার ঠোঁট দুটো গলার কাছটা থরথর করছে।'

উত্তর দিলাম না।

বন্দনা আবার বলল, 'পরমেশবাবু বুঝিয়েছিলেন, সুবিনয়দা পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন; তার আদর্শের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। উত্তেজনার মাথায় দুর্নামের ঝুঁকি নিয়েও সুবিনয়দার ক্ষতি করতে গেলাম। পার্টিকে আমি প্রাণের মতন ভালবাসি। কিন্তু তখন কি জানতাম, আদর্শ-টাদর্শ নয়, সুবিনয়দাকে সরিয়ে পরমেশবাবু দলের সর্বেসর্বা হতে চান—'

আমি আর কী বলব, চুপ করেই থাকলাম। বন্দনার ঐ সব কথা শুনবার জন্য সুবিনয়দা আজ আর বেঁচে নেই। থাকলেই বা কী হত? হায়! মৃত্যুর অনেক আগেই তিনি নিহত হয়েছিলেন।

অঙ্কে মেলে না

....

প্রেমেন্দ্র মিত্র

গাড়ি আগেই লেট চলছিল। খড়গপুর স্টেশনে এসে একেবারে যেন পঙ্গু হয়ে গেল।

শিবতোষ প্রথমটা গ্রাহ্য করেন নি। ট্রেন একটু আধটু দেরী করবে তাতে আর বিচলিত হবার কি আছে। তিন ঘণ্টার জায়গায় না হয় চার ঘণ্টা লাগবে। তাঁর একেবারে ঘড়িধরা কোন কাজ'ত নেই। কলকাতায় পৌঁছলেই হ'ল বেলাবেলি।

মানসের একটু কষ্ট হবে অবশ্য। প্ল্যাটফর্মে এসে ঘণ্টাখানেক বেশী অপেক্ষা করতে হবে।

তা একদিন হলই বা একটু ঝামেলা পোহাতে।

তিনি যে এই বয়সে তাদের জন্যে সব ঝামেলা পোহাতে আসছেন।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই অস্বস্তিটা যেন বুকের ভেতর ঠেলে উঠল।

সত্যি কেন তিনি যাচ্ছেন! সাধ করে এই প্রায় আজগুবি দায় কাঁধে নেবার কোন গরজ যথার্থ তাঁর আছে কি?

যমুনা? শুধু যমুনার জন্যে যাচ্ছেন বলে নিজের মধ্যে একটা

গাঢ় গভীর অনুভূতির দোলা অবশ্য পেতে পারেন। কিন্তু তাও ঠিক পাচ্ছেন কি ?

ব্যাপারটা তেমন হলে যে নেহাত ছেলেমানুষী হয়। একটা সস্তা নাটুকে উচ্ছ্বাস !

যমুনা বলতে একদিন অজ্ঞান ছিলেন সত্যিই। বয়সে নেহাৎ ছেলেমানুষ, সস্তা নাটক নভেল পড়া প্রেমের ছাঁচেই তাই মনটা ঢালা ছিল তখন।

সে ভালবাসা অবশ্যই মিথ্যে ছিল না, কিন্তু এই যাট বছরের অনেক টোল-খাওয়া পালিশ-ওঠা বুকের ভেতর সেই ভালোবাসারই অনির্বাণ শিখা আজো জ্বলছে বললে নিজের কাছেই ঠাট্টার মত শোনায়।

ছেলেমানুষী ব্যাপারটা অবশ্য যতখানি সম্ভব গুরুতরই হয়েছিল সেদিন। নাটুকে প্রেমের ধরনেই, পরস্পরকে না পেলে দুজনের কেউ জীবনই রাখবে না এ ধরনের কড়া কড়া শপথ নেওয়া হয়েছিল গোপনে।

যমুনা তখন পদ্মাপারের এক বছরে-বছরে-বর্ষার-বানে-ভাসা গাঁয়ের মেয়ে। শিবতোষ সেই গাঁয়েরই ছেলে। কলকাতায় মামার বাড়ি থেকে পড়াশুনা করে। বছরে একবারই যেতে পারে গাঁয়ে। পুজোর ছুটিতে।

বর্ষার উপছে পড়া নদীর জলে গ্রাম তখনো থই থই করে। এক একটা বাড়ি দ্বীপের মত ভাসে সেই অকূল জলে। চলাফেরা সব নৌকায়। সুযোগ সুবিধে খুব বেশী ছিল না। তবু দেখা হত। ইচ্ছে থাকলে সাহস থাকলে কি না হয়।

দুজনের মধ্যে কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গিয়েছিল। শিবতোষ পাস করলেই চাকরীতে ঢুকবে। মামা তার জন্যে নিজের অফিসে সে ব্যবস্থা করেই রেখেছেন। একবার চাকরীতে ঢুকতে পারলেই সে কথা পাড়বে। নিজে কি আর পাড়বে। তার হয়ে যা করবার

সব করবে মামাত বোন দুলী। দুলী সব জানে। সে একদিন তার লুকোন ডায়েরী পড়ে ফেলেছে। তার কাছে সব কথা স্বীকার করতে হয়েছে তাই। দুলী বড় ভালো মেয়ে। নিজে থেকে সে তাদের হয়ে যা করবার করবে বলে কথা দিয়েছে।

এই ব্যবস্থাই ছিল। তারই মধ্যে শিবতোষ পরীক্ষায় পাশ করে দেশে গিয়ে একেবারে বজ্রাহত হয়েছে। যমুনার নাকি বিয়ের সব ঠিক।

এবার দেখা করার সুযোগ পাওয়া ভার হয়েছে। সেকালের পাড়াগাঁয়ের বিয়ে। বিয়ের বহু আগে থাকতেই আত্মীয়স্বজন এসেছে উৎসবে যোগ দিতে। যমুনা সারাদিন সঙ্গিনীদের কাছ থেকে ছাড়াই পায় না।

তবু কোনরকমে শেষ পর্যন্ত দেখা করতে পেরেছে শিবতোষ। প্রথমে চোখের জল ফেলেছে তারপর দুচোখে আগুন ছিটিয়ে শাসিয়েছে যে যমুনা যদি তাকে ছেড়ে কাউকে বিয়ে করে তাহলে বিয়ের আসরেই অ্যাসিড ছিটিয়ে যমুনা আর তার বরকে পুড়িয়ে মারবে।

সত্যি কি আর তাই মেরেছিল? যমুনার বিয়ে যখন হয় তখন শিবতোষের টেস্ট পরীক্ষা চলছে। মনে মনে যন্ত্রণা পেয়েছে খুবই। ইচ্ছে হয়েছে পরীক্ষা চুলোর দোরে দিয়ে বিবাগী হয়ে যায়।

কিন্তু কিছুই সেরকম করে নি।

মামার অফিসে চাকরীটা শুধু না নিয়ে পাশ করবার পর দেশ ছেড়েই চলে গিয়েছিল অনেক দূরে।

বিয়ে থা তারপর করেনি কিন্তু দেশে ফিরে এসেছে অনেকবার। তারই মধ্যে একবার দেখাও হয়ে গেছে যমুনা আর তার বর নিশাপতির সঙ্গে। দেশ ভাগ হয়ে তারা একটি বাচ্চা নিয়ে দক্ষিণে নগর সীমা ছাড়িয়ে কোন এক উদ্বাস্তু কলোনিতে তখন আশ্রয় নিয়েছে।

কি করেছিল তখন শিবতোষ ? কি তার মনে হয়েছিল ?

তা নাটক নভেলগুলো একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা ত লেখে না। এক যুগ বাদে দেখা হবার পরও বুকের ভেতরটায় কেমন একটা কান্না-কান্না ভাব যেন টের পেয়েছিল।

তাতে অবশ্য কোন কিছুই আটকায় নি। এক দেশের এক গাঁয়ের লোক, চেনাচেনি হবার পর আলাপ জমে উঠেছে দু কথাতেই।

দেখা হয়েছিল কালীঘাটের উদ্বাস্তুদের কাটরায়। শিবতোষের মামার বাড়ি কালীঘাটেই। সে টুকিটাকি কটা জিনিষ কিনতে এসেছিল। যমুনা আর নিশাপতি ছেলে কোলে নিয়ে কালীঘাটে পুজো দিতে এসে কাটরাটা একবার ঘুরে যাচ্ছিল। কোলের ছেলে এই মানস।

শিবতোষ নয়, যমুনাই তাকে দেখে প্রথম চিনেছিল। তারপর স্বামীকে পরিচয়টা জানিয়ে তাকে দিয়েই প্রথম সম্ভাষণটা করিয়েছিল।

'শোনেন মশাই ! আপনে শিবতোষ না !' সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনের মুখে এ সম্ভাষণ শুনে শিবতোষ প্রথম ভুরু কুঁচকে যে ভাবে তাকিয়েছিল তা ঠিক প্রসন্ন নয়। তারপরই দেখতে পেয়েছিল যমুনাকে। মাথায় ঘোমটা একটু টান করে ধরে মুখ টিপে সে তখন হাসছে।

সেই দিনই গেছল যমুনাদের সঙ্গে তাদের কলোনির বাসায়। পুরোন ব্যথা একটু চাগিয়ে উঠুক বা না উঠুক নতুন একটা সম্বন্ধ জমে উঠেছিল সেই দিনই। সম্বন্ধটা নিশাপতির সঙ্গে।

অদ্ভুত লেগেছিল মানুষটাকে। গায়ে ছেঁড়া সস্তা একটা শার্ট, পরনে ফুটপাথের দোকান থেকেই নিশ্চয় কেনা একটা বেঢপ প্যান্ট, পায়ে সস্তা রবারের স্যাণ্ডেল, রোগা পাকানো চেহারায় মানুষটা যেন জ্বলন্ত এক টুকরো ইস্পাত। একটু নাড়া খেলেই আগুনের ফুলকি ছিটোয়।

শিবতোষ যমুনাদের বাড়ি ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে ফিরে আসার সময় যমুনার চেয়ে নিশাপতির কথাই ভেবেছিল বেশী। কলকাতায় যে কদিন তারপর ছিল প্রায় নিয়ম করেই শহর-ছাড়ানো তাদের উদ্বাস্তু কলোনিতে প্রতিদিন গিয়েছে। আকর্ষণটা শুধু যমুনার নয়।

যমুনাই একদিন হঠাৎ তাকে বলেছিল—'তুমি এত ঘন ঘন এখানে এসো না শিব ঠাকুর।'

দেশের গাঁয়ে যমুনা শিবুদাই বলত। এবার দেখা হবার পর সে সম্বোধনটা বদলে শিবঠাকুর কেন বলতে শুরু করেছে সে-ই জানে!

কথাটা শুনে শিবতোষ যেমন অবাক তেমনি একটু ক্ষুণ্ণও হয়ে বলেছিল,—'কেন? আসব না কেন? তোদের খুব বিরক্ত করছি বুঝি।'

'না গো না, বিরক্তির কথা কোথা থেকে আসছে।'—যমুনা আধ ঠাট্টার সুরে বলেছিল,—'তোমার নিজের ভালোর জন্যে বলছি। তুমি না সরকারী চাকরী করো।'

'হ্যাঁ তা করি! তাতে কি হয়েছে?'—তখনও কথাটা ঠিক মত বুঝতে না পেরে শিবতোষ প্রথমে অবাক হয়ে তাকিয়ে তারপর হেসে ফেলেছিল,—'নামে তালপুকুর কিন্তু ঘটি ডোবে না। সরকারী চাকরী ঠিকই কিন্তু আসলে'ত বিভূঁয়ে কলম-পেষা কেরাণীগিরি। পরম গৌরবের তৃতীয় শ্রেণী যাকে বলে। তা ক্লাশ থ্রি সরকারী চাকরের কি এখানে আসতে মানা? আবার বলছ আমার নিজের ভালোর জন্যে।'

'হ্যাঁ তোমার ভালোর জন্যেই ত!'—যমুনা মুখটা প্রায় পুরোপুরি গম্ভীর করে ফেলেছিল—'সরকারী চাকরে হলে ওর মত লোকের সঙ্গে মেলামেশা কি ভালো? ও কোথায় কি করে বেড়ায় সব আমিও জানি না, কিন্তু আজ যেমন গেছে তেমন মিটিং-এ হামেশা যাওয়ার

খবর'ত সবাই জানে। সে খবরটা কোনো ছুঁচো ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিলে, তখন ?'

'তখন আমার মত একটা মশা মারবার জন্যে ওদের কামানগুলো দাগবার আর তর সইবে না।' —বলে হেসে উড়িয়ে দেবার ভান করলেও শিবতোষ মনে মনে একটু দমে গিয়েছিল। বেশ কিছুকাল আগেকার কথা। সরকারী চাকুরের কাছে ওরকম একটা দুর্ভাবনা তখন নেহাৎ আজগুবী ছিল না।

দুর্ভাবনা একটু হলেও শিবতোষ যমুনাদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করেনি। এক একদিন তার মধ্যে নিশাপতিকে পায় নি। নিশাপতি তাকে বাসায় বসিয়ে রেখেই কোনো মিছিল কি মিটিং-এই হয়ত চলে গেছে। শিবতোষকে কিন্তু কোনদিন সঙ্গে যেতে বলে নি।

নিশাপতির বাড়ি না থাকার এমনি আর একদিন বিকেল বেলা যমুনা হঠাৎ বলেছিল, 'আচ্ছা তোমার সাধ আহ্লাদ বলে কিছু নেই শিব ঠাকুর ?'

কথাটা বলে যমুনা সরু দাওয়ার অন্য দিকটায় বাঁশের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে পেছন ফিরে বসেছিল ছেলেকে দুধ খাওয়াতে।

'সাধ আহ্লাদ নেই মানে !' শিবতোষ এমন একটা অদ্ভুত প্রশ্নের মানেটা বুঝতে না পেরে যমুনার দিকে একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে একটু হতভম্ব হয়ে বলেছিল, 'বাঃ সাধ আহ্লাদ থাকবে না কেন ! আমি কি মানুষ নই।'

'কই আর মানুষ !' যমুনা পেছন ফিরে থেকেই যেন খোঁচা দিয়েছিল, 'মানুষ হলে অমন কাদার তাল হয়ে পড়ে থাকে ?'

'থাকে না বুঝি ? মানুষ হলে কি করতাম তাহলে ?' শিবতোষ এবার যমুনার গলায় কৌতুকের আভাস পেয়ে সেই সুরেই জিজ্ঞাসা করেছিল।

'কেন ?' শুধু মুখটা ঘুরিয়ে তার দিকে একটু কৌতুক-কটাক্ষ

হেসে যমুনা বলেছিল, 'এমন সুবিধে পেয়ে আমার সঙ্গে একটু ফষ্টি নষ্টিও'ত করতে পারতে!'

শিবতোষ কোনো উত্তর ভেবে পাবার আগেই ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আঁচলটা সামলে যমুনা হঠাৎ সামনে উঠে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'আচ্ছা ছেলেটাকে নিয়ে দুজনে আমরা পালিয়ে গেলে হয় না? ভেবেছ কখনো? অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে মারবে বলে'ত শাসিয়েছিলে আর এ কথাটা ভাবো নি?'

চোখে মুখে হাসিটার ছোপ না থাকলে শিবতোষ শুধু গলার স্বরটায় একটু অস্বস্তিই হয়ত বোধ করত।

কৌতুকের হাসিটার ভরসাতেই সে চটপট উত্তর দিতে পেরেছিল হেসে, 'ভাববো না কেন? ভাবলেই যদি সব সত্যি হয়ে যেতো।'

'সত্যি হয়ে যাবে গো যাবে!' ছেলেটাকে নিয়ে তার পাশে দাওয়ার ওপর বসে পড়ে যমুনা কেমন একটু মজার মুখভঙ্গি করে যেন অত্যন্ত আগ্রহভরে তাকে বুঝিয়েছিল, 'তোমার ভয়-ভাবনার কিছু নেই গো শিবঠাকুর। ও যা মানুষ, খুনখারাপি টারাপি ত নয়ই, একটা রা-ও কাড়বে না। বরং ঝাড়া হাত-পা হতে পেরে খুশি-ই হবে আরো মিটিং-মিছিল করতে পারবে বলে। কি যাবে?'

শিবতোষের উত্তর দেবার দরকার হয়নি। যমুনাই হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বলেছিল, 'আমারও মরণ! যেমন হয়েছে ঘরের, তেমনি ভালবাসার লোক। কারুর কাছেই কিছু পাবার নয়। কিন্তু শোনো।'

এক নিমেষেই কেমন করে যমুনার গলা গাঢ় গভীর হয়ে চমকে দিয়েছিল শিবতোষকে। মুখ থেকেও হাসিটা মুছে গিয়ে যমুনা সেই স্বরে বলে গিয়েছিল, 'ও মানুষটার ওপর সংসারের দিক দিয়ে কোনো ভরসা নেই। তুমি দু দিনের জন্যে আজ এসেছ কাল আবার কোন্

মুল্লুকে চলে যাবে। আমাদের আগলে থাকতেও তোমায় বলি না। কিন্তু কোনদিন সত্যি বিপদে পড়ে যদি খবর পাঠিয়ে ডাক দিই তাহলে কালা হয়ে থেকো না, একবারটি অন্তত এসে দেখে যেও।'

কতকাল আগের কথা। মানসই তার মধ্যে সাবালক হয়ে উঠেছে।

এতদিনের মধ্যে মাত্র দুবারই আসতে পেরেছিল কলকাতায়। শেষবার সেই বছর ছ'য়েক আগে।

তিন বছর আগে খবর পেয়েও কিন্তু আসতে পারেনি। না, আসতে পারেনি ঠিক নয়, আসতেই চায়নি শেষ পর্যন্ত।

খবর যমুনা পাঠায়নি। পাঠিয়েছিল নিশাপতি।

পোষ্টকার্ডটা পড়ে শিবতোষ যেন মানে বুঝতে পারেনি। অক্ষরগুলো চোখের সামনে যেন কিলবিল করে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

যমুনা নেই। সেই খবরই দিয়েছিল নিশাপতি। বেশী কষ্ট পায়নি, বেশী কষ্ট দেয়নি। তিনদিনের জ্বরেই মারা গিয়েছে হঠাৎ।

দুঃখ যত পেয়েছিল, তার চেয়ে বেশী যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল শিবতোষ। একটু আভাস-ইঙ্গিত নেই, যমুনা হঠাৎ এমন আচমকা মারা যাবে এ যেন কোনো অঙ্কে মেলে না।

চিঠিতে খবরই এসেছিল, ডাক নয়। শিবতোষ কলকাতায় আসার চেষ্টাও করেনি। খবরের সঙ্গে ডাক এলেও কলকাতায় সে আসত না। কলকাতায় কোনদিন সে আর ফিরবে না বলেই সঙ্কল্প নিয়েছে।

তারপর তিন বছর বাদে এই চিঠি ক'টা। নিশাপতি নয়, কয়েক মাসের মধ্যে চিঠি ক'টা লিখেছে মানস। এ চিঠিতেও ডাক ঠিক নয়, খবরই ছিল কিন্তু সেই খবরই এবার ডাক হয়ে উঠেছে শিবতোষের কাছে।

কিন্তু ব্যাপারটা কি। শিবতোষ উদ্বিগ্ন হয়ে ঘড়ি দেখেন। আড়াইটে বাজে। একে লেট্, তার ওপর আধ ঘণ্টার জায়গায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল ট্রেনের যে আর নড়বার নাম নেই।

কামরায় প্যাসেঞ্জারদের উত্তেজিত তিক্ত আলোচনা শুনে ত মনে হয় আরো ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেও ট্রেন ছাড়বে কি না সন্দেহ। সামনের কোন ষ্টেশনে যাত্রীরা নাকি রেলের লোকদের মারপিট করেছে। ট্রেন চলাচল তাই বন্ধ। এ-রকম ব্যাপার নাকি নিত্য-নৈমিত্তিক। হাওড়ায় পৌছতে কত রাত হবে কে জানে!

তা যদি হয় তাহলে মানস ত রাত পর্যন্ত স্টেশনে অপেক্ষা করতে পারবে না। যে তল্লাট থেকে সে আসছে তাতে করা উচিতও নয়। কিন্তু তিনি কি করবেন? স্টেশনেই রাতটা কাটান ছাড়া আর ত কোন উপায় নেই। রাতটা কাটিয়ে সকাল বেলা একা-একা সে কলোনিতে যাওয়াটাও একটা সমস্যা। মাথার চুল পাকুক, অচেনা লোক ত বটে। শরীরটাও লম্বা-চওড়া আর মজবুত আছে এখনো।

ভাবতে ভাবতেই সেই অস্বস্তিটা আতঙ্কের ছোঁয়া নিয়ে বুকের ভেতর থেকে যেন ঠেলে উঠছে।

জানাশোনা সবাই পইপই করে বারণ করেছিল শিবতোষকে।

আপনি কি পাগল হয়েছেন নাকি? সাধ করে কেউ এখন নতুন করে কলকাতায় ডেরা বাঁধতে যায়? আর এই বয়সে কাজকর্ম সব শেষ করে রিটায়ার করবার পর? তা-ও দু-দিন মরিবাঁচি করে বড়জোর একবার ঘুরে আসা যায়। তার বদলে এখানকার পাট একেবারে তুলে দিয়ে সেখানে নতুন করে পত্তন! এমন আহাম্মকি কেউ কখনো করে? কাগজে রোজ খবরগুলো কি চোখে পড়ে না? শহর নয় সে ত এখন মশান! কার ঘাড়ে কখন কোপ পড়ছে ঠিক নেই। উপায় থাকলে ও মুখো কেউ আর হয়? বিশেষ করে আপনার যাবার দরকারটা কি? বেশ ত আছেন মশাই। বিদেশ বলুন

বিভূঁই বলুন, অর্ধেক জীবনটা ত এখানেই কাটালেন। এখানে আপনাকে কামড়াচ্ছে কিসে? না, না, অমন কাজও করবেন না। কাগজের খবরগুলো বাড়ানো মনে হয় ত একবার না হয় নিজের চোখে দেখে আসুন। কিন্তু শেকড়বাকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে যাবেন না এখুনি।

শিবতোষ কিন্তু তাই একরকম করে এসেছেন। যা-কিছু পুঁজি তার সব কিছুই কলকাতায় চালানের ব্যবস্থা করে দিয়ে সামান্য কিছু শুধু এনেছেন সঙ্গে।

লোকে তো বাধা দিয়েছে-ই নিজের মনেও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যে তীব্র হয়নি এমন নয়। তেমন করে ভেবে দেখতে গেলে কাজটা যে আহাম্মকির সামিল, নিজের কাছে তা অস্বীকার করতে পারেননি।

কিন্তু মানসের চিঠি ক'টা যেন মনের মধ্যে হানা দিয়ে ফিরেছে সারাক্ষণ। বিশেষ করে শেষ চিঠিটা।

·······বাবা আর বাঁচবেন না শিবুকাকা। এখন দেখলে চিনতে পারবেন না আপনি। শুধু হাড় ক'খানা ছাড়া আর কিছু নেই। জ্বর লেগেই আছে আর কাশি? তবু একটু ভালো থাকলেই কারুর কথা না শুনে বেরিয়ে যান। সভায় মিছিলে পর্যন্ত যান একটু দাঁড়াবার মত জোর পেলেই। সে জোরও আর বোধ হয় পাবেন না। সেদিন মারামারির মধ্যে পড়ে একটা পা জখম হয়েছে। আপনাকে লুকিয়ে এসব কথা লিখি। বাবা বারণ করেন খারাপ খবর কিছু লিখতে। মা কিন্তু আপনাকে সব কিছু জানাতে বলে গিয়েছিলেন···

নিশাপতির অসুখটা কি মানস তা লেখেনি, কিন্তু আগের কটা চিঠি মিলিয়ে পড়ে শিবতোষের তা বুঝতে বাকি নেই। নিশাপতির যা হয়েছে তা টি বি ছাড়া কিছু নয়। অসুখেরও বোধ হয় শেষ অবস্থা, সব চিকিৎসার যখন বাইরে।

সত্যি কি করবেন শিবতোষ আর সেখানে গিয়ে! ধন্বন্তরি হলেও

ত কিছু করতে পারবেন না। আর মানস সম্বন্ধেই বা তাঁর কিসের দায়? যার জন্যে এ দায়িত্ব কিছুটা বোধ করতে পারতেন সে-ই ত নেই।

বুকের ভেতর ভয়ের ঢেউটা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ভাবনা মাথার মধ্যে আসে।

ট্রেন লেট্ হয়ে এই খড়গপুরে আটকে থাকা কি নিয়তিরই একটা ইঙ্গিত? ঠিক তাই বলেই যেন মনে হয়।

কলকাতায় যাওয়াটা সত্যিই তাঁর পক্ষে বাতুল গোঁয়াতুর্মি হচ্ছে। খড়গপুরে ট্রেন থেমে থাকার মধ্যে নতুন স্থানীয় যাত্রীদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা শুনলেন, তাতে বিভীষিকার ছবিটা আরো অনেক পরিষ্কার হয়েছে তাঁর কাছে। এরা প্রত্যক্ষদর্শী ভুক্তভোগী। এদের বিবরণ থেকে কলকাতায়, নিত্যকার অবস্থাটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কোথায় কি ঘটবে কেউ জানে না। বিশেষ করে কয়েকটা অঞ্চল ত এদিক দিয়ে ডাকসাইটে। শিবতোষ যেখানে যাবেন সেই অঞ্চলটার নামও বার কয়েক এই প্রসঙ্গে উঠেছে।

না এখনও নিয়তির নির্দেশ মানা যায়। কারা যেন উল্টো মুখের থার্টি আপের কথা বলছিল। যে ট্রেনের ঘুটো কুড়িতেই খড়গপুরে আসবার কথা, একই কারণে সেটাও লেট্ আছে। এখনও নেমে সে ট্রেন ধরে নিজের পুরোনো আস্তানায় ফিরে যাওয়া যায়।

আর দ্বিধা করেন না শিবতোষ। একটু হাঙ্গামা হয়ত হবে তবু ব্যাঙ্কে যে নির্দেশ দিয়ে এসেছেন তা আবার গিয়ে পালটে দেওয়া যায়। তাই দেবেন গিয়ে।

না, কলকাতায় আর নয়। নেহাত দৈব তাঁর সহায়, তাই ট্রেনটা থেকে এমন করে এখানে নেমে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

যথেষ্ট বয়স তাঁর হয়েছে। খুব বেশি হলেও ক' বছর আর বাঁচবেন! যে ক'দিন পরমায়ু আছে একটু শান্তিতে কাটাতে চান।

বাংলা দেশের সম্পর্ক অনেক দিন আগেই ছেড়েছেন আর নতুন করে তা পাতবার দরকার নেই।

শিবতোষ দাঁড়িয়ে উঠে দরজার কাছে যান।

'কুলি! কুলি!'

'সেকি, নামবেন নাকি মশাই? এখন?'—একজন ছোকরা যাত্রী জিজ্ঞাসা করে।

'এখন ত ছাড়বার সময় হ'ল।'—আরেকজন জানায়,—'নেমে এর চেয়ে আগে যাবার ট্রেন ত আর পাবেন না।'

'নামতে চাইছেন যখন, বাধা দিচ্ছ কেন মিছেমিছি।'—আরেকজন বলে—'বাইরে থেকে কলকাতায় যাওয়াই ত এখন ঝকমারি। এই দেখো না দু জায়গায় হঠাৎ 'কারফিউ'। না জেনে কেউ গেলে কি আতান্তরে পড়বে ভাবো ত?'

ছেলেটি কারফিউ-জারি-করা জায়গা দুটোর নাম খবরের কাগজ থেকে পড়ে শোনায়। একটা নাম নিশাপতিদের কলোনি এলাকার।

শিবতোষ বিচলিত হয়ে কলোনির নামটা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—'ওখানে কারফিউ?'

'হ্যাঁ, এই দেখুন না।'—ছেলেটি খবরের কাগজটা বাড়িয়ে জায়গাটা দেখিয়ে বলে,—'দুজন কাল সন্ধ্যায় মারা গেছে যে!'

শিবতোষ জায়গাটা পড়েন। একবার নয়, দুবার পর্যন্ত ঠিকই পড়তে পারেন,······

····এলাকায় আজ বোমা পিস্তল পাইপগান নিয়ে দু দলের প্রচণ্ড মারামারি বন্ধ করতে পুলিশকে প্রথমে টিয়ার গ্যাস ও পরে দু রাউণ্ড গুলি ছুঁড়তে হয়। অবস্থা আয়ত্তে আনবার পর সে জায়গায় দুটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার একটি মানসজীবন পাল নামে একুশ বছরের এক যুবকের বলে জানা গিয়েছে।···

দুবারের পর কাগজটা চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে যায়। কিন্তু শিবতোষ অকম্পিত হাতেই কাগজটা যথাস্থানে ফেরত দেন।

না আর নিশাপতিদের কলোনিতে যাবার কোন দায় শিবতোষের নেই। সেখানে একটা কঙ্কালসার বুড়ো যক্ষ্মারোগী শুধু শেষের কটা দিন গোনবার জন্যে পড়ে আছে। তার মরাবাঁচা নিয়ে পৃথিবীর কারুর কিছু আসে যায় না। যমুনাও তাকে দেখবার কোনো দায় শিবতোষকে দিয়ে যায়নি।

শিবতোষ কিন্তু নিজের সিটেই ফিরে আসেন।'

'সে কি! আপনি নামবেন না?'—যাত্রীদের একজন জিজ্ঞাসা করে একটু অবাক হয়ে।

'না।'—দৃঢ়স্বরে বলেন শিবতোষ,—'আমি কলকাতাতেই যাচ্ছি এই ট্রেনে।'
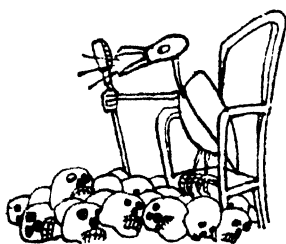
ভোটার সাবিত্রীবালা

....

বনফুল

তাহার নামটি একটু অদ্ভুত গোছের ছিল। রিপুনাশ। তাহার বড়দার নাম ছিল তমোনাশ। কিন্তু কালের এমনই গতিক যে কেহই কিছু নাশ করিতে পারে নাই। নিজেরাই নষ্ট হইয়াছিল। তমোনাশের জীবনে একটুও আলো প্রবেশ করে নাই। অ আ ক খ পর্য্যন্ত শেখে নাই সে। একেবারে নিরক্ষর ছিল। ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল বলিয়াই দুইজনের দুইটি সংস্কৃত নামকরণ হইয়াছিল। তাহাদের পিতা ছিলেন টোলের পণ্ডিত, মোহনাশ তর্কতীর্থ। লোকে সংক্ষেপে বলিত মোহন পণ্ডিত। সমাজে আজকাল সংস্কৃত পণ্ডিতদের কদর নাই। অতিশয় দরিদ্র ছিলেন তিনি। পুরোহিতগিরি করিতেন। তিনি যখন মারা যান তখন তমোনাশের বয়স ছয় বৎসর, রিপুনাশের তিন। তাহাদের মা রাঁধুনী বৃত্তি করিয়া সংসার চালাইতেন। তমোনাশের বয়স যখন ষোল তখনই সে 'লায়েক' হইয়া উঠিল। মস্তানি করিয়া বেড়াইত। ' একটা গুণ্ডার দলই ছিল তাহার। সে দলে তাহার নাম ছিল তম্‌না। গুণ্ডামি করিয়া কিছু রোজগার করিত সে। কিছু টাকা মাকে আনিয়া দিত কিছু টাকা নিজের আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিত। কিন্তু এ জীবন সে বেশী দিন চালাইতে পারে নাই। গুণ্ডামি করিতে গিয়া ছুরিকাহত হইয়া মারা গেল একদিন।

তাহার দেহটা ফুটপাথে কিছুক্ষণ পড়িয়া রহিল। তাহার পর পুলিস বাহিত হইয়া গেল মর্গে, ময়না তদন্তের জন্য। ডাক্তাররা তাহার দেহটা ছিন্নভিন্ন করিলেন। অবশেষে সেটা ডোমেরা অধিকার করিল। তমোনাশের মা তাহার মৃত পুত্রের শবদেহটা আর দাবি করিলেন না। লোকজন জোগাড় করিয়া শব দেহটার সৎকার করিতে যে টাকা লাগে সে টাকা তাঁহার ছিল না। চারিদিকে ধার জমিয়া গিয়াছিল, আর ধার বাড়াইতে ইচ্ছা হইল না তাঁহার। ডোমেরা তমোনাশের শরীরের অস্থিগুলি বাহির করিয়া পরিস্কার করিল এবং অবশেষে সেগুলি 'অ্যানাটমি'র ছাত্রদের নিকট বিক্রয় করিয়া কিছু পয়সা রোজগার করিল। এইখানেই তমোনাশের জীবনবৃত্তান্ত শেষ। তমোনাশের মা সাবিত্রী খুব একটা কাঁদেনও নাই। তাঁহার চোখেমুখে প্রচ্ছন্ন একটা অগ্নি কেবল ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিত। তাহা বাঙ্ময় নয়, দৃশ্যও নয়, কিন্তু নিদারুণ। সাবিত্রী যাঁহার বাড়িতে রাঁধুনী ছিল সেই ভদ্রলোক তমোনাশের মৃত্যুর পর সাবিত্রীর দুই টাকা মাহিনা বাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সাবিত্রী রাজি হয় নাই। সংক্ষেপে কেবল বলিয়াছিল 'দরকার নেই।' রিপুনাশ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত। যাহাদের ঘরে স্থান নাই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া যাহাদের জীবন অতিবাহিত হয়, যে-কোনও মজা, যে কোনও হুজুগ, যে কোনও মোটর অ্যাক্সিডেণ্ট, যে কোনও রাস্তার ভিড়, যাহাদের আকৃষ্ট করে তাহারাই ছিল রিপুনাশের সঙ্গী। দলের মধ্যে তাহার নাম ছিল 'রিপ্‌নে'। রিপ্‌নে কিন্তু তমনার মতো বলিষ্ঠ ছিল না। রোগা রোগা চেহারা। বাজারের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইত, মুটেগিরি করিয়া রোজগার করিত কিছু। বিড়ি খাইতে শিখিয়াছিল। প্রত্যহ এক বাণ্ডিল বিড়ি কেনার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা মাকেই আনিয়া দিত। এই ভাবেই চলিতেছিল। রিপ্‌নের বয়স যখন ষোল-সতের তখন হঠাৎ একদিন একটা কাণ্ড ঘটিল। সে এক ঝাঁকা কপি বহিয়া আনিয়া

এক মোটরওলা বাবুর মোটরের কেরিয়ারে সেগুলি সাজাইয়া রাখিতেছিল, গলার ভিতরটা কেমন যেন কুট কুট করিতে লাগিল। কাশি শুরু হইয়া গেল। মোটরওলা বাবু তাহার প্রাপ্য মজুরি বারো আনা পয়সা দিয়া চলিয়া গেলেন। রিপ্‌নে ফুটপাথে বসিয়া কাশিতে লাগিল। হঠাৎ কাশির সহিত উঠিল এক ঝলক রক্ত। রিপ্‌নে কিছুক্ষণ রক্তটার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বাড়ি চলিয়া গেল।

সাবিত্রী তাহাকে লইয়া গেলেন পাড়ার ডাক্তারবাবুর কাছে। তিনি বুক-পিঠে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'যক্ষ্মা হয়েছে।' আরও বলিলেন, 'আমাকে কিছু ফি দিতে হবে না। কিন্তু ওষুধ আর ইনজেক্‌শন কিনতে হবে। তাছাড়া ভালো খাওয়াদাওয়া করতে হবে। ডিম মাখন মাছ মাংস, ফল ইত্যাদি ইত্যাদি।' সাবিত্রী নীরবে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ মুখের অদৃশ্য অগ্নি শিখার বার্তা সম্ভবত ডাক্তারবাবুর মনে গিয়া পৌঁছিল। তিনি বলিলেন—তোমার যদি সামর্থ্যে না কুলোয় হাসপাতালে ভরতি হওয়াই ভালো। তোমাকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি সেইটে নিয়ে তুমি হাসপাতালে যাও। চিঠি লইয়া সাবিত্রী সাতদিন হাসপাতালের ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করিল। কিছুই হইল না। একটি রোগী বলিল—এখানেও বিনা পয়সায় কিছু হয় না, ঘুষ দিতে হয়। এ কথা শুনিবার পর সাবিত্রী আর হাসপাতালে যায় নাই। অত টাকা পাইবে কোথায় সে? বিনা চিকিৎসাতেই তাহার দিন কাটিতে লাগিল আবার। আবার সে রাস্তায় ঘুরিয়া মুটেগিরি শুরু করিল। একদিন তাহার এক সঙ্গী তাহাকে বলিল—'দেখ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। তুই যদি কোনক্রমে ছ মাস আলিপুর জেলে কাটাতে পারিস, তোর যক্ষ্মা ভাল হয়ে যাবে—'

'জেলে গেলে যক্ষ্মা সেরে যাবে বলিস কি?'

রিপ্‌নে কথাটা প্রথমে বিশ্বাসই করিল না।

সঙ্গী বলিল—'হরু জেল থেকে ভালো হয়ে ফিরে এসেছে। তার যক্ষ্মা হয়েছিল। সেখানে খুব ভাল হাসপাতাল আছে। বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে। তুই জেলে চলে যা।'

কয়েকদিনের মধ্যেই রিপ্‌নে ট্রামে পকেট কাটিতে গিয়া হাতে-নাতে ধরা পড়িল। সবাই যথেষ্ট প্রহার করিল তাহাকে এবং শেষে পুলিসের হাতে সঁপিয়া দিল।

আদালতে বিচারক বলিলেন—'তুমি তোমার পক্ষ সমর্থন করবার জন্য উকিল দিতে পার। উকিল নিয়োগ করবার সামর্থ যদি না থাকে আমরাই তোমার পক্ষে উকিল দিতে পারি একজন—'

রিপ্‌নে হাত জোড় করিয়া বলিল—না হুজুর, উকিলের দরকার নেই। পুলিস যা বলছে তা সত্য। আমি চুরিই করব বলে ওই ভদ্রলোকের পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলাম।'

বিচারক রায় দিলেন—'পঞ্চাশ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে একমাস জেল।'

রিপ্‌নে হাত জোড় করিয়া বলিল—'ধর্মাবতার, টাকা আমি দিতে পারব না। কিন্তু আমাকে একমাস জেল না দিয়ে ছ'মাস জেল দিন।'

বিচারক অবাক হইলেন।

'ছ' মাস জেল চাইছ কেন ?'

'আমার যক্ষ্মা হয়েছে। শুনেছি আলিপুর জেলে যক্ষ্মার ভালো চিকিৎসা হয়। ছ'মাসে সেরে যায়।'

বিচারকের রায় কিন্তু বদলাইল না। জেলের হাসপাতালে কিছু চিকিৎসা হইয়াছিল কিন্তু অসুখ সারিল না। রিপ্‌নে কাশিতে কাশিতেই জেল হইতে বাহির হইয়া আসিল একমাস পরে। ইহার পর আরও একমাস বাঁচিয়া ছিল সে। একদিন গভীর রাত্রে খুব কাশিতে কাশিতে উঠিয়া বসিল এবং মায়েরই পায়ের উপর প্রচণ্ড রক্ত বমি করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল বেচারা।

নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল সাবিত্রী। তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে

আগুনের হলকা বাহির হইতে লাগিল। এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করিল না সে।

ইহার মাস দুই পরে নির্বাচন হইয়াছিল।

সাবিত্রীবালা একজন ভোটার। তাহার দ্বারে মান্যগন্য একজন ভোটপ্রার্থী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সাবিত্রী তাঁহার দিকে অগ্নি দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, 'আপনাকে ভোট দেব? কেন? কি উপকার করেছেন আমার? আপনি যখন গদিতে ছিলেন—তখন আমার বিদ্বান স্বামী সামান্য ভিকিরির মতো মারা গেছেন। আমার বড় ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারি নি' শেষে সে গুণ্ডা হয়ে ছুরির ঘায়ে মারা গেল। ছোট ছেলেটা মল যক্ষ্মায়, তার কোনও চিকিৎসা হল না, সর্বত্র ঘুষ চায়। আপনাদের ভোট দেব কেন, কাউকেই ভোট দেব না—'

ভোটপ্রার্থী ভদ্রলোক বলিতে গেলেন—কিন্তু দেখুন গণতন্ত্রে—'

কিন্তু সাবিত্রী তাঁহাকে কথা শেষ করিতে দিল না।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—'বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে—'

তাড়াতাড়ি ভদ্রলোক বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দড়াম করিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিল সাবিত্রী।

জব চার্ণকের কলকাতা

....

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

গরমে এবং ঘামে সমস্ত শহর গেঁজে উঠেছিল। কলকাতা এখন গোটাটাই পিচ মোড়া। সেই পিচও গলে গলে কেবল ফুটতেই যেটুকু বাকি ছিল। এমন নিদারুণ দগ্ধ দুপুরে কার্জন পার্কের বিপরীত দিকে পিচের রাস্তায় একটি ভাসমান নরমুণ্ড পড়ে থাকতে দেখা গেল। দূর থেকে অর্থাৎ ময়দানের দিক থেকে মুণ্ডুটিকে অর্ধেক কামানো একটি নারকেলের মতো মনে হচ্ছিল। অথচ পথচারীদের এর জন্য বিশেষ কোন কৌতুক বা আগ্রহও দেখা যাচ্ছিল না। কলকাতাবাসী মাত্রেই এসব ব্যাপারে অতি মাত্রায় নির্বিকার। কারণ প্রত্যেকেই জানে, ইদানীং অত্যন্ত শালীনভাবে দুর্গানাম জপতে জপতে ঘর থেকে পথে নামা সহজ, কিন্তু যথাসময়ে আবার পথ থেকে ঘরে ফিরে আসার মধ্যে সন্দেহ থাকে প্রচুর। ফলে, অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিয়ে ঘাড় গুঁজে যে যার গন্তব্য-দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু যানবাহনগুলির কথা স্বতন্ত্র। এরা যতদূর সম্ভব মুণ্ডুটিকে এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করছিল। ইদানীং এরা প্রত্যেকেই ঘন ঘন ট্রাফিক জ্যামের জন্য সন্ত্রস্ত। গত কয়েক বছরের নজির ঘাঁটলেই দেখা যায়, পথ দুর্ঘটনা এবং ট্রাফিক জ্যামের হার শতকরা

পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে গেছে। এখন অত্যন্ত ছোটখাট কারণেই যে কোন রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে ভুরি ভুরি উদাহরণও দেওয়া যায়। যেমন ধরুন, আপনাদের এই রাধাগোবিন্দ ষ্ট্রীট দিয়ে মড়া কাঁধে বয়ে একদল কীর্তনীয়া মুঠো মুঠো খই আর পয়সা ছড়াতে ছড়াতে চলেছে। নিমেষের মধ্যে এদের পিছনে একদল খোসা ছাড়ানো মানুষের ছানা জমে গেল। এদের কোন ভ্রূক্ষেপই নেই, এই রাস্তায় মড়া বয়ে নিয়ে যাওয়ার মিছিল ছাড়াও গাড়ি ঘোড়া চলাচল করে। ফলে ট্রাফিক জ্যাম। ঠেলা, প্রাইভেট, রিকশা, লরি, ট্যাক্সি—দেখতে দেখতে উদোর ঘাড়ে বুধো এসে চেপে বসবে। ব্যস পাক্কা কয়েক ঘণ্টার দিকদারি। কিন্তু এর চেয়েও কত ছোট ছোট কারণে রাস্তাঘাট কেমন অচল হয় ভাবুন—পথে হাঁটতে হাঁটতে হয়ত কোন সজ্জন ব্যক্তির খেয়াল হল, এই যে ফুটপাতের উপর ডাবের খোলাটি পড়ে আছে, এটিকে একটা কিক্ মারলে কেমন হয়! কেমন আর হবে! সঙ্গে সঙ্গে ডাবটি গড়াতে শুরু করবে। গড়াতে গড়াতে অতর্কিতেই হয়ত কোন এক টাবগাড়ি-অলার পায়ে লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে ঠেলাওলা পায়ের উপর ঝুঁকে হাত চাপতে গিয়ে বুঝতে পারবে ময়লা ফেলার টাবগাড়ি থেকে যত রাজ্যের রাবিশ, পাতা, গ্লাস, মাছের কাঁটা, ডাল, ছেঁড়া কাঁথা, কাগজ, ঝাঁটা, ফুলের ডাঁটা সব সমেত রাস্তায় ঢেলেছে। ব্যস, ট্রাফিক জ্যাম। ট্যাক্সি, ট্রাম, প্রাইভেট, লরি, রিক্শ—এক কথায় বুধোর ঘাড়ে উদো।

এই রকম ছোটখাট হাজারো কারণে ইদানীং এই শহরের সমস্ত পথঘাট সব সময়ই সন্ত্রস্ত বলে সমস্ত গাড়ি ঘোড়াই মুণ্ডুটিকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছিল। এবং পথচারীরাও বেশির ভাগই শান্তিপ্রিয় লোক বলে মুণ্ডুটির জন্য কোন রকম আগ্রহ বা কৌতুক প্রকাশ করছিল না।

এই কাহিনীর যে কেন্দ্রমণি, সেই শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রশান্ত কয়ালও

একজন সজ্জন শান্তিপ্রিয় লোক। কিন্তু ভবিতব্য, তার মুণ্ডুটাই আজ এমনভাবে রাস্তার উপর পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

ঘটনাটা একটু খোলসা করেই বলা যাক। এবং একটু গোড়া থেকেই।

শ্রীযুক্ত প্রশান্ত ডালহাউসি পাড়ায় কোন এক সওদাগরী অফিসের হেড পিওন। বয়স অনুমান করে বলা যায় চল্লিশ কিংবা প্রায় চল্লিশ। সেইদিন প্রচণ্ড ত্নপুরে ক্যান্টিনের বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছিল প্রশান্ত। শরীরটা বিশেষ সুবিধের নয়, তত্নপরি চতুর্দিকে কলেরা। প্রশান্ত লেবু-চায়ের জোগাড় করে নিয়েছিল। লেবুর রসের জন্য চায়ের রঙ পুরনো মাংসের মতো মনে হচ্ছিল। অকস্মাৎ ও আঁতকে উঠে লক্ষ করল গেলাসের কানায় আরশোলার পায়ের মতো দাঁড়াকাটা কি যেন একটু ঝুলে আছে। প্রথমে ও তেমনভাবে গ্রাহ্য করল না। এ সমস্ত ছোটখাট দিকে গ্রাহ্য করলে বা উত্তেজিত হলে বিশেষ কোন ফল হয় না জেনে ও প্রতি ঢোকে এক একবার করে চোখ বুজে নিতে লাগল।

গ্রাহ্যের মধ্যে না আনাই প্রশান্তের চরিত্রের বিশেষ একটি দিক। ফলে সকলে ওকে শান্তিপ্রিয় লোক বলেই জানে। আট ঘণ্টার চাকুরির প্রায় সবটাই ওর ছাপোষা কেরানীবাবুদের সঙ্গে কারবার। বাকিটুকু কখনো সখনো খোদ সাহেবের কামরায়ও সেলাম ঠুকতে যেতে হয়। বড় সাহেব ওকে স্নেহ করেন। জীবনে সততার মূল্যাদি সম্পর্কে উপদেশ দেন। বলেন, জীবন বড়ই বিচিত্র হে প্রশান্ত। লোভ, লালসা, কামনা, বাসনা ইত্যাদির অনলে প্রতিটি লোক তিলে তিলে দগ্ধ হয়। এক্ষেত্রে বাঁচার একমাত্র পথই হচ্ছে সততাকে আঁকড়ে ধরা।

সাহেবের উপদেশ প্রশান্তকে কান পেতে শুনতে হয় বটে কিন্তু ওর ধারণা সততা বা শঠতা আসলে এ ত্নটো শব্দের কোনই পার্থক্য নেই।

যাই হোক এহেন প্রশান্ত চায়ের গেলাসে আর একবার চোখ পেতে বুঝতে পারল, আরশোলার পায়ের মতো যে বস্তুটিকে ও গেলাসের কানায় দেখতে পাচ্ছে আসলে সেটা একটা ভাঙা চিরুনির দাঁড়া। নখ দিয়ে বস্তুটিকে তুলে ধরতেই প্রশান্ত একটা স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেল। এবং ওর মনে হল দূরাগত কোন হাওয়াই জাহাজের শব্দের মতো ওর সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে একটা ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট কম্পন শুরু হয়েছে, এখনি ওর সমস্ত স্নায়ুগ্রন্থির মধ্যে বিশেষ এক প্রাচীন ধরনের যন্ত্রণা শুরু হবে। এ অবস্থায় ওর নিস্তার পাওয়ার একমাত্র পথই হচ্ছে এই অফিস পাড়ার কোলাহল থেকে দূরে কোন লোকালয়-বর্জিত নির্জন স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া।

চায়ের দাম চুকিয়ে দিয়ে সটান কাটা-দরজা ভেদ করে প্রশান্ত বড় সাহেবের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। এবং কিছুক্ষণ আকুতি-মিনতি করার পর ওর ছুটিও মঞ্জুর হল। সঙ্গে সঙ্গেই লিফট বেয়ে তড়িতের মতো নিচে নামল প্রশান্ত।

এই দগ্ধ দুপুরেও ফুটপাথে কাতারে কাতারে লোকের মিছিল চলেছে। তারই মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে ফলঅলা কাটা ফলের সওদা হাঁকছে। জি পি ও'র সামনে ভিড়। টেলিফোন ভবনে কয়েক গুচ্ছ হাঁসের মতো মেয়ে ঢুকছে। ওদিকে ট্রাফিক সামলাচ্ছে পুলিস। ও-পারে কাচের শো-কেসে পাতাবাহারের টব। ক্যামেরা ঝুলিয়ে লালচামড়ার টুরিষ্ট ঘুরছে! পেছনে ম্যাজিশিয়ানদের মতো কিছু কিছু খঞ্জ ভিখারী লেগে রয়েছে। হেড পিওন প্রশান্ত এইসব দেখতে দেখতে একসময় রাজ্যপাল ভবনের সামনে এসে এক পলক দাঁড়াল। গেটের সামনে এগিয়ে গেলে মরা কামান দেখতে পেত। ইচ্ছে করেই দেখল না। পুলিসী সংকেত লক্ষ না রেখেই রাস্তাটা ডিঙোতে গেল। কিন্তু ডিঙোতে গিয়ে ট্রাম বাঁচিয়ে পিচের উপর মধ্য রাস্তায় এসে পড়ল। এবং এরপর ও দাঁড়িয়েই রইল। এক পাও সামনে বা পেছনে বা পাশে নাড়তে পারল না। গাড়িগুলো

হুস হুস করে ছুটে আসছে। গাড়ির শব্দে সমস্ত অনুভূতি কেমন তালগোল পাকাতে লাগল। হাওয়াই জাহাজের শব্দটা যেন ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ওকে। চায়ের গেলাসের বাকি চাটুকু না খেলেই যেন ভাল করত প্রশান্ত। কলকাতা এখন কলেরা শাসিত। চায়ের গেলাসে আরশোলার পা এবং সঙ্গে কলেরা। প্রশান্ত এই মুহূর্তে ভুলে গেল চিরুনির দাঁড়ার জন্য ওর বহুকালের লালিত যে স্মৃতি তার জন্যই ও পথে নেমেছে। ওর মনে হল গুপ্ত ঘাতকের মতো কলেরার বীজ ওর পিছু নিয়েছে। এ অবস্থায় কোনক্রমেই নড়া সম্ভব নয়। প্রশান্ত নড়তে পারল না। ফলে, ক্রমে ক্রমে পায়ের নিচে গলা পিচ সেঁটে গেল।

সামনে এখন কার্জন পার্ক। পার্কের বড় বড় গাছগুলো যেমন ভাবে মাটির মধ্যে পা ডুবিয়ে স্থির, প্রশান্তও যেন তেমনিভাবে পিচের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। সন্দেহের চোখে পিচের দিকে তাকাল প্রশান্ত, দেখল, সত্যি সত্যি গোড়ালি অবদি ডুবে গেছে ওর। ফলে বড় আক্ষেপ হতে লাগল, আর একটু এগিয়ে গিয়ে বা পিছিয়ে এসে এমন একটা অবস্থায় পড়লে গাড়ি ঘোড়া আটকে ফেলতে পারত ও। ফলে ট্রাফিক জ্যাম—ট্রাম, ঠেলা, প্রাইভেট, ট্যাক্সি পরপর সব দাঁড়িয়ে যেত। ট্রাফিক জ্যাম হওয়ার মধ্যে কেমন একটা কৌতুক আছে মনে মনে প্রশান্ত বেশ উত্তেজনা বোধ করল। কিন্তু হায়, এখন কোন উপায়ই নেই।

ওদিকে ময়দানের দিকে মনুমেণ্ট। মনুমেণ্টের নিচে ছোট্ট মতো ভিড় একটা। কি কারণে ভিড় অনুমান করবার চেষ্টা করল প্রশান্ত। মনে হল, লোকগুলি উপরে উঠবে। উঠে কলকাতা শহরের দৃশ্যাদি দেখতে দেখতে বিমোহিত হয়ে উপর থেকে শূন্যে ঝাঁপ দেবে। মনুমেণ্টের পায়ের কাছে যে যারা ফুচকা বিক্রি করে, তারা তখন এইরকম দৃশ্য দেখে হাসবে। যে লোকটা ঝাঁপ দেবে সে চেষ্টা করবে পাখীর মতো হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে। খানিকটা সে ভাসবে।

কিন্তু যেহেতু সে পাখি নয় ফলে ঠিক চৌমাথার মোড়ে কোনও একটা দোতলা বাসের চাকার সামনে আছড়ে পড়তে হবে তাকে। ফলে, রোড জ্যাম। ঠেলা, রিক্শ, প্রাইভেট, ট্যাক্সি ইত্যাদি উদোর ঘাড়ে বুধো।

পিচের মধ্যে পায়ের অর্ধাংশই ডুবে গেল প্রশান্তর। নিচু হয়ে আবার দেখল, নাহ্‌ গোড়ালিদুটোর চিহ্নই নেই। এর ফলে ওর এখন উঠে আসবারও উপায় নেই। অথচ এজন্য এতটুকুও ক্ষোভ নেই প্রশান্তর। কারণ ও দেখছে, যে বেগে গাড়িগুলো ওর দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাতে ওর এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকাই শ্রেয়। এইভাবে অনড় হয়ে কার্জন পার্কের গাছের মতো কিংবা ঐ মনুমেণ্টের মতো।

গাড়িগুলো সাঁ সাঁ করে পেরিয়ে যেতে যেতে চোখে মুখে গরম বাতাসের ঝাপটা দিচ্ছে। প্রশান্ত চোখ বুজল। ফলে, এখন ও ঘনঘন মোটরের হর্ন শুনতে পাচ্ছে। এবং আশ্চর্য, হর্নের শব্দের সঙ্গে গাড়িগুলোর চেহারারও কেমন একটা মিল যেন খুঁজে পাচ্ছে ও। হর্ন শুনেই গাড়িগুলোর আকৃতি এবং গায়ের রঙও যেন বলা যায়। সবুজ, হলুদ, বাদামী, মেরুন নানান রঙের গাড়িগুলো ছুটে যাচ্ছে, ছুটে আসছে। ডালহাউসি টু ময়দান, ময়দান টু ডালহাউসি।

প্রশান্ত চোখ খুলল। দেখল, প্রায় হাঁটু অবদি পিচের মধ্যে ডুবে গেছে ও। সামনেই পুলিসের সাদা ছাতিটা বাতাসে একপাশে একটু কাত হয়ে আছে। পুলিস মহাশয় এবার বাঁশি ফুঁকছেন। এদিকে সবুজ বাতি হলুদ ডিঙিয়ে লাল হল। এবার এপাশের গাড়িগুলো পরপর সব থেমে পড়ছে। এখন গাড়িগুলো থেমে থাকবে। পায়ে হাঁটা লোকগুলি নিশ্চিন্ত মনে রাস্তা ডিঙিয়ে কার্জন পার্কে ঢুকে পড়বে। প্রশান্ত লক্ষ্য করল, ওর পাশ দিয়ে একদঙ্গল লোক হনহন করে পেরিয়ে যাচ্ছে। পা তুলবার চেষ্টা করল ও, অসম্ভব। লোকগুলোর মধ্যে কেউ কেউ আবার ওর দিকে কটাক্ষ

হানল। কেউ কেউ কৌতুকে ঠোঁট দুমড়ে হাসবার চেষ্টা করল।

প্রশান্তর মনে হল, লোকগুলো বড় স্বার্থপর। নইলে কখনো এমন হয়! অথচ যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন লোকই এমন একটা অবস্থায় পড়তে পারে। তখন এই কৌতুক বা হাসি, তখন এই দাঁত বের করা ব্যাপারটার বদলা নেওয়া যেতে পারে।

হুস হুস করে গাড়িগুলো এখন ওপাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে দেখে প্রশান্ত নিশ্চিন্তে এপাশের গাড়িগুলোর দিকে তাকাল। গাড়ির ভিতরে খাকিশার্ট পরা একজন ড্রাইভার ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

প্রশান্তও অভিবাদন করার ভঙ্গিতে হাসল।

প্রশান্ত হাসছে দেখে ড্রাইভার চোখ ফিরিয়ে গম্ভীর হল।

প্রশান্তকে অবজ্ঞা করা হল, প্রশান্ত বুঝল। কিন্তু ও দুঃখ পেল না। কারণ ওর বুঝতে বাকি রইল না, এ ধরনের অবজ্ঞা লোকটা ওকে বেশিক্ষণ করতে পারবে না। ঐ মনুমেণ্টের উপর থেকে কেউ একজন লাফ দিয়ে পাখির মতো উড়তে শুরু করলেই রোড জ্যাম। ট্যাক্সি, প্রাইভেট, লরি, দোতলা বাস—, তখন হয়তবা দমকলে ফোন করতে হবে। দমকলের গাড়ি ছুটবে। হোসপাইপ দিয়ে জল ছেটাতে শুরু করলে ড্রাইভারের খাকি রঙের জামাটাও ভিজে যাবে। তখন খাকি রঙটা জলে ভিজে কালচে দেখাবে। এ অবস্থায় প্রশান্ত ওর দিকে তাকিয়ে মনের সুখে হাসতে পারবে।

আর তখন ড্রাইভার মহাশয় কি করবে ভেবে না পেয়ে প্রশান্ত আবার নিচে পিচের দিকে তাকাল। দেখল, ওর কোমর অবধি ডুবে গেছে। ও এখন কোমর বর্জিত একটা শো-কেসের পুতুলের মতো রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে যেন।

এই সময় ওর হাসি পেল। কারণ এই সময় ওদের বড়সাহেব ওকে দেখতে পেলে ওর একদিনের মাইনে কাটত। বড়সাহেবের

ধারণা হত, এমন একটা রসিকতা করার জন্যই প্রশান্ত আজ ছুটি চেয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে। বড়সাহেবের স্বভাব প্রশান্তর অজানা নেই। যে রোষের দৃষ্টি দিয়ে উনি প্রশান্তকে শাস্তি দেন সেই দৃষ্টিকেই আবার নরম করে উনি ওকে উপদেশ দেন। বলেন, বাঙালী জাতটাই আজ গাড্ডায় নেমেছে। তোমার কি মনে হয় প্রশান্ত, ঠিক নয় ?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

আজ্ঞে হ্যাঁ কি ! যে জাতটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে শঠতা এসে দানা বেঁধেছে তার আর রইল কি বল দেখি ! যে কটা বড় বড় সার্ভিসের কথা বলো, বাঙালীরা কি কমপিট করতে কসুর করে কিন্তু শেষটায় কেরানী কিংবা মাষ্টার হতে পারলেই বরতে যায়।

বাঙালী জাতটাই শঠ হয়ে গেছে কিনা ভেবে দেখতে সময় লাগে প্রশান্তর। তার আগেই ও মনে করতে পারছে, ওরই পরিচিত এক আত্মীয় ম্যাট্রিক ফেল করে শেষটায় যখন বয়স বাড়ল তখন চাকরির চেষ্টায় নামল। কাগজ দেখে চিঠি ছাড়ে, প্রথমে একটা দুটো। পরে গাদায় গাদায়। প্রথমে ফিটার মিস্ত্রি বয়, পরে ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং যে-কোন চাকরী খালি দেখলেই হল। সে ছেলেটি চাকরী না পেয়ে সিনেমার টিকিট, খেলার টিকিট ব্ল্যাক করে এখন।

ছেলেটার নাম মনে করবার চেষ্টা করল প্রশান্ত। নামটা ঠিক মনে আসছে না দেখে কার্জন পার্কের ষ্ট্যাচুটার দিকে তাকাল ও। ষ্ট্যাচুর মাথায় কাক বসে আছে। পায়ের কাছে বাঁধান বেদিতে দুজন মেয়েমানুষ। প্রশান্ত ভাবল, খারাপ টারাপ হবে হয়ত। ওরা কখনো বালিশ মাথায় ঘুমুতে পারে না। বালিশ রাখে পায়ের দিকে, তাতে সব রক্ত মুখে এসে জমা হয়ে মুখটাকে ফুলিয়ে রক্তাক্ত করে রাখে। এত দূরে থেকে ওদের মুখের রঙটা টসটসে কিনা ধরতে পারল না প্রশান্ত। ফলে ও বিরক্তিতে আবার নিজের দিকেই তাকাল। দেখল, ততক্ষণে ও গলা অবদি তলিয়ে গেছে।

ভারী আশ্চর্য সব ঘটনা এখন ঘটে যাচ্ছে যেন, কেবলমাত্র একটাই মুণ্ড এখন রাস্তার উপর অর্ধেক কামানো নারকেলের মতো পড়ে আছে। দেহহীন, কুমোর বাড়ির সার সার মুণ্ডু থেকে একটাকে এনে এই রাজ্যপাল ভবনের সামনে যেন বসিয়ে রাখা হয়েছে। কিংবা ম্যাজিশিয়নের কালো চাদর বিছানো টেবিলের উপরকার কাটা মুণ্ডুটাও হতে পারে। ভীষণ কৌতুকে প্রশান্ত নিজের পরিণতির কথা ভাবতে লাগল।

এমন সময় ও ফুটপাথে ঘোড়ার নাম ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে যাচ্ছে হকারটা। টেলিগ্রাম বেরলেও ওরা একই রকম শব্দ করে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে যায়। এখন কোন খবর নেই দেখে কাগজওয়ালাদের নিশ্চই খুব মন খারাপ। কলেরা নিয়ে তেমন কোন টেলিগ্রাম বার করারও সুযোগ নেই। প্রশান্ত ভাবল, এতদিনে ওর কলেরার টিকা নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।

বড়সাহেব বলেন, শুধু কলেরার কেন, টি এ বি সিটাই নিয়ে নেওয়া উচিত প্রশান্ত, কিন্তু কি ব্যাপার জানিস, ওদের ঐ পিচকিরির কথা ভাবলেই আর নিতে ইচ্ছে হয় না। আর কর্পোরেশনঅলাদের তো কথাই নেই। যাকে পাচ্ছে গ্যাদ গ্যাদ করে ফুঁড়িয়ে চলেছে। আরে বাবা, সিরিঞ্জটা একটু ধুয়ে পুছে নে।

কথাটা হয়ত ঠিক ; কিন্তু প্রশান্তের ধারণা ভূতটা রয়েছে অন্য জায়গায়। নইলে ঘন ঘন এত জাল ওষুধের কারখানাই বা আবিষ্কার হয় কি করে! এই সব ছোটখাট ব্যাপারে কোনদিনই প্রশান্ত মাথা গলাতে চায়নি, মাথা গলিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং গড়াতে গড়াতেই যতদূর যাওয়া যায়!

পুলিস আবার হাতদুটোকে জল কাটার মতো ভঙ্গি করে দুপাশে ছুঁড়ে দিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে লক্ষ্য করল প্রশান্ত অর্থাৎ এবার আবার ওদিকটা বন্ধ হয়ে এদিক দিয়ে গাড়ি ছুটবে। অর্থাৎ ময়দান টু ডালহাউসি, ডালহাউসি টু ময়দান

গাড়িতে গাড়িতে স্টার্ট পড়ছে। গাড়ি ছুটছে। প্রশান্ত গাড়িগুলির নিচের দিকটা দেখতে পাচ্ছে এখন। কারণ ওর ভাসমান মাথার উচ্চতা আট দশ ইঞ্চির বেশি নয়। ওর উপর দিয়ে অনায়াসেই গাড়িগুলো উতরে যাচ্ছে। যাচ্ছে যাক, কিন্তু একচুল এদিক ওদিক হলেই মাথায় এসে ঠোক্কর লাগবে ওর।

এই এই···যাহ্ শালা, কারো কোন ভ্রূক্ষেপই নেই যেন। হুস হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়িগুলো। গাড়ির নিচে তেল কালিতে মানুষের পেটের মতো নাড়িভুঁড়ি। কলকল করে পেট ডাকার মতো শব্দ উঠছে। ছলকে ছলকে গাড়িগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে ভয়ে ভয়ে কখনোবা প্রশান্ত চোখ বন্ধ করতে লাগল।

এবং হঠাৎ—

হ্যাঁ, হঠাৎই ছোট একটা ট্-সিটার প্রাইভেটের চাকা ওর মাথায় এসে ঠকাস করে হোঁচট খেয়ে লাফিয়ে উঠল। হেসে উঠল প্রশান্ত। পায়ে হোঁচট লাগলে যেমনভাবে লাফাতে লাফাতে কেউ কয়েক ধাপ এগিয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবেই গাড়িটা কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পর ঘড়ঘড়ে গলায় হর্ন বাজিয়ে আবার ছুটতে শুরু করল।

ব্যাপারটা ওর আশ্চর্য রকম ভাল লাগল। আরো কয়েকটা গাড়ি এইরকম ভাবে ওর মাথায় এসে হোঁচট খেলে ও হাসি চাপতে পারবে না। আয় আয়, প্রশান্ত সামনের ঐ মাল বোঝাই লরিটাকেই যেন ডাকতে লাগল। গাড়িটা সটান ওর মাথা বরাবর আসতে আসতে হঠাৎই আবার গা বাঁচিয়ে সরে গেল। সেয়ানা আছে ড্রাইভারটা। আর একটু অন্যমনস্ক হলেই হয়েছিল আর কি।

ছোট একটা মোটর বাইক ওর মাথার উপর দিয়ে ডিঙিয়েই যেন পেরিয়ে গেল। গাড়ির চালক অবাক হয়ে পেছন দিকে তাকাচ্ছে। প্রশান্তও সুযোগটাকে হাতছাড়া করল না, চোখ নাচিয়ে ইশারা করল, বাই বাই—

এমন সময় ওর নজরে পড়ল, ও-পাশে স্ট্যাচুর কাছে একজন তেল মালিশআলা দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার বয়স কম। প্রশান্তর মাথায় চুল খুব ঘন বলে ও লোভ সামলাতে পারছে না বোধ হয়। প্রশান্ত ওকে ধমকাবার জন্য চোখ ঘোরাল কিন্তু হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে হোঁচট খেয়ে সামনেই লাফাতে শুরু করল।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা পুলিসের গাড়িও হোঁচট খেল। সার্জেণ্ট বোধ হয় ওয়েরলেসে খবরটা এখন লালবাজারে পাঠিয়ে দিতে দিতে চাকুরি বজায় রাখছে। ও পাশে একসার ঘোড়সওয়ার যাচ্ছে। খেলার মাঠে আজ কোন চ্যারিটি আছে কিনা মনে করতে পারল না প্রশান্ত। বি সি রায় ফাণ্ড কিংবা কোন বন্যাটন্যা যদি হয়ে থাকে— গতবার আসামের বন্যায় ইণ্টারভিউ নিতে গিয়েছিলেন শ্রীনেহরু। নেহরুই কি, ঠিক মনে করতে পারছে না ও। তা, যে কেউই গিয়ে থাকুন, কাগজঅলারা বন্যার যা ছবি ছেপেছিল তা ওদের দশ বছর আগেকার কোন ছবি বোধ হয়। বন্যা হলে, কিংবা রেল পড়ে গেলে ঐ এক সুবিধে ওদের। পুরনো ছবিই ছাপা চলে। এক ছবিই, কেবল নিচের লেখাগুলি একটু পালটে।

একটা হুড খোলা গাড়িও শেষটায় হোঁচট খেল। ড্রাইভার সাহেব বেজায় চটে উঠেছে বুঝল প্রশান্ত। নইলে পুলিসটাকে ও অমনভাবে খিস্তি করে! পুলিসও ছাতি সামলাতে সামলাতে হাত না নামিয়েই তর্ক জুড়েছে।

ড্রাইভার বলছে, নিপাত যা হারামজাদা। পুলিস বলছে, রিপোর্ট

প্রশান্ত হাসি চাপতে না পেরে খুকখুক করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা লজঝড় লরি কোঁক করে হোঁচট খেয়ে সামনের লাইট-পোষ্টের গায়ে ধাক্কা মেরে থেমে পড়ল। ব্যাস ট্রাফিক জ্যাম। লরিটার পেছন পেছন সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে অন্যান্য সব গাড়ি-গুলো, ময়দান টু ডালহাউসির গাড়ি।

পুলিসটা ততক্ষণে হাত নামিয়ে এগিয়ে এসেছে লরির কাছে। কোমর থেকে যত্ন করে নোটবই খুলল। পেন্সিলের ডগায় থুতু মাখিয়ে নম্বর টুকল। লাইসেন্স দেখল।

ড্রাইভার একটা বিড়ি ধরিয়ে ফুটপাতে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

রোড জ্যাম। প্রাইভেট, ট্যাক্সি, লরি, ট্রাম। প্রশান্ত হাসছে। এই না হলে মজা হয়! এই না হলে জমে কিছু!

কাতারে কাতারে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। এখন অফিস টাইম নয়, তাতেই এই। অফিস টাইম হলে হুলুস্থুল লেগে যেত। অফিস টাইম নয় তবু কিছু কিছু লোক খিস্তি শুরু করেছে পুলিসকে! ভড়ং আছে শালাদের; খাকি জামা পছন্দ হল না, সাদা চাই। আবার কিছু কিছু লোক খিস্তি করছে পাবলিককে, শালার এই জাতটার যদি হয় কিছু। যে জাতের মেরুদণ্ড নেই সে জাতের কিছুই নেই।

ওদিকে তখন লাইট পোস্টে ধাক্কা খাওয়া লরির ড্রাইভারের সঙ্গে পুলিসের খুব বচসা শুরু হয়েছে। প্রশান্ত ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না বলে কান পেতে শুনবার চেষ্টা করল।

ড্রাইভার বলছে, রাস্তার উপর ইট, পাথর যা ইচ্ছে তাই যদি পড়ে থাকে, গাড়ি লাফাবে না।

পুলিস বলছে, তা আমি কি করব! আমার কাজ হাত দেখান, ব্যাস।

তা হলে বাপু নম্বর টুকছ যে?

আলবাত টুকব। রিপোর্ট করুন।

তখন কিছু কিছু করে ভিড় হয়ে গিয়েছিল, কয়েকজন বলল, মার শালা ড্রাইভারকে। ড্রিঙ্ক করে গাড়ি চালায়।

মার শালা কথা উঠলে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার দরকার হয় না। প্রশান্ত দেখল, ছোটখাট একটা দাঙ্গা বেঁধে উঠতেও আর দেরি নেই। দাঙ্গা বাঁধা মানেই সোডালেমনেডের দোকান লুঠ হওয়া। প্রশান্ত এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দেখল কোথাও কোন দোকান দেখা

যাচ্ছে না। কেবল দু-একজন জ্যোতিষী হাতের ছাপ্পা নিয়ে আর চক দিয়ে ফুটপাথে আঁকিবুকি এঁকে বসে আছে।

প্রশান্ত একবার হাত দেখিয়েছিল। জ্যোতিষী বলেছিল, সময় তোমার খারাপ চলছে।

প্রশান্তর বিশ্বাস হয়েছিল কথাটা। জ্যোতিষীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল ও।

জ্যোতিষী বলেছিল, পথ চলতে সব সময়ই সাবধান থাকবে। রাস্তাঘাটে যে কোন সময়—

কিন্তু একথাটা একদম সত্যি হবে না প্রশান্ত তা বুঝতে পারে। কারণ, ওর মতো এত সাবধানী আর একজনও দেখাও দেখি? ও কখনো চলতি বাসে লাফিয়ে ওঠে না; ঝড়ের সময় জলে ভেজার ভয়ে কখনো কোন গাছতলায়ও দাঁড়ায় না, কারণ ওতে বাজ পড়ে মরার ভয় আছে। কিংবা ওদের বস্তির কাছে যে ছোটমত পুকুরটা, তাতে নেমে ও কখনো সাঁতার কাটবারও চেষ্টা করে না, পাছে মাজার পেশিতে হেঁচকা লেগে ও ডুবে যায়। এক কথায় জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ গণনা যে মিথ্যে হবে একথা ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।

যাই হোক ততক্ষণে ও আর একবার ভাল করে চারপাশে তাকিয়ে দেখল, সোডালেমনেডের একটাও দোকান নেই। ফলে দোকান লুঠেরও ভয় নেই। কিছু উঠতি বয়সী ছোকরা এদিক ওদিক থেকে বাঁই বাঁই করে ছুটে আসছে, ট্রাফিক জ্যাম। যত দূর চোখ যাচ্ছে কেবল চাকা আর চাকা। আর ভিড়। ভিড় ঠেলে যারা ভিতরে ঢুকতে পারছে না তাদের মুখে নানা রকম কথা শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছে, মস্ত বড় এ্যাক্সিডেন্ট, দু'জন লোক খতম হয়ে গেছে। কেউ বলছে, লাইট পোস্টটাই লরির গায়ে ভেঙে পড়ে রাস্তা জ্যাম করেছে। কেউ বলছে, চোরাই মাল পাচার করছিল ড্রাইভার ধরা পড়ার ভয়ে অমনি ভাবে গাড়ি হাঁকায়, ফলে—

এমন সময় অবাক হয়ে তাকাল প্রশান্ত—একটা পুলিসের গাড়ি। বাঙালী এক সার্জেণ্ট ছোকরা গাড়ি থেকে নেমে সমস্ত দৃশ্যটা একবার দেখে নিল। তারপর হঠাৎ একটা বাঁশি বাজিয়ে সমস্ত ভিড়টাকে শান্ত হতে নির্দেশ করল।

প্রশান্ত ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল।

সার্জেণ্ট তখন জাল দেওয়া ঢাকা গাড়ির পেছনে এসে ভিতর থেকে দুজন লোককে নেমে পড়তে আদেশ করল।

প্রশান্ত ভাবল, লাঠিধারী একজোড়া ভেতো পুলিস হয়তো নেমে আসবে। কিন্তু যারা নামল তাদের দেখে আরও বিস্ময় বাড়ল ওর। প্রশান্ত দেখল, পুলিসের পোশাক। কিন্তু একজনের হাতে একটা বেলচা, অন্য জনের হাতে একটা ময়লা ফেলার ঝুড়ি। যাহ্ শালা—

সার্জেণ্ট বলল, ফরোয়ার্ড মার্চ।

ঝুড়ি আর বেলচাঅলা পুলিস দুজন মার্চ শুরু করল সামনের দিকে। ঠিক যেন ওকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে ওর দিকে। বুটের শব্দ হচ্ছে ঠকঠক করে। বুটের শব্দে কেমন যেন গুর গুর করে কেঁপে উঠল বুকটা।

প্রায় প্রশান্তর কাছাকাছি এগিয়ে আসতেই শোনা গেল সার্জেণ্ট চিৎকার করে হেঁকে উঠেছে, হল্ট।

ঝুড়ি আর বেলচাঅলা পুলিস দুজন থামল।

সার্জেণ্ট বলল, মারো বেলচা।

প্রশান্ত দেখল, বেলচাঅলা কপাৎ করে বেলচা চালিয়ে ওর মুণ্ডুটাকে পিচের রাস্তা থেকে শূন্যে তুলে নিয়েছে। ফলে, মাথাবিহীন দেহটা এখন পিচের মধ্যে গেঁথে রইল।

ভর ঝুড়িতে।

প্রশান্ত দেখল, ওর মাথাটাকে ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দিল বেলচাঅলা। ঠিক ধাঙররা যেভাবে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ময়লা ফেলে অনেকটা ঠিক সেইভাবে।

হ্যাঁ মশাই, কোন দিকে এখন নিয়ে যাওয়া হবে মাথাটাকে ? মিন মিন করে প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

কিন্তু ততক্ষণে সার্জেন্টের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে পুলিস দুজন।

সার্জেন্ট বলল, ফরোয়ার্ড মার্চ।

পুলিস দুজন আবার মার্চ শুরু করল গাড়ির দিকে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকজন যেন ভেলকি দেখছে। যেন সত্যি সত্যিই একটা ডুগডুগি বাজান ভেলকি ঘটে যাচ্ছে এখানে।

আর ঠিক এই সময়ই প্রশান্তর মনে পড়ল আজ সকালে অফিসে বেরুবার আগে খোকার মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দুর্গা নাম জপেছিল তিনবার। সন্ধ্যার সময়ও হয়ত বা শ্রীমতি রোজকার মতো সদরের কাছে ঘুরঘুর করবে।

হ্যাঁ মশাই, কাজটা কি ভাল হল ? সার্জেন্টকে শুধাল প্রশান্ত। দেহটা যে পিচের মধ্যে পড়ে রইল, ও বস্তুটি তুলবে কে ? ও মশাই শুনছেন কিছু ?

কিন্তু সার্জেন্ট বেশ নির্বিকার। কোন কথাই আমল না দিয়ে গাড়ি ছোটাতে বলল সামনের দিকে।

অস্থির হয়ে হামলে পড়ল প্রশান্ত, কি হল ? একি ধরণের অত্যাচার শুরু করলেন আপনারা ? ও মশাই, কানে যাচ্ছে কিছু ?

সার্জেন্ট ছোকরা একবার হাই কাটল, আহ্, থামুন দেখি। মাথাটাইতো ঝামেলা বাঁধিয়ে ছিল এতক্ষণ। ওটা পেলেই আমাদের চলে যাবে।

প্রশান্ত এবার অভিমানে আর রাগে গরগর করে বকতে লাগল, আচ্ছা, দেখে নেব সার্জেন্ট দাদা, কলকাতাটা কি চিরকালই এমন থাকবে। দেখে নেব একদিন।

কী আশায়

....

বিমল কর

সকালে ঘুম ভেঙে গেলে বিষ্ণু কয়েক মুহূর্ত কিছু অনুভব করল না; তারপর সে তার মাথা, চোখ মুখ, হাত-পায়ের সাড় পেল। করকরে মোটা কম্বলের তলায় শরীর বেশ গরম মনে হলেও মাথার অবস্থা থেকে তার ধারণা হল, জ্বরটর হয়েছে। মাথা খুব ভার লাগছিল, যেন কাল সারা রাত ইটের ওপর মাথা রেখে শুয়ে ছিল। আজ আর মাথা নাড়াবার সামর্থ্য নেই। বিষ্ণু চোখের পাতাও খুলল না। বাঁ চোখটা তেমন যন্ত্রণা দিচ্ছে না, কিন্তু ডান চোখের ভুরুর ওপর ফুলে আছে, হয়ত কালশিরে পড়ে গেছে। চোয়ালে দাঁতে-টাতেও ব্যথা আছে। বাঁ হাতের কনুই ঘাড় পিঠ এবং পায়েও ব্যথা যন্ত্রণা; আপাতত এই সব ব্যথা জায়গায় জায়গায় জমে রয়েছে যেন, বিছানা ছেড়ে উঠতে গেলেই ছড়িয়ে পড়বে।

বিষ্ণু শুয়েই থাকল। শুয়ে শুয়েই সে এক থেকে দশের মধ্যে তিনটে সংখ্যা চট করে মনে করল: তিন, পাঁচ, নয়। সতেরো কিংবা তিনশো উনোষাট—কোনোটাই বিষ্ণুর মনোমত হল না। তার কপাল খারাপ বলছে। এখনও যদি এই চলে—একই রকম তা হলে মুশকিল।

এবার বাঁ চোখের পাতা খুলল বিষ্ণু, তারপর আস্তে আস্তে ডান

চোখের পাতা। ডান চোখের পাতা ভাল করে খোলা গেল না। ভুরুর ওপর টনটন করছে। বিমর্বভাবে বিষ্ণু নিজের মুখে একবার সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে নিল। না, অক্ষত নেই; দু'এক জায়গায় কেটেকুটে আছে, একটু আধটু ফোলাও হাতে ঠেকছে; আয়োডিনের গন্ধও তার নাকে লাগছে এখন। বিষ্ণু অসহায়ভাবে নিজের মাথায় চুলেও অল্প হাত বোলাল। তার কি বেশ জ্বর হয়েছে? না, অল্পস্বল্প? ব্যথার জন্য বিষ্ণু কাল সন্ধ্যের পর থেকে দু' দুবার আর্ণিকা মণ্ট খেয়েছে, কুসুমবাবু দিয়েছিলেন। তেমন একটা উপকার হয়েছে বলে বিষ্ণুর মনে হল না।

আরও একটু বিছানায় শুয়ে থেকে বিষ্ণু উঠল। শুয়ে থেকে লাভ নেই। শুয়ে থাকলে তার শরীর বা মনের কষ্ট যাবে না হাত-মুখ ধুয়ে বিষ্ণুকে দেখতে হবে তার শরীরের অবস্থাটা ঠিক কতটা কাহিল হয়েছে। আর, এটা কোন রকমে সামলে নেবার চেষ্টা করতে হবে। কেন না সে এখনও এই অবস্থাতেও সরে আসতে রাজী নয়।

খদ্দরের মোটা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে স্যাণ্ডেলে পা ঢোকাতে গিয়ে দেখল ওপরের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গিয়েছে। এটা কালই হয়েছে। ছেঁড়া চটিটা পায়ে গলিয়ে বিষ্ণু কিভাবে বাসায় ফিরেছিল তা আর মনে পড়ল না। হয়ত সে বুঝতেই পারে নি তার চটির এই হাল। ঘুঁষি চড় লাথির চোটে তার শরীরের এমনই অবস্থা এতই অবসন্ন সে—যে নিজেকে মৃতপ্রায় লাগছিল; স্বাভাবিক হুঁশটুকু তার ছিল না। ওই অবস্থায় সে ফিরেছে। ফেরার পর কুসুমবাবুর মুখোমুখি হতেই হইহই করে উঠলেন ভদ্রলোক। কুসুমবাবুর স্ত্রী—দিদি—জল গরম করে দিলেন। কোনো রকমে মুখটা পরিষ্কার হলে মহিলা কাটাছেঁড়া জায়গায় অয়োডিন লাগিয়ে দিলে কুসুমবাবু তার হোমিওপ্যাথি বাক্স থেকে দু' ডোজ আর্ণিকা মণ্ট দিলেন। বিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে এক পুরিয়া মুখে

দিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। এসেই বিছানা। কিন্তু সে ঘুমোয় নি। আচ্ছন্নের মতন পড়ে ছিল। রাত্রে কুসুমবাবুর স্ত্রী সামান্য কিছুটা দুধ এনে দিলেন। বিষ্ণু দুধটা খেল, জল খেল, আর্ণিকার পুরিয়া খেল। তারপর লণ্ঠন নিবিয়ে শুয়ে পড়ে ব্যথায় খানিকটা কাতরালো চাপা গলায়। শেষে কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

স্ট্র্যাপ ছেঁড়া চটি কোনো রকমে ঘসড়াতে ঘসড়াতে বিষ্ণু বাইরে এসে দেখল রোদ ডালিমতলার এপারে চলে এসেছে, তার মানে বেশ বেলা হয়েছে। সামনের জমিটুকু শীতের রোদে ভরা। একপাশে কাঠের তক্তার ওপর পুকুরের জল বয়ে এনে বাউরী ঝি বাসনমাজা শেষ করে ফেলেছে। কুসুমবাবুর স্ত্রী সকালের বাসি কাপড়-চোপড় ছেড়ে কেচেকুচে শুকোতে দিয়েছেন, শাড়িটাড়ি ঝুলছে ওপাশে। কাঠকুটো, কাঁটা তার দিয়ে বাঁধা বেড়ার গায়ে বুনো লতাপাতা কয়েকটা কলাফুলের ঝোপ। কিছু গাঁদা ফুটেছে এক কোণে, সন্ধ্যামণির ঝোপ হয়েছে। আর এই শীতে শিউলি গাছটা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিষ্ণু কয়েক পলক তাকিয়ে এই সব দেখল। ডান চোখটা সে পুরোপুরি খুলতে পারছে না, মাথাও বেশ ভার, হাত-পায়ে জড়তা—তবু বিষ্ণু চোখের সামনে, নিত্যকার জিনিসগুলো দেখে যেন কিছুটা সান্ত্বনা পেল। না, তার মাথার গোলমাল, জ্বরবিকার কিংবা দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয় নি। সে এখনও স্বাভাবিক। তার সঙ্গে যে লড়াই চলছে—সে লড়াই তাকে এখন পর্যন্ত মেরে ফেলেনি। বিষ্ণু আরও কয়েক দফা লড়তে পারবে।

মুখ ধোওয়ার জলটল আলাদা করে তোলা ছিল—কুয়ার জল; বিষ্ণু মুখ ধুতে নীচে নেমে গেল।

রোদের মধ্যে দড়ির ছোট ছোট চৌকি পেতে দিয়ে কুসুমবাবুর স্ত্রী চা দিলেন। কুসুমবাবুর স্ত্রীর নাম প্রভা; প্রভাময়ী না প্রভাবতী বিষ্ণু জানে না। সে দিদি বলে। দিদি বলতে তার ভাল লাগে।

কুসুমবাবু বলেন, 'আমি আজ বারো বছর শালাশালী শ্বশুরকশুরের কোনো ঝামেলা না রেখে জীবন কাটাচ্ছি, তুমি বিষ্টুচন্দর এই অবেলায় আবার কেন মায়া বাড়াতে আসছ! তবে হ্যাঁ, তুমি শুধু শালা নও, স্বয়ং বিষ্ণু, তাড়াতে পারছি না।' কুসুমবাবু অবশ্য কখনোও একথা বলেন না যে তারা নিঃসন্তান, আত্মীয়স্বজনহীন—ফলে এক আধজনকে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করতে তাঁদের ঔৎসুক্য কম নয়।

বিষ্ণু দড়ির ছোট চৌকিতে বসে চা খাচ্ছিল, রোদের দিকে পিঠ; প্রায় মুখোমুখি কুসুমবাবু বসে।

কুসুম বললেন, "বিষ্ণুচন্দ্র তোমার সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক। কাল আমি তোমার দিদিকে বলেছি—এভাবে আর চলতে দেওয়া যায় না।"

বিষ্ণু চায়ের গরম জল ডান চোখের ফোলার ওপর দেবার চেষ্টা করতে করতে বাঁ চোখ দিয়ে কুসুমকে দেখল।

"তুমি একদিন নির্ঘাত মরেফরে আসবে" কুসুম বললেন, "রোজ মার ধোর খাচ্ছ, আজ হাঁটু, কাল কবজি পরশু মাথা—একটা না একটা জখমই হচ্ছে তবু তোমার চেতনা হচ্ছে না। এরপর তো গলা টিপে শেষ করে দেবে। কি ছেলেমানুষী করছ তুমি!"

বিষ্ণু কোনো জবাব দিল না, চুপচাপ। রোদের তাতে তাঁর শরীরের জ্বর-ভাব বাড়ছিল না কমছিল সে বুঝতে পারছিল না। তার আরাম লাগছিল যদিও তবু ভেতরে কীরকম চাপা কাঁপুনি লাগছিল।

কুসুম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকলেন, যেন বিষ্ণুর কাছ থেকে কী জবাব পান দেখতে চাইছিলেন। বিষ্ণু কোনো জবাব দিচ্ছে না দেখে বললেন, "কি হে চুপ করে আছ কেন?"

বিষ্ণুর গলা এখনও পরিস্কার নয়, সর্দি জড়িয়ে আছে। গলা পরিস্কার করে বিষ্ণু একটা শব্দ করল। শব্দই যেন সার, কোনো জবাব নেই।

কুসুম অপেক্ষা করে থাকলেন।

শেষে বিষ্ণু বলল, "আমি পারছি না। ওর জোর বেশি।" বলে একটু থামল, আরও চাপা গলায় বলল, "ওর দলের ছেলেগুলোও কাছে থাকে।"

"সবই যদি বুঝছ তবে যাচ্ছ কেন?" কুসুম যেন খানিকটা অপ্রসন্ন।

বিষ্ণু প্রায় এক চোখেই কুসুমকে দেখছিল। এবার ডান চোখটাও বড় করার চেষ্টায় তার চোখের পাতা কাঁপতে লাগল। বলল, "বাঃ! যাব না?" বলে একটু থামল, আবার বলল, "না গেলে আমি হেরে যাব।"

এই বোকা, অদ্ভুত, অবাধ্য ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কুসুমের মনে হল জেদের বশে ছেলেটা কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছে, নিজের ভাল মন্দ বোঝার ক্ষমতাও তার নেই। পাগল একেবারে।

কাছাকাছি কোথাও প্রভা এসেছিল কোনো কাজে। কুসুম ডাকলেন, "ঘর থেকে একটা আয়না এনে তোমার ভাইকে দেখাও। শালা আমার রবার্ট ক্রুস···।"

বিষ্ণুর চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। কুসুমেব প্রতি এখন তার তেমন মনোযোগও নেই। বিষ্ণু ভাবছিল—এই জ্বরো ভাব, গায়ে হাতের ব্যথা কমাবার জন্যে তাকে কিছু করতে হবে। সে একবার রসোবাবুর ডাক্তারখানায় যাবে, সামন্ত কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে তার বেশ ভাবসাব হয়েছে। রসোবাবু তার এইরকম মূর্তি দেখলে নানান কথা জানতে চাইবেন। সামন্ত চাইবে না। সামন্ত কিছু কিছু জানে। সামন্তই তাকে দু' চারটে কড়া ট্যাবলেট দিতে পারবে, এই ফোলাটোলা, কাটাকুটি খানিকটা ধাতস্থ করে দিতেও পারবে হয়ত। বিষ্ণুর পক্ষে আজই সব সামলে নেওয়া সম্ভব নয়; কালকের চোট-জখম খানিকটা বেশি। কাল পরশুর মধ্যে অবশ্য বিষ্ণু আবার সামলে উঠে ওদের মুখোমুখি হতে চায়।

ততক্ষণে প্রভা একটা আয়না নিয়ে এসেছে।

কুসুম বললেন, "তোমার ভাইয়ের হাতে দাও, মুখটা দেখুক।"

প্রভা আয়না বাড়িয়ে দিল।

বিষ্ণু প্রথমে আয়না নিল না। তার অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রভার চোখে চোখ পড়তে বিষ্ণুর মনে হল: এ-সব ব্যাপারে দিদিও যেন ক্ষুণ্ণ, বেশ উদ্বিগ্ন। দিদিকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

কী মনে করে বিষ্ণু হাত বাড়িয়ে আয়নাটা নিল। নিয়ে নিজের মুখ দেখল। প্রথমেই ডান চোখের ওপর নজর পড়ল। বিষ্ণু যা ভেবেছিল তার চেয়ে বেশি, ভুরুর ওপর অনেকটা ফুলে গেছে, জামফলের মতন রঙ হয়েছে, সেই ফোলা যেন চোখের পাতায় ছড়িয়ে এসেছে। চোখের সাদা জমি—যেটুকু দেখা যাচ্ছে—লালচে মতন। চোখের তলাতেও সামান্য কালচে ভাব। গাল, খুতনি, কপালেও নানারকম কাটাছেঁড়া; আয়োডিনের দাগ খয়েরী হয়ে এসেছে। ঠোঁট ফুলে আছে একপাশে। নিজের মুখের এই অবস্থা দেখতে দেখতে বিষ্ণুর রাগ আক্রোশ হচ্ছিল, উত্তেজনায় তার জ্বরো ভাব যেন আচমকা বেড়ে গিয়ে এক দমক কাঁপুনি এল।

প্রভা বলল, "কতটুকু ক্ষমতা তোমার! পাজী হতচ্ছাড়াগুলোর সঙ্গে হাতাহাতি করতে যাও?"

বিষ্ণু আয়নাটা রেখে দিল। দিদি আজ রেগে রয়েছে। কাল কুসুমবাবুর সঙ্গে দিদির যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছে, বিষ্ণুকে নিয়ে, আলোচনাও হয়েছে, বিষ্ণু তা বুঝতেই পারছে। নয়ত দিদি এত রেগে থাকত না। বিষ্ণুর জন্যে দিদিকে কী কী শুনতে হয়েছে কে জানে! কুসুমবাবু বরাবরই এই ব্যাপারটা তেমন পছন্দ করছেন না।

কিছুই যেন বলার নেই, বিষ্ণু বাঁ হাতে একটু মাথা চুলকে কৈফিয়তের মতন করে বলল, "পান্নার আঙুলে লোহার ভারী আঙটি মতন ছিল, তাতেই লেগেছে।" বিষ্ণু এমনভাবে বলল কথাটা যেন, এই সব জখম বা এত বড় বড় চোট হবার কারণ পান্নার লোহার

আঙটি। ওটা না থাকলে বিষ্ণু কিছুতেই এ রকম জখম হত না, আর ছোটখাটো চোট হলে নিশ্চয় বলারও কিছু থাকত না।

বিষ্ণুর কথা বলার ধরনে প্রভা চটে গেল। বলল, "তুমি সাত ন্যাকার এক ন্যাকা। বেশ তো, এর পর পান্নার হাতে লোহার কাটারি থাকবে, তোমার মাথা দুখানা করে ছেড়ে দেবে আর তুমি এসে বলবে—পান্নার হাতে কাটারি ছিল। কী ঝকমারি। স্কুলে ক্ত বচ্ছর পড়ালে গাধা হয় শুনেছি, তুমি দেখছি তিন মাস না যেতে যেতেই গাধা হয়ে গিয়েছ।"

বিষ্ণু মুখ ফিরিয়ে গাঁদা গাছের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার খারাপ লাগছিল। কুসুমবাবুকে বিষ্ণু তেমন কিছু বলতে বা বোঝাতে চায় নি কোনোদিন, কিন্তু দিদিকে ব্যাপারটা সে যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করেছে। বিষ্ণু জানত, এই সব ঝগড়াঝামেলা, মারামারি দিদির পছন্দ না হলেও অন্তত বিষ্ণুর বেলায়—বিষ্ণু যে কেন এইভাবে বার বার লড়তে যাচ্ছে—দিদি ব্যাপারটা বুঝতে পারছে। আর পারছে বলেই উদ্বেগ ও বিরক্তি সত্ত্বেও দিদি বিষ্ণুর বিপক্ষে নয়। আজ দিদিকে অন্য রকম মনে হচ্ছে। বিষ্ণুর মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

প্রভা আর দাঁড়াল না, চলে গেল। আয়নাটা পড়েই থাকল।

কুসুম বিষ্ণুর বিমর্ষ ক্ষুব্ধ অবস্থাটা দেখতে দেখতে এবার কৌতুক করে বললেন, "তোমার খুঁটিও নড়বড়ে হয়ে গেছে বিষ্টুচন্দ্র, এটা বিপদসংকেত। আমি বলি কী, মাথাটাথা ফাটিয়ে ফিরে আসার আগে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাব খানিক। তুমি হলে শান্তশিষ্ট নরম ধাতের মানুষ, বাংলার মাস্টার, মাইকেল টাইকেল পড়াও বটে কিন্তু মেঘনাদ নও। তুমি এ সব গণ্ডগোলে থাকবে কেন? বদমাশ, ভ্যাগাবণ্ড, লোফার ক'টা ছোঁড়ার সঙ্গে তোমার লড়ালড়ি ভাল নয়, উচিতও নয়। স্কুলের মাস্টার তুমি—তোমার এ রকম হাল দেখলে সবাই বলবে কী। এরই মধ্যে তো নানা রকম গুজব শুরু হয়ে গেছে। কার মুখ তুমি

চাপা দেবে! মাথা ঠাণ্ডা করে ভাব খানিক, অকারণে ঝঞ্ঝাট ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ো না।"

এর পর কুসুম উঠে গেলেন। ঘরে কিছু কাগজপত্র পড়ে আছে। স্কুলের কাজ। কুসুম অঙ্কের মাস্টার, তা ছাড়া স্কুলের সিনিয়ার টিচার বলে কিছু অফিসের কাজকর্মও করার থাকে।

বিষ্ণু আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল। তার মাথা এত ভার, চোখের যন্ত্রণা এমনই যে কুসুমবাবুর কথাবার্তা সে যদিও শুনল তবু এ সব নিয়ে কিছু ভাবতে পারল না। শীতে কাঠ হয়ে থাকা শিউলিগাছটা বাতাসে নড়তে শুরু করল। বিষ্ণুর চোখ যদিও অন্যমনস্ক তবু শিউলি গাছের চাঞ্চল্য দেখে সে আচমকা নিজের চাঞ্চল্য অনুভব করল। করে উঠে পড়ল।

সেদিন রবিবার। ছুটি। পরের দিন ক্লাস প্রমোসান। তারপর দিন পাঁচেক বড়দিনের ছুটি। বিষ্ণুর করার কিছু ছিল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিষ্ণু প্রথমে কাছাকাছি ডুমুরতলার মোড় থেকে পায়ের চটিটা সারিয়ে নিল। তারপর হাতের ময়লা রুমালে ডান চোখটা মাঝে মাঝে চেপে ধরে সোজা রসোবাবুর ডাক্তারখানায় চলে গেল। এ সময় রসোবাবু থাকেন না। সেদিন সামনেই বসে ছিলেন। বিষ্ণুর ইচ্ছে নয় রসোবাবুর মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ভদ্রলোক যে কোনো ব্যাপারেই পঞ্চাশ রকম প্রশ্ন করেন। বিষ্ণু এ সবের জবাব দিতে চায় না। অগত্যা বিষ্ণুকে কাছাকাছি জায়গায় ঘুরঘুর করে সময় কাটাতে হল, রসোবাবু না-ওঠা পর্যন্ত। এরই মধ্যে বিষ্ণু দেখল রাস্তায় তাকে অনেকেই লক্ষ্য করছে, মুখচেনারা কাছে এসে প্রশ্নটশ্নও করল; বিষ্ণু এড়িয়ে যেতে লাগল: না, কিছু না—এমনি; পড়ে যাই নি ঠিক, ওই রকমই হয়েছিল; অন্ধকারে কী রকম একটা এই সব এলোমেলো কথা বলে বলে যখন আর পারছে না—তখন রসোবাবু ডাক্তারখানা ছেড়ে উঠে পড়লেন দেখে বিষ্ণু সেদিকে এগিয়ে

গেল। রসোবাবু এবার চললেন 'কল'-এ। বিষ্ণু ঠিক এই সময়ে তার দুজন ছাত্রকে দেখতে পেল। এই ভয় সে বরাবরই করছিল। ছাত্র দেখামাত্র বিষ্ণু খুব ঘাবড়ে গিয়ে রাস্তার কুকুরের ওপর দিয়ে লাফ মারল, মেরে সোজা রসোবাবুর ডাক্তারখানার পাশের দরজা দিয়েঢুকে পড়ল।

কম্পাউণ্ডার সামন্ত বোধ হয় কল্পনাও করে নি বিষ্ণুর এই রকম মূর্তি দেখতে হবে। সে ইদানীং বিষ্ণুকে মাঝে মাঝে তুলোটুলো ছুঁইয়ে দিচ্ছিল, দু'একটা বড়ি ফড়িও দিচ্ছিল। কিন্তু এবারে বেশ খানিকটা বাড়াবাড়ি। সামন্ত বলল, "অ্যাঃ হে; মুখটা যে থেঁতো করে দিয়েছে মাস্টার মশাই। বড্ড মেরেছে।"

বিষ্ণুর আর সহ্য হচ্ছিল না। কোনো রকমে সে বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচে। কালকের ঘটনা সম্পর্কে দু'চার কথা বলল বিষ্ণু। সামন্ত ততক্ষণে পরিষ্কার তুলো বের করে তার কাজ শুরু করেছে। রেকটিফায়েড স্পিরিট দিয়ে কাটাকাটিগুলো মুছিয়ে পাতলা করে মারকিওরেক্রম বুলিয়ে দিল। বলল, "চোখের ফোলাটা যেতে সময় লাগবে, সেঁক দেবেন আস্তে আস্তে। গায়ে একটু জ্বর এসেছে, দাঁড়ান কটা বড়ি দিচ্ছি।"

"ওই পান্না শালারা শয়তান" সামন্ত বলল, "বুঝলেন মাস্টারমশাই হাড় হারামী। ওদের জব্দ করতে হলে শুধু হাতে লড়লে চলবে না। ছোরাছুরি চাই।" বলতে বলতে ক্রোধেরবশে সামন্ত মলম-তৈরি -করা ছুরিটা হাতে তুলে বিষ্ণুর দিকে বাড়িয়ে ধরল। "একটা ছুরিটুরি সঙ্গে নেবেন। দেবেন শালার...."

"ছুরি?" বিষ্ণু অবাক হয়ে বলল। "ছুরি কেন?"

"না থাকলে একদিন আপনিই মরবেন।"

"না—" বিষ্ণু মাথা নাড়ল। "ছোরাছুরি নেবার কথা তো নেই। পান্নার কাছেও ছোরা থাকে না।"

সামন্ত সামান্য থতমত খেয়ে গেল। তারপর বলল, "থাকে না আপনি জানলেন কি করে? দরকারের সময় ঠিক বের করবে।"

বিষ্ণু মাথা নাড়ল। না, সে ছুরিটুরি নেবে না।

সামন্তর কাছ থেকে বিষ্ণু সোজাসুজি বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরে গোটা দুই বড়ি খেয়ে শুয়ে থাকল খানিক। তার বেশ শীত করছিল, মাথাও অবশ লাগছিল। শীতের বেলা বাড়তে বাড়তে প্রায় দুপুরের কাছাকাছি হয়ে এল যখন তখন বিষ্ণু ঘুমোচ্ছে। প্রভার ডাকাডাকিতে উঠল, স্নানটান করার কথাই ওঠে না, কিছু খেয়ে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সিগারেট খেল একটা। তারপর কী মনে করে তার ঘরের পেছন দিকে রোদে গিয়ে বসে থাকল। পৌষের রোদ এবার ভাটার দিকে, মাঠের ধুলো বাতাসে উড়ছে, খেজুর গাছের মাথা টপকে বালিয়াড়ির মতন উঁচু ঢিবিটা দেখা যাচ্ছিল তার কাছাকাছি হাট বসছে, হাটের কিছু কোলাহল ভেসে আসছে। দড়ির ছোট খাটিয়ায় শুয়ে থাকতে থাকতে বিষ্ণু আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

এইভাবেই দুপুর কাটল, বিকেল এল আর গেল, সন্ধ্যাবেলায় বিষ্ণু নিজের ঘরে। জাম কাঠের ছোট মতন টেবিলটার উপর লণ্ঠন জ্বলছে, পাশে একটা টিনের চেয়ার। সামান্য আগে প্রভা এসেছিল, কড়াইশুটি আর আলু সেদ্ধ করে গোলমরিচ দিয়ে সামান্য ভেজে এনেছিল। চা এনেছিল। বিষ্ণু খেয়েছে প্রভা কিছুক্ষণ ঘুরে বসেছিল। সামান্য কথাবার্তাও হয়েছে। বিষ্ণুর মনে হয়েছে: দিদি সকালের মতন অতটা আর রেগে নেই, এখন যেন খানিকটা নরম হয়ে এসেছে, কুসুমবাবু বিকেলের আগেই বাইরে বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেননি, ফিরতে রাত হবে।

সামন্তর ওষুধের গুণ বলতে হবে, সারা দিন পরে বিষ্ণুর এখন কিছুটা ভাল লাগছিল। বোধ হয় দুপুরে তার জ্বর এসেছিল, জ্বরের ঘোরও ছিল তার, শারীরিক বেদনা ও কষ্ট ছাড়া সে আর কিছু অনুভব করতে পারে নি। প্রায় আচ্ছন্নের মতনই তার সারা বেলা কাটল। এবার, এই সন্ধ্যের দিকে যেন সেই বেহুঁশ ভাবটা

কেটে গেছে অনেক। জ্বর আছে বলে মনে হচ্ছে না। গলার কাছে সামান্য ঘাম ফুটেছে, মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কম।

বিষ্ণু খানিকটা আগেই আরও ছুটো বড়ি খেয়েছে ওষুধের। এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে কম্বলের তলায় শুয়ে থাকল।

শুয়ে থাকতে থাকতে বিষ্ণু সমস্ত ব্যাপারটা আবার ভাবল, আগাগোড়া সব কিছুই, সে এখানে আসার পর যা যা ঘটেছে।

পুজোর আগে আগেই বিষ্ণু এখানে এসেছে। তারাপদ দত্ত—এখানকার স্কুলের বাংলার এক মাষ্টারমশাই, হুট করে চলে যাবার পর সেই চাকরিটা বিষ্ণু পেয়ে যায়। তারাপদ ছিল বিষ্ণুর বন্ধু, বছর খানেকের সিনিআর। তারাপদদা চিঠি দিয়েছিল : আমি কলেজে একটা কাজ পেয়েছি। তুমি যদি এখানে আসতে চাও আমার জায়গায় ঝটপট একটা অ্যাপ্লিকেসান পাঠাবে, আমি সাধ্যমত বলেকয়ে যাব ; তারপর তোমার ভাগ্য।

বিষ্ণুর ভাগ্য ভাল ; চাকরিটা তার হয়ে যায়। কুসুমবাবু কেন যেন তার হয়ে ছু কথা বলেও ছিলেন। এ ব্যাপারে তারা-পদদার হাত থাকতে পারে, কিংবা বিষ্ণুকে দেখে কুসুমবাবুর হয়ত পছন্দও হয়েছিল। বিষ্ণু সঠিক কিছু জানে না। চাকরি জুটলেও থাকার জায়গা নিয়ে অসুবিধে ছিল। কুসুমবাবু নিজের বাড়িতে বিষ্ণুকে জায়গা দিলেন।

ছু এক মাস করে এদিক ওদিক মাষ্টারী করলেও বিষ্ণু পুরোপুরি বা পাকাপাকিভাবে কোথাও চাকরি করতে পারে নি, পায়নি। এখানের চাকরিটা সেদিক থেকে স্থায়ী, বিষ্ণু কারও বদলি খাটতে আসে নি। চাকরিটা ভালই লেগেছিল বিষ্ণুর। এটা কোনো শহরে স্কুল নয়, জায়গাটাও ঠিক শহর নয়। এক সময় জায়গাটা নিশ্চয় পুরোপুরি গ্রাম ছিল—বড় গ্রাম ; ক্রমে আর গ্রাম থাকে নি যদিও গ্রামের পুরোনো গন্ধটা রয়ে গেছে। কাছাকাছি কয়েকটা কয়লাকুঠি চালু ছিল অনেক দিন ধরে, ইদানীং আরও ছড়িয়েছে, মস্ত ছুটো

ফায়ার ক্লে কারখানা হয়েছে, আর একেবারে হালে গড়ে উঠছে কাচ কারখানা। এর কোনোটাই এই জায়গার মাঝমধ্যে বসে নেই, কিন্তু গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে। ফলে এখন এ জায়গাটা গ্রাম নয় শহরও নয়, দুয়ের মেশামিশিতে এক আধা শহর।

বিষ্ণু জায়গাটা পছন্দ করে ফেলেছিল। স্কুলও তার ভাল লেগেছিল। তার বয়েস অল্প, অভিজ্ঞতাও প্রায় কিছুই নেই। বিষ্ণুর প্রথম প্রথম ভয় হয়েছিল সে হয়ত পড়াতে পারবে না। মাস খানেকের মধ্যে বিষ্ণুর সে ভয় কেটে গেল। পড়াতে তার আর কোনো অসুবিধেই হচ্ছিল না। বরং সে যত্ন করে মন দিয়ে পড়াতে পারছে বুঝে নিজেই বেশ খুশী হয়ে উঠেছিল।

গণ্ডগোলটার সূত্রপাত তার পর থেকেই। বিষ্ণু যখন নিজেকে প্রায় সব দিক দিয়েই মানিয়ে সে খুশী হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছিল—এবার তার আর দুশ্চিন্তার উদ্বেগের কিছু নেই—তখনই এই ঝঞ্ঝাটটা শুরু হল, পান্নাদের সঙ্গে গণ্ডগোল।

বিষ্ণু এমন মানুষ নয় যে সে নিজে এরকম বিশ্রী একটা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়াতে চাইবে। তার সেরকম চরিত্র নয়। স্বয়ং বিষ্ণু এমন ধাতের ছেলে যে, কোনরকম হামলা হুজ্জুত পছন্দ করে না। তার স্বভাব নরম প্রকৃতি শান্তশিষ্ট। লোকে তাকে নিরীহ, লাজুক, নম্র বলেই বরাবর জেনে এসেছে। চেহারাও বিষ্ণুর এমন নয় যাতে তাকে তেমন সবল পুরুষ বলে মনে হতে পারে। তার গড়ন বরাবরই রোগাধরনের, খানিকটা ছিপছিপে। মাথায় সে মোটামুটি লম্বা। তার স্বাস্থ্য না চোখেমুখে না হাতে পায়ে বুকে টগবগ করে ফুটছে বলে মনে হবে। তার গায়ের রঙ মামুলি, না কালো বা ফরসা ওই মাঝামাঝি। মুখ লম্বা ধরনের। নাকও বেশ লম্বা, যদিও তার কপাল তেমন ছড়ানো নয়। হাত পা দেখে কোনোদিন কেউ সন্দেহমাত্র করবে না যে বিষ্ণু হাতাহাতি লাঠালাঠি করার যোগ্য। বরং বিষ্ণুর চোখ, বিষ্ণুর পাতলা ঠোঁট, সরু সরু বিষ্ণুর আঙুল সামান্য

ঝুঁকে-পড়া পিঠ দেখে তাকে ভীরু, দুর্বল, অসহায় বলেই মনে হবে। ছেলেবেলায় ছোটরা যে রকম দৌরাত্ম সাধারণত করে থাকে—বিষ্ণু হয়ত ততটা করেছে আর বেশি নয়। বড় হয়ে সে সাইকেল চড়া এবং ব্যাডমিণ্টন খেলা ছাড়া আর কিছু শেখেনি। সে ফুটবল খেলা দেখেছে নিজে বড় হবার পর খেলে নি কোনদিন। কলেজে পড়ার সময় একবার বন্ধুরা তাকে হকি খেলতে নামিয়ে ছিল, বিষ্ণু যতবার ষ্টিক তুলে বল মারতে গেছে ততবার তার মনে হয়েছে সে বুঝি কোনো বন্ধুর মাথা, নাক কিংবা হাতে মেরে বসবে ; ফলে বিষ্ণু ষ্টিক তুলতে সাহস পায় নি।

যদি বলতেই হয় তবে বলা ভাল, বেচারী বিষ্ণু এ-যাবৎ একেবারে গোবেচারার মতন জীবন কাটিয়েছে। বন্ধুরা তার স্বভাব দেখে ঠাট্টা করে বলত, তুই শালা মেয়ে ছেলে হয়ে জন্মালি কেন ? সোজা কথা, যেসব পৌরুষ দেখে লোকে বাহবা দেয় সে-রকম পৌরুষ তার কোথাও ছিল না। সে কোনদিন জ্বলজ্বল করেনি লোকের মধ্যে, বরং মিটমিট করেছে। সে শখের গান গাইত, কবিতাটবিতা পড়ত, গল্প-উপন্যাস থেকে শুরু করে এলেরী কুইন-টুইন যা হাতে পেত পড়ে ফেলত। এক সময় তার প্লুরিসির মতন হয়েছিল সেই ভয়ে সে ঠাণ্ডায় ভয় পেত, জ্বরটর হলে মনমরা হয়ে পড়ত।

এই যে বিষ্ণু—নিরীহ, নরম, শান্তশিষ্ট, মিনমিনে, লাজুক এবং যেকোনো রকম উগ্রতাই যার অপছন্দ—সেই বিষ্ণু এখানে পান্নাদের মতন ছেলেদের সঙ্গে বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল।

সিগারেটটা ফুরিয়ে যাওয়ায় বিষ্ণু জানালার দিকে মাটির পিদ্দিমে—যেটা তার ছাইদান—নিবিয়ে ফেলে দিল। দিয়ে কম্বলের তলায় হাত ঢুকিয়ে নিল। নিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকল কিছুক্ষণ, আবার চোখের পাতা খুলল, লণ্ঠনের আলো দেখতে দেখতে পান্নাদের সঙ্গে তার গোলমালের সূত্রপাতটা মনে করতে লাগল।

এখানে আসার মাস দুই পরে, বিষ্ণু এখন নিজেকে সব দিক

দিয়ে মানিয়ে টানিয়ে নিতে পেরে খুশী হয়ে রয়েছে ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল। একদিন সন্ধ্যের পর—সামান্য রাত করেই সে কেদারবাবুর বাড়ি থেকে ফিরছিল সাইকেলে চড়ে। সাইকেলটা তার নয়, কুসুমবাবুর। কুসুমবাবু ইদানীং আর সাইকেল চড়তেন না, হাঁপানির জন্যে ছেড়েই দিয়েছিলেন। সাইকেলটা পড়েই ছিল; বিষ্ণু সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়ে চড়ছিল। পুরোপুরি শখ করেও সে চড়ছিল না। কেদারবাবুর বাড়িতে যাওয়ার জন্যেই সাইকেলটা তার দরকার হত। কেদারবাবুর বাড়ি খানিকটা দূরেই, বরাকর নদীর কাছাকাছি। প্রিমিয়ার ফায়ার ক্লে-র বড়বাবু তিনি, টালি-বাংলোয় থাকেন। বিষ্ণু যেত কেদারবাবুর শালীর মেয়েকে পড়াতে। মেয়েটির নাম শচী। মা-বাবা নেই মাসির কাছেই প্রতিপালিত হচ্ছে। শচীর বয়েস কমই, বছর আঠারো হবে হয়ত। শচীর চোখ-মুখ যেন পটে আঁকা, সুন্দর, লাবণ্যভরা; অথচ ভগবানের এমনই মার যে শচীর ডান পা অপুষ্ট। ছেলেবেলায় কী এক অসুখের পর থেকে এইরকম হয়ে গেছে। শচী তাই বরাবরই বাড়িতে পড়াশোনা করে। বিষ্ণুর প্রথম থেকেই শচীর ওপর মমতা পড়ে যায়। যথাসাধ্য যত্ন করেই বিষ্ণু তাকে পড়াচ্ছে।

সেদিন বিষ্ণু সাইকেলে করে ফিরছে, শীত পড়েছে প্রথম, চাঁদের আলোতে হিম জড়ানো; সামান্য উঁচু গলায় গান গাইতে গাইতে বিষ্ণু প্রায়-ফাঁকা রাস্তা ধরে আসছিল। এ-রকম গান—শখের গান বিষ্ণু গায়। সেদিন গানের কীরকম মনও পেয়ে গিয়েছিল বিষ্ণু। গোটা দুয়েক গান শেষ করে সে যখন 'পূর্ণ চাঁদের মায়ায়'....গাইতে গাইতে আসছে তখনও সে তার গায়ে ঘন করে জড়ানো শচীর দেওয়া মেয়েলী পাতলা চাদরটার জন্যে মাঝে মাঝে হঠাৎ চুপ করে যাচ্ছিল। এই চাদর শচী তাকে জোর করে দিয়েছে, বিষ্ণু নিতে রাজী হয় নি। বিষ্ণুর গায়ে নামমাত্র সোয়েটার, নতুন ঠাণ্ডা পড়ে গেছে, ফাঁকায় ফিরতে হবে বলে শচী জবরদস্তি করেই দিয়েছিল।

ঈশ্বরীতলা ছাড়িয়ে চৌমুখো বাজারটার কাছে এসে বিষ্ণু ভেবেছিল, নুটুর চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে ডান হাতের পথটা ধরবে। তাতে সুবিধে হবে সামান্য। জায়গা মতন মোড় নেবার সময় বিষ্ণু দেখল, ওই ছোট্ট রাস্তায় জনা চার-পাঁচ জটলা করছে। বিষ্ণু চিনতে পারল—এখানকার কয়েকটা বকাটে বাজে ধরনের ছেলে, পান্নার দলবল। বিষ্ণু ততক্ষণে গান থামিয়ে দিয়েছে, এবং কিছুটা বিরক্ত হয়েই ওদের গায়ের পাশ দিয়ে সাইকেলটাকে কাটিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে টাল খেয়ে পড়তে পড়তে পা বাড়িয়ে সামলে নিল। বিষ্ণু বলতে যাচ্ছিল, রাস্তা আটকে গল্প কেন, একটু সরে দাঁড়ালে কী হয়?—কিন্তু তার আগেই একজন বিষ্ণুর সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে ফেলল খ্‌প করে।

বিষ্ণু রীতিমত অবাক হয়ে গেল। এমন নয় যে তার সাইকেল ওদের কারও গায়ে লেগেছে। বিষ্ণু মুখের দিকে তাকাল ছেলেটার। "সাইকেল ধরছ যে?"

ছেলেটা কোনো জবাবই দিল না, বরং এমন করে সাইকেলটা বিষ্ণুর দিকে জোরের সঙ্গে ঠেলে দিল যে বিষ্ণুর হাঁটুতে সাইকেলের চাকাটা লাগল। বিষ্ণু 'উঃ' করে উঠল।

পান্না পাশের ছেলেটাকে সরিয়ে বিষ্ণুর মুখোমুখি দাঁড়াল। বিচিত্র মুখ করে দেখল, তারপর মুখ একটু নামিয়ে ঘাড় কাত করে এক চোখ প্রায় বুজে অন্য চোখ টেরা করে বলল, "আলো কই?"

বিষ্ণুর সাইকেলে অবশ্য আলো ছিল না। এখানে সাইকেলে আলোটালো কেউ রাখে না। নিতান্ত দায়ে পড়লে পকেট টর্চ জ্বালায়। বিষ্ণু বলল, "আলো নেই।"

"ঘন্টিও নেই নাকি—?"

ঘন্টি আছে, বিষ্ণু অবশ্য ঘন্টি মারেনি, কেননা সে একটু তাড়াতাড়ি মোড় ঘুরছিল এবং পান্নারা তাকে দেখছে দেখে অযথা আর ঘন্টি দেয় নি। বোধ হয় বিষ্ণু খানিকটা অন্যমনস্কও ছিল।

বিষ্ণু বলল, "ঘন্টি মেরে কী হবে। সামনাসামনি দেখা যাচ্ছে...."

"দেখা যাচ্ছে—! তুমি শালা মটরের হেডলাইট নাকি?" পান্না বিশ্রী মুখ করে খিঁচিয়ে উঠল।

বিষ্ণু 'তুমি' এবং 'শালা' দুটো শব্দই স্পষ্ট শুনতে পেল। সে বুঝতে পারল, পান্না ইচ্ছে করেই শব্দ দুটো বলেছে। বোধ হয় বিষ্ণু প্রথমে তার সকরেদকে 'তুমি' বলেছিল বলেই। বা পান্নার এটা ধরনও হতে পারে। বিষ্ণুর রাগ হল। সে স্কুলের মাস্টার, আর ওরা এখনকার হতচ্ছাড়া বকাটে বদ ছেলে।

বিষ্ণু বলল, "কথাবার্তাগুলো ভদ্রলোকের মতন বলাই ভাল।"

সঙ্গে সঙ্গে পান্না একটা পা বিষ্ণুর দিকে বাড়িয়ে তার পা মাড়িয়ে দিল। "মাষ্টারী মারছ? তোমার স্কুলে আমরা পড়ি শালা?"

বিষ্ণুর পায়ে লেগেছিল, রাগও হচ্ছিল। কান গরম হয়ে উঠল; সাইকেলটা টেনে নেবার চেষ্টা করল হঠাৎ ঝটকা মেরে। এর ফলে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে একটা হাতল পান্নার গায়ে লাগল।

পান্না বিনা বাক্যব্যয়ে বিষ্ণুর হাত চেপে ধরে টান মারল, তারপর মুচড়ে ধরল। বিষ্ণু যন্ত্রণায় কাতরে উঠল, সাইকেলটা ততক্ষণে সে ছেড়ে দিয়েছে। পড়ে যাচ্ছিল সাইকেলটা, কে যেন—পান্নার দলের কেউ পড়ন্ত সাইকেল ধরে ফেলল।

একজন বলল, "মাষ্টারকে দশঘর নামতা পড়িয়ে দে পান্না··· ও নামতা ভুলে গেছে···· ।"

আর একজন বলল, "শালার প্রাণে খুব ফুরতি, গান গাইতে গাইতে আসছিল—ওর ফুরতি লিক্ করে দে।"

বিষ্ণু পান্নার হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "রাস্তার মধ্যে গুণ্ডামি হচ্ছে? হাত ছাড়ো।"

পান্না হাতের মোচড় আলগা করলেও হাত ছাড়ল না। বলল, "বদনচাঁদ! শালার শরীর তো মুরগীর মতন, তাতে আবার তড়পানি। মারব পাছায় লাথ মুখ থুবড়ে পড়বি।"

বিষ্ণু তার সমস্ত শক্তি দিয়ে পান্নাকে ঠেলা মারল। তাতে তার হাত আলগা হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বিষ্ণু দেখল পান্না বিষ্ণুর পায়ে পা রেখে ঠেলে দিয়েছে। বিষ্ণু রাস্তায় উলটে পড়ল।

ধুলোর ওপর কয়েক মুহূর্ত পড়ে থাকতে থাকতে বিষ্ণু শুনল তার দলবলের সবাই হাসছে। অট্টহাস্য। কে একজন ব্যাঙ ডাকার আওয়াজ করল। চোখে মুখে হলকা বেরোচ্ছিল বিষ্ণুর। সে উঠে দাঁড়াল।

বিষ্ণু উঠে দাঁড়াবার সময় তার গায়ের চাদরটা মাটিতে লুটোচ্ছিল। বিষ্ণু তুলে নেবার আগেই পান্নার দলের একজন সেটা কুড়িয়ে নিল। নিয়ে বিষ্ণুর নাকের ওপর ধুলো ঝাড়তে লাগল।

বিষ্ণু বলল, "আমার চাদর, সাইকেল দাও—"

"না", পান্না মাথা নাড়ল।

"কেন ?"

"খুশি।"

"আমার জিনিষ আমায় দেবে না ?" বিষ্ণু প্রায় চেঁচিয়ে বলল।

"না, না" পান্না যেন একই কথা বার বার বলতে হচ্ছে বলে বিরক্ত হয়ে শেষের 'না'-টা গলা ফাটিয়ে বিষ্ণুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, বলে মুখটা বিদ্রূপবশে হাঁ করে থাকল একটু। তারপর বলল, "নটবর নিমাই শালা। তুমি কিছু পাবে না।"

রাস্তায় পড়ে গিয়ে বিষ্ণুর লেগেছিল, রাগে তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে।

বিষ্ণু চিৎকার করে বলল, "গায়ের জোর ?"

"হ্যাঁ, জোর—। মুরোদ থাকে নিজের জিনিস নিয়ে যাও।"

বিষ্ণু নতুন করে চারপাশ দেখল না। তাকে চারপাশে ঘিরে চার পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে। পান্নার চেহারাটা প্রায় জন্তুর মতন না হলেও তাকে ওই রকম দেখাচ্ছে। মাথায় মাঝারী, চৌকস গড়ন, হাত পা মুখ শক্ত, পরণে প্যাণ্ট, গায়ে পুরো হাতা লাল পুলওভার। মাথার চুলগুলো খোঁচাখোঁচা। বিষ্ণু বেশ বুঝতে পারল এই দলের

হাত থেকে কিছু কেড়ে নেওয়া তার সাধ্য নয়। নিজের অক্ষমতা এবং অসহায়তা তাকে ধিক্কার দিচ্ছিল যেন। ছি ছি, ছি ছি। চোখ দুটো সামান্য ঝাপসা হয়ে এল। বিষ্ণু এবার মাষ্টারীর ঢঙে বলল, "তোমরা দল বেঁধে একজনের ওপর হামলা করে বিরত্ব ফলাচ্ছ? কাওয়ার্ড কোথাকার—!"

পান্না যেন কথাটা শুনল একটু। তারপর হোহো করে হেসে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে একজনকে বলল, "লে রে ফেলু মাষ্টার জ্ঞান দিচ্ছে—" বলে ফেলুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিষ্ণুর দিকে মজার মুখ করে তাকাল। তারপর আরও বিশ্রী ঢঙ করে বিষ্ণুর থুতনি ধরে নেড়ে এক বিঘত দূর থেকে একটা চুমু খাবার শব্দ করল। "হায় হায় মাস্টার, তোমায় শালা কী বলব, জ্ঞানচাঁদ না জ্ঞানচৈতন্য।....শোনো হে বদনচাঁদ, আমার দল তোমার কিছু করেনি—করলে দাঁড়িয়ে বুলি মারতে হত না। বেশ, এরা কেউ কিছু করবে না—তুমি সাইকেল আর চাদর নিয়ে যাও মুরোদ থাকে তো। আমি একলা থাকব, লড়ো শালা—কাম অন্...."

বিষ্ণু পান্নাকে দেখতে লাগল।

পান্না দু পা ফাঁক করে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। তার চোখ মুখে শয়তানীর হাসি! ভঙ্গিটা হিংস্র।

বিষ্ণু দাঁড়িয়ে থাকল।

পান্না বলল, "আ যাও পিয়ারী....,আ যাও....। মরদ কা বাত হাতি কো দাঁত। তোমায় কেউ কিছু বলবে না, তুমি আর আমি ফাইট করব। জিতলে তুমি শালা তোমার জিনিস নিয়ে যাবে। মা কালীর দিব্যি।"

বিষ্ণু বুঝতে পারল, পান্না তাকে চ্যালেঞ্জ করছে। সে পারবে না। কিন্তু...? বিষ্ণু পা বাড়িয়ে বলল, "সাইকেল আমার নয়, চাদরটাও পরের—। অন্যের জিনিস আমায় ফেরত দিতে হবে।"

পান্না এবার একটা খারাপ গালাগাল দিল।

বিষ্ণু যেন ছুটেই যাচ্ছিল, তার আগেই পাশে সরে গিয়ে বিষ্ণুর পায়ে ল্যাঙ মারল পান্না, বিষ্ণু মুখ থুবড়ে গিয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়াতেই পেছনে একটা লাথি মারল পান্না।

আর সম্ভব নয়। বিষ্ণু কোনো রকমে উঠে দাঁড়াল। ক্ষোভে, আক্রোশে, যন্ত্রণায় তার কান্না আসছিল। "তোমরা আমার জিনিস আমায় দেবে না?"

"না, ক্ষমতা থাকে লড়ে নিয়ে যাও।"

বিষ্ণু নীরব।

পান্না কী ভেবে বলল "এগুলো আমাদের জিম্মায় থাকল। আমাদের ক্লাব ঘরে থাকবে। ওই বাড়িটায়—" বলে পান্না আঙুল দিয়ে সামান্য তফাতে একটা চালা মতন ঘর দেখাল! "ইয়ং বেঙ্গল ক্লাব। বুঝলে হে বদনচাঁদ!"

বিষ্ণু বুঝল কী না কে জানে—সে এবার পা বাড়াল পরাজিতের মতন।

পান্না বলল, "তুমি লোকজন ডেকে সাইকেল চাদর নিয়ে যেতে এলে তোমায় আর এখানে ঘাড়ে মাথা নিয়ে থাকতে হবেনা মাষ্টার, হুশিয়ার থেকো। শালা ভদ্রলোকের কথা। মরদ কা বাত। একলা আসবে, লড়ে যাবে, ক্ষমতা থাকে তো নিয়ে যাবে..."

বিষ্ণু চলেই যাচ্ছিল। তবু দাঁড়াল। বলল, "বেশ....কিন্তু অন্যের জিনিস আমার বলার মুখ থাকল না।"

"তা হলে শালা প্রথমেই রোয়াবি করতে এলে কেন? হাত জোড় করে মাফি চাইলেই পারতে, মাপ করে দিতাম।—রোয়াবি যখন মেরেছ—তখন তুমি ভুগবে শালা, আমাদের কী!"

বিষ্ণু আর দাঁড়াল না। চলে এল।

এই ঘটনা বিষ্ণুকে তারপর থেকে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত করে দিয়েছে। সাইকেলটা কুসুমবাবুর, চাদরটা শচীর। সাইকেলের ব্যাপারে

কুসুমবাবুকে বিষ্ণু কিছুই বলেনি তিনি জানতে চাননি। কথাটা অবশ্য দিদি অর্থাৎ প্রভাকে বিষ্ণু বলেছে। সাইকেলের জন্যে প্রভার তেমনি দুশ্চিন্তা নেই, চিন্তা বিষ্ণুর জন্যে। বিষ্ণু জানে না, দিদি কুসুমবাবুকে আড়ালে সাইকেলের ব্যাপার বলেছে কিনা। কুসুমবাবু তো ও বিষয়ে চুপচাপ। শচীর চাদর নিয়েও বিষ্ণু খুব বিব্রত ও লজ্জিত। শচী প্রথম দিকে একবার অস্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস ও করেছিল; বিষ্ণু কী বলবে বুঝতে না পেরে মিথ্যে কথা বলেছিল: "পাছে গোলমাল হয়ে যায়—হারিয়ে টারিয়ে যায় ভেবে সুটকেসে রেখে দিয়েছিলাম সেদিনই। এমনই মুশকিল, সুটকেসের চাবিটা খুঁজে পাচ্ছি না। নিয়ে আসব একদিন।" শচী জবাব শুনে মুখ নীচু করে ফেলেছিল, আর ও প্রসঙ্গ তোলেনি।

আজ প্রায় একমাস হতে চলল ব্যাপারটা ঘটছে। এর মধ্যে আরও ঝঞ্ঝাট গেছে স্কুলের পরীক্ষা, খাতা দেখা। বিষ্ণুর মন যদিও ওই পান্নাদের দিকে পড়ে তবু তাকে কাজকর্ম করতে হয়েছে। কেদারবাবুর বাড়িতে আটদশ দিন যেতেও পারেনি—পরীক্ষার কৈফিয়ত দিয়ে কাটিয়েছে। এখন তার স্কুল, পরীক্ষা, খাতা দেখা কিছুই নেই। সে এখন ওই একটা ব্যাপার নিয়েই উদ্‌ভ্রান্ত।

পান্নাদের কাছে বিষ্ণু আরও বার পাঁচ ছয় গিয়েছে। পান্না ভদ্রবাড়ির ছেলে, কিছুটা লেখাপড়াও শিখেছিল, একেবারে ছেলেমানুষ নয়—বিষ্ণুর প্রায় সমবয়সী। বিষ্ণু ভাবত, পান্না হয়ত শেষ পর্যন্ত তার অন্যায় বুঝতে পেরে—বিষ্ণুর জিনিস বিষ্ণুকে ফেরত দিয়ে দেবে। অথচ পান্নার মতিগতি বিন্দুমাত্র সে-রকম নয়। যতবারই বিষ্ণু পান্নার কাছে গিয়েছে ততবারই সেই একই রকম—নোংরা কথাবার্তা, তামাশা, বিদ্রূপ মারধোর। বিষ্ণু প্রতিবারই মার খেয়েছে: পান্না তাকে নির্দয়ভাবে চড়, ঘুষি, লাথি মেরেছে,—হাত মচকে দিয়েছে; অসহায় চেহারা নিয়ে প্রতিবারই ফিরে এসেছে বিষ্ণু। সে তার জিনিস উদ্ধার করতে পারেনি।

প্রথম থেকেই বিষ্ণুর কী মনে হয়েছিল কে জানে সে পান্নাকে তার প্রতিপক্ষ বলে ধরে নিয়েছিল। এরকম প্রতিপক্ষের মুখোমুখি বিষ্ণু আগে কখনো হয়নি। বিষ্ণুর জেদ ধরে গিয়েছিল। আর ক্রমশই বিষ্ণু এক ধরনের হঠকারিতা বা পাগলামীর দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। অবশ্য বিষ্ণু একে পাগলামী বলত না, দিদি বলত, কুসুমবাবু বলতেন।

কিন্তু তা নয়। এটা পাগলামী নয়। ওই যে পান্নারা—দলবল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, পাজী হতচ্ছাড়া বদমাশ ছেলের দল, ওরা সত্যি সত্যি কী? এরা আর যাই হোক, বিষ্ণু বুঝতে পেরেছে, তার প্রতিপক্ষ। গায়ের জোর ছাড়া অন্য কিছু এরা বোঝে না। শরীরে ক্ষমতাটাই এদের অহঙ্কার। এই অহঙ্কারবশে তারা মনে করে না অকারণে মানুষকে পীড়ন করা অন্যায়। নির্দয়, নিষ্ঠুর ইতর হতে কিংবা পীড়ন, অপমান, অসম্মান করতে এদের বাধে না; বরং এসব করতে পারলে তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বিষ্ণুর সঙ্গে ওরা প্রথম থেকেই এরকম ব্যবহার করছে। আজকাল আরও বাড়াবাড়ি শুরু করেছে—পথেঘাটে তারা বিষ্ণুকে টিটকিরি মারে; রগড় করে কথা বলে খুঁচিয়ে অপমান করার চেষ্টা করে। বিষ্ণুর সাইকেলটা যে তাদের এক্তিয়ারেই রয়ে গেছে। এখনও এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যে মাঝে মাঝে পান্নাদের ইয়ং বেঙ্গল ক্লাবের চালাঘরের কাঁচা বারান্দায় সাইকেলটা বের করে রেখে দেয়। রাখেও কিম্ভুতভাবে চাকা দুটো আকাশের দিকে তুলে উল্‌টে, এঁকিয়ে বেঁকিয়ে। সেই সঙ্গে শচীর চাদরটাকে পতাকার মতন করে একটা চাকার সঙ্গে বেঁধে দেয়। বিষ্ণুর চোখে পড়ার জন্য এই সমস্ত করে। দেখলে মনে হয় বিষ্ণুকেই যেন ওরা চিৎপাত করে মাটিতে ফেলে দিয়েছে; ঠ্যাঙ তুলে, কোমর ভেঙ্গে হাত-পা দুমড়ে বিষ্ণু পড়ে আছে। সেই সঙ্গে শচীর চাদর তার গলায় লটকে রয়েছে।

এই নোংরামি, ইতরতা দেখলে বিষ্ণুর অসহ্য রাগ হয়, আক্রোশ হয়, অপমানে চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে কিন্তু সে কিছুই করতে পারে না। পান্নারা যখন তাদের ক্লাবের বারান্দায় বসে সিটি মারে, কিংবা জঘন্য ভাবে সকলে মিলে তালি ঠোকে, অশ্রাব্য কথাবার্তা ছুঁড়ে মারে —তখন বিষ্ণু মুখ নীচু করে চলে আসে। করার মতন তার কিছুই থাকে না।

যতই পান্নারা বাড়াবাড়ি শুরু করল ততই বিষ্ণুরও কেমন একরোখা ভাব বাড়তে লাগল। এখন সে ধরে নিয়েছে— পান্নার সঙ্গে তার লড়াইটা সম্মানের। পান্না জানে না, কিন্তু বিষ্ণু অনুভব করছে, বিষ্ণু যদি নিজের জিনিস ফিরিয়ে আনতে না পারে তবে বিষ্ণু বড় রকম মার খেয়ে যাবে। এ মার তার মনের: বিষ্ণু নিজের মর্যাদা আত্মসম্মান, অধিকারবোধ হারিয়ে ফেলবে। বিষ্ণু এত সহজে হার স্বীকার করতে চায় না। সে যতবার তার জিনিস ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে ততবারই মার খাচ্ছে। তবু বিষ্ণু এখনও তেমন মার খায়নি যাতে সে বাস্তবিকই পান্নার কাছে হার স্বীকার করে নেবে। বিষ্ণু লড়বে যতদিন পারে যতটা পারে—! তারপর দেখা যাক শেষে কী দাঁড়ায়।

কম্বলের তলায় বিষ্ণু আরও খানিকটা উসখুস করল। সামন্তর ওষুধ বোধ হয় খুব কড়া, শরীরটা আনচান করছে, জলতেষ্টা পাচ্ছে বিষ্ণুর। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না, অথচ গলা শুকিয়ে এসেছে।

শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু উঠল। জলটল খেয়ে সামান্য পরে ফিরে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বিষ্ণু নিজের মনেই মাথা নেড়ে বার কয়েক 'না—না' বলল। না, দিদি যা বলে সে হতে দিতে পারে না। কুসুমবাবুকে বলে বা পাড়ার এবং স্কুলের লোকদের বলে সে পান্নার কাছ থেকে তার জিনিষ উদ্ধার করে আনতে চায় না। অন্যের সামর্থ্যে বিষ্ণু নিশ্চয় তার সাইকেল বা চাদর নিয়ে আসতে

পারে কিন্তু তাতে বিষ্ণুর কোনো গৌরব নেই। তা ছাড়া পান্নার সঙ্গে তার লড়াই তাদের দু'জনের, অন্যের নয়; বিষ্ণু একাই লড়তে চায়। পান্নাও এখন পর্যন্ত কথার খেলাপ করেনি। একাই লড়ছে। বিষ্ণুও করবে না।

দিন চারেকের মধ্যেই একরকম সুস্থ হয়ে উঠল বিষ্ণু। এই কদিন তার মাথায় পান্না ভর করে থাকল সর্বক্ষণ। সে ক্রমাগত মার খেয়ে যেতে পারে না, তাকে যে কোনো রকমে একবার অন্তত জিততে হবে। বিষ্ণু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবল পান্না তাকে কীভাবে, কখন, কোন সুযোগে প্রথম চোট মারে। কীভাবেই বা সে অত তাড়াতাড়ি বিষ্ণুকে জখম করে দেয়। পান্নার জোর বেশি। তার হাত পা লোহার মতন শক্ত; সে নানারকম কৌশল জানে; মানুষ মারায় সে অভ্যস্ত। বিষ্ণু কোনো কিছুই জানে না। এমন কি বিষ্ণু তেমনভাবে একটা ঘুঁষি ছুঁড়তেও পারে না।

....তবু বিষ্ণু মনে মনে নানারকম ভেবে নিল। স্থির করল, এবার সে যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, কিংবা তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে সে মরমর হচ্ছে ততক্ষণ সে পান্নার সঙ্গে লড়বে।

সেদিন সন্ধের মুখে বিষ্ণু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। প্রভা দেখতে পেয়েছিল। শুধালো, 'কোথায় যাচ্ছ?' বিষ্ণু বলল, 'আসছি ঘুরে।' বলে সে অপেক্ষা করল না, উঠোন দিয়ে নেমে গেল।

বাজারের দিকে সরাসরি বিষ্ণু গেল না, ফাঁকা দিয়ে যেতে লাগল। সে প্রথম থেকেই উত্তেজিত হতে চাইছিল না, বরং মাথা ঠাণ্ডা করে হাঁটবার চেষ্টা করছিল; যেন প্রথম থেকে উত্তেজিত হবার অর্থ তার সামান্য যা শক্তি তা ফুরিয়ে ফেলা নষ্ট করা। বিষ্ণু তার যতটুকু শক্তি ততটুকু অটুট রাখতে চায়। রাস্তায় যেতে যেতে বিষ্ণু বরং নিজেকে জাগাবার চেষ্টা করতে লাগল, মনে মনে বলছিল: হাজার

হোক, বিষ্ণু তুমি তোমার মর্যাদার জন্যে লড়তে যাচ্ছ, তোমার জিনিষ ফেরত আনতে—এবারও যদি না পার, আবার যাবে, আবার, যতদিন না হাত পা ভেঙে ঠুঁটো হচ্ছে····। কথাগুলো বিষ্ণুকে কীরকম যেন উদ্বেল করছিল, ভরসা দিচ্ছিল।

পান্নাদের ক্লাবের কাছে গিয়ে বিষ্ণু দেখল, চালা ঘরের মধ্যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে পান্নারা হুল্লোড় করে তাস খেলছে, বিড়ি সিগারেট ফুঁকছে। বিষ্ণু সরাসরি বারন্দায় উঠে গেল। উঠে ছোট দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

পান্নারা প্রথমে খেয়াল করে নি। পরে চোখ পড়তে কে যেন অবাক হয়ে বলল, "আরে, বিস্টু ম্যাস্টার····!"

পান্নারা মুখ তুলে তাকাল। হাতের তাস হাতে। ঘরের একপাশে বিষ্ণুর সাইকেল দাঁড় করানো আছে, শচীর চাদরটা পান্না মাফলারের মতন করে গলায় জড়িয়ে নিয়েছে।

পান্না বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি শালা আবার এসেছ! না মাইরি লজ্জাফজ্জা নেই তোমার। কুত্তার মতন। ঝাড়-ফুঁক গায়ে লাগছে না তোমার।"

বিষ্ণু কোনো কথা বলল না।

একজন তার হাতের সিগারেটটা পান্নাকে দিল। পান্না সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ছাইটা আঙুলে করে পরিস্কার করে নিয়ে বেঁকা চোখে বিষ্ণুকে দেখল। "আমরা তাস খেলছি, ভেগে পড়ো।"

বিষ্ণু বলল "আমার সাইকেল, চাদর—" "নেহি মিলেগা।"

"আমার জিনিষ আমি নেব।"

"না—" পান্না মাথা নাড়ল। তারপর কী মনে করে বিদ্রূপের সঙ্গে বলল, "তোমার শালা মুরোদ নেই। তুমি পারবে না। তোমার কলজেয় হবে না। এ জন্মে নয়। তার চেয়ে তুমি আমাদের—" বলে পান্না একটা অশ্লীল কথা বলল।

বিষ্ণুর মাথা গরম হয়ে উঠল। "জানোয়ার কোথাকার! লোচ্চা—!"

পান্না আর বসে থাকল না, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। সে উঠে দাঁড়াবার সময় তার পা লেগে হ্যারিকেনটা পড়ে গিয়ে দপদপ করছিল।

পান্না দাঁত পিষে বলল, "বাইরে চলো শালা, আজ তোমার জিব ছিঁড়ে নেব।"

বিষ্ণু চৌকাঠ থেকে সরে এসেছিল। বারান্দার একেবারে ধারে সে। পাশে মস্ত এক জবা গাছের ঝোপ। বারান্দার সামনে খানিকটা মেঠো জমি, ওপাশে বকুল গাছ।

পান্না খেপা মোষের মতন বারান্দা থেকে লাফ মেরে মাঠে নামল। তার মুখে অশ্রাব্য গালাগাল। পান্না হাত উঁচিয়ে বিশ্রীভাবে চিৎকার করে ডাকল, "চলে আয় শালা, বাপের বেটা হোস তো চলে আয়। আজ তোর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব তবে শালা আমার নাম।" বলতে বলতে গলায় জড়ানো শচীর চাদর সে টান মেরে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিল

বারন্দায় পান্নার সাকরেদদের পায়ের শব্দ ও কথা শুনতে পেল। মাঠে নেমে পড়ল বিষ্ণু। উত্তেজনায় তার পা কাঁপছে, চোখ মাথা গরম—আগুনের তাপ ছুটছে। তার প্রায় সামনাসামনি পান্না, দু হাত তুলে মত্তের মতন দাঁড়িয়ে, চাঁদের আলোয় তাকে প্রবল, ভয়ংকর ও ভীষণ হিংস্র দেখাচ্ছিল। পান্না যে কী বলছে বিষ্ণু কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না, তার দু চোখ শুধু পান্নার দিকে। বিষ্ণু চোয়াল শক্ত করে আবার বলল, "জানোয়ার—"

পান্না মাথার উপর থেকে হাত নামিয়ে বোধ হয় ঘুঁষি পাকিয়ে ছুটে আসছিল, বিষ্ণু তাড়াতাড়ি সরে যাবার চেষ্টা করেও পারল না, পান্নার ঘুঁষি তার ঘাড়ের পাশ দিয়ে বাতাসে পড়ল। আর ঠিক তখনই, কোনো উপায় না পেয়ে বা আচমকা কী মনে হওয়ায় বিষ্ণু তার পুরো মাথাটা প্রাণপণে পান্নার মুখের তলায় মারল। একেবারে

গুঁতো মারার মতন। পান্নার লাগল। কোথায় লাগল কে জানে—পান্না কাতরে উঠল। তারপরই সে সামলে নিয়ে বিষ্ণুর গলার কাছটা ধরে ফেলল। বিষ্ণু কিছু না বুঝেই পান্নার কুঁচকিতে জোরে একটা লাথি মারল। বিষ্ণুর গলা ছেড়ে দিয়ে পান্না পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে টলতে লাগল।

তারপর বিষ্ণুর আর কিছুমাত্র খেয়াল নেই। পান্না পাগলের মতন লাথি চড় ঘুঁষি চালাচ্ছে—অথচ সেগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, তেমন জোর নেই; প্রথম চোটে জখম হয়ে গিয়ে হয়ত পান্নার হাত পা তেমন কাজ করছে না। বিষ্ণু তার মাথা দিয়ে আরও দুবার পান্নার বুকে মারল। শেষে জাপটাজাপটি করে এলোপাথাড়ি মার চলছে। চলতে চলতে বিষ্ণু জানে না, কখন সে হঠাৎ নীচু হয়ে গিয়ে পান্নার পেটে মেরেছে। মারটা বেকায়দা হয়েছিল। পান্না পেটে হাত দিয়ে টলতে টলতে মাটিতে বসে পড়ল। পান্নার দলবল চেঁচাচ্ছে। পান্না নিজেও গালাগাল দিতে দিতে আবার উঠে দাঁড়াল। সোজা হয়ে দাঁড়াবার পুরো ক্ষমতাও তার নেই। আর বিষ্ণুও এই সময় তার এতদিনের পুঞ্জীভূত আক্রোশ, তিক্ততা যেন চরিতার্থ করার জন্যে উন্মাদ হয়ে গেল। হিংস্রের মতন, কাণ্ডজ্ঞান হীনের মতন বিষ্ণু এবার সটান একটা লাথি মারল পান্নার মুখে। আর্তনাদ করে পান্না আবার মাটিতে বসে পড়ল। বিষ্ণু ছাড়ল'না, ছুটে এসে আবার মারল। পান্না মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এই সময় কে যেন কী ছুঁড়ে দিল পান্নার দিকে। পান্নার কাছ থেকে খানিকটা তফাতে এসে পড়ল জিনিসটা। বিষ্ণু দেখল, ছোরা। ছোরাটা ঘাসের ওপর পড়ে আছে, একেবারে শচীর চাদরের কাছে। পান্না হাত বাড়িয়ে নেবার অনেক আগেই বিষ্ণু ওটা নিয়ে নিতে পারে। কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল।

পান্নার দলের ছেলেগুলো একেবারে চুপ। খানিকটা আগেও

চেঁচাচ্ছিল, এবার থেমে গেছে। হঠাৎই। বিষ্ণু ছোরাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সব চুপ।

পান্না আর উঠছে না। আশে পাশে লোকজনের গলাও পাওয়া গেল না।

লুটিয়ে পড়া পান্নার সামনে বিজয়ীর মতন দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল বিষ্ণু। এবার আশ্চর্য এক আনন্দ পেল সে। এতদিন সে শুধু মার খেয়েছে, পীড়ন সয়েছে, অপমানিত হয়েছে, আত্মসম্মান নষ্ট করে গেছে। আজ বিষ্ণু জিতেছে। এখন সে তার জিনিষ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। যেন পান্নার কাছে তার মর্যাদা এতকাল বাঁধা পড়েছিল—এইমাত্র 'বষ্ণু তা ছাড়িয়ে নিতে পারল। বিষ্ণুর গলার কাছে কোনো আবেগ, উচ্ছ্বাস আটকে ব্যথা ব্যথা করল।

"আমি জিতেছি—তোমরা দেখো; দেখে যাও—।" বিষ্ণু যেন এই কথাটা চেঁচিয়ে বলতে গিয়ে সামনে তাকাল। তারপর আশে-পাশে। পান্নার বন্ধুরা আস্তে আস্তে মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, পালাচ্ছে। "এই তোমরা কোথায় যাচ্ছ? দাঁড়াও, কাছে এসো, দেখে যাও—তোমাদের পান্না মাটিতে পড়ে লুটোচ্ছে, সে হেরেছে—আমি শেষ পর্যন্ত জিতেছি।"

আশ্চর্য, মাঠ ফাঁকা; কেউ নেই; বিষ্ণুর জিত দেখার জন্যে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। খারাপ লাগল বিষ্ণুর, হতাশা বোধ করছিল।

শেষে বিষ্ণুর ভয় হল—পান্না কী মরে গেল নাকি? কোনো সাড়া নেই। উঠেছে না, কাতরাচ্ছে না।

বিষ্ণু ধীরে ধীরে পান্নার মাথার কাছে বসল! ইস্, পান্নার নাকের তলায় রক্ত, গালে রক্ত, চোখ বোজা, চিবুক ফুলে গেছে, ধুলো লেগেছে তার কপালে, কানে। হাত ছড়িয়ে পান্না পড়ে আছে। না সে মরে নি, তার নিশ্বাস রয়েছে।

পান্নার লুটোনো, অচেতন, বিধ্বস্ত চেহারা দেখতে দেখতে একেবারে আচমকাই বিষ্ণুর কেমন মায়া হল। ও আর উঠতে

পারছে না, ওর কোনো সাড় নেই। পান্না পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে যেন মাটিতেই পড়ে গেছে বরাবরের মতন।

আর এই সময় সহসা, বিষ্ণুর চোখে জল এল। পান্নাকে সে যেন বলতে চাইল: তুমি ধুলো ঝেড়ে উঠে পড়। লড়ো। লড়ে যাও। আমি শালা বিষ্ণু—বার বার তোমার লাথি খেয়েছি, কিল চড়, ঘুঁষি—কী না, কিন্তু লুটিয়ে পড়ি নি, আবার এসেছি আমার জিনিষ ফেরত নিতে। কিন্তু তুমি যখনই পড়লে আর উঠতে পারছ না। তোমার সে ক্ষমতা নেই কেন? কেন?

বিষ্ণু হাত বাড়িয়ে পান্নাকে নাড়া দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করল তার কেন যেন চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। সে বুঝতেই পারছিল না কী আশায় সে এতদিন ধরে লড়ছিল, আর কেনই বা আজ জিতেও তার অদ্ভুত বেদনা জাগল!

বনলতা সেনের মৃত্যু

বুদ্ধদেব গুহ

সুব্রত চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। সব ঘোলাটে হয়ে গেছিল। রমেন পাশে বসেছিল। উল্টোদিকে পাড়ার ছেলেরা বেঞ্চে বসে চা খাচ্ছিল। শ্মশানের চায়ের দোকানের গুণ্ডাকৃতি লুঙি-পরা মালিক দুটো বেঁকা-হয়ে-দাঁড়িয়ে-থাকা ছোকরার সঙ্গে ফিসফিস করে কি কথা বলছিল—রমেনের পাশে বসে।

হঠাৎ রমেন বলল, অ্যাই, সুব্রত কি হচ্ছে কি? তুই এত বুঝিস আর তুই কাঁদছিস

চায়ের দোকানের মালিক এইরকম বাণী চব্বিশ ঘণ্টায় কম করে চব্বিশবার শুনছে। সে ষাঁড়ের মত ঘাড় ঘুরিয়ে জ্ঞানদেনেওয়ালা রমেনকে একবার দেখে নিয়ে, ছোকরা দুটোকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'দ্যাখ পেটো নিচ্ছিস নে, কিন্তু খামোখা খরচ করিসনি।'

ছোকরা দুটো বলল, 'মাথা খারাপ গুরু। শুধু পান্‌সে আওয়াজ করার জন্যে ঝেড়ে কি লাভ? লাইন কিলিয়ার করার জন্যেই ঝাড়ব।'

গুরু কানে-গোঁজা একটা অর্ধদগ্ধ সিগারেট বের করে নেড়েচেড়ে কি যেন ভেবে বলল, 'একটু পরে আসিস, দেখবখন।'

সুব্রত এমন বোমা-সংক্রান্ত আলোচনা শুনেও বিচলিত হল না। রিনটির মৃত্যুর খবরটা পাওয়ার পর থেকে ওর কপালের দুপাশের শিরাগুলো সব কেঁচোর মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রক্তের শীতল স্রোত অনবরত জুলফির পাশ দিয়ে ওঠা নামা করছে। তাছাড়া এমনিতেই বহুদিন হল সুব্রত বড় ক্লান্ত হয়ে আছে। ট্রামবাসের মাথা-ধরানো আওয়াজ, রেশনের দোকানের ভীড়, অফিসের ভবিষ্যৎহীনতা, মিছিলের বাঁধা-বুলির বুনন, কাঁদুনে গ্যাসের জ্বালা, বোমার আওয়াজ এ সব কিছুর কুৎসিৎ একঘেয়েমি ওকে একেবারে কুকুরের মত ক্লান্ত করে দিয়েছে।

সমস্ত জীবন, প্রতিটি মুহূর্ত ও একটু নরম শান্তি খুঁজে বেড়িয়েছে। শান্তি কোথাও মেলেনি। বনলতা সেনের মত তার জীবনে যে একজন ছিল সেই তাকে ও আজ শ্মশানে নিয়ে এসেছে।

রিনটি সাজতে খুব ভালবাসত। ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ওকে খাটে শুইয়ে ভিতর থেকে নিয়ে এসে বারান্দায় রেখেছিল। রিনটিকে একটি কমলারঙা গাদোয়াল শাড়ি পরিয়েছিল ওরা। চন্দনে ফুলে এমন করে সাজিয়েছিল ওকে, যেন মনে হচ্ছিল আজ ওর বিয়ে।

হরিধ্বনি দিয়ে ওরা সকলে শব তুলল। পাড়ার ছেলেই বেশী। রিনটির বরের পরিবার প্রবাসী বাঙালী। এখানে আত্মীয়-স্বজন কেউই নেই। চোঙাপ্যাণ্ট পরা ছেলেগুলো রিনটিকে কাঁধে তুলে মিছিলের শ্লোগানের মত হাত নেড়ে নেড়ে, বল হরি হরি বোলের নৈর্বক্তিক কর্কশ শব্দের ঢেউ তুলে ওর সুন্দর শরীরটাকে খাটের উপর ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এগোল। সুব্রত শবযাত্রা রওয়ানা হবার আগে একবার রিনটির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে প্রণাম করল। মনে মনে বলল, তোমাকে কতভাবে কতদিন বিব্রত করেছি—তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি—সোনা মেয়ে, আমায় ক্ষমা কোরো—নিজগুণে আমায় ক্ষমা করে দিও।

রিনটি জবাব দিল না কোনো। ক্ষমা করল কিনা বোঝা গেল না।

বেলা পড়ে আসছিল। সবাই অফিস-কাছারী থেকে ফিরছিল। হাসিহাসি মুখে সারাদিন খাটুনীর পর বাড়ি ফেরার আনন্দ নিয়ে। সবাই যখন বাড়ি ফিরছিল, রিনটি তখন বরাবরের মত বাড়ি ছেড়ে চলল। রিনটি বলত, 'জানো, আমারনা একটুও মরতে ইচ্ছে করে না। আমার অনেক দিন বাঁচতে ইচ্ছা করে—কত কি—কত কি করতে ইচ্ছে করে।'

পাড়ার একটি ছেলে শ্মশানের ভিতর থেকে দৌড়ে এল দোকানে, বলল, 'আমার চা কোথায়? সিঙ্গাড়া ভাজা হল?' অন্য জন তাকে শুধোল, 'চড়ালি?'

ও সপ্রতিভ গলায় উত্তর দিল 'অনেকক্ষণ জোর হাওয়া আছে—তিন ঘণ্টায় মামলা খতম।'

অন্যজন চিন্তিত গলায় বলল, 'না শেষ হলেই ঝাম্ মাইরী। আমার "লাজোয়াব রাতের" টিকিট কাটা আছে ন'টার শোয়ের। কিরে হবে ত?'

যে ছেলেটি দৌড়ে এসেছিল—কালো প্যাণ্ট ও লাল গেঞ্জী পরে, সে চটে উঠে বলল 'আছ ভাল শালা। এখানে বসে সিঙ্গাড়া সাঁটাচ্ছো আর জিগলিং দেখছ ওদিকে চিতার নীচে পাটকাটি গুঁজে গুঁজে আমার চোখ চাংডিল হয়ে গেল।'

সুব্রতর কিছু ভাল লাগছিল না। এত কথা, তার উপর এসব কথা।

সুব্রত জীবনে শুধু একটু শান্তি চেয়েছিল—। জীবনে অনেক কিছুই ত সে পায়নি, কিন্তু পায়নি বলে তার কোনো খেদ নেই। শান্তি পেল না—সারাজীবন শান্তির জন্যেই শুধু খেদ ছিল। সুব্রত দোকান থেকে উঠে পা-টেনে-টেনে শ্মশানের দিকে যেতে লাগল। সুব্রতর মাথাটা খুব ঝিমঝিম করছিল।

সুব্রতর আবার মনে পড়ল যে পথে যেতে আসতে রিনটির শ্বশুর-বাড়ির জানালার পর্দার উপরে জেগে-থাকা রিনটির প্রশান্ত কপাল ও কালো চোখ দুটি আর কোনদিনও দেখতে পাবে না, আর কোনদিনও হঠাৎ কোন শনিবারের বিকেলে পথে বেরিয়ে রিনটিকে বিকেলের হলুদ আলোয় হেঁটে যেতে দেখবে না। বাসের জানালায়, কোনো পরিচিতের বিয়েতে, রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর আলোজ্বলা-সন্ধ্যায় হঠাৎ হঠাৎ এক এক ঝলক খুশীর মত রিনটির মুখ, আর কখনো সুব্রতর সমস্ত অস্তিত্ব ভালোলাগায় ভরে দেবে না।

শ্মশানের চাতালে রিনটির বর বসেছিল। আজ তার উপরে সুব্রতর আর কোনো রাগ নেই। যাকে নিয়ে রাগারাগি সে তখন ওদের দুজনের চোখের সামনে দাউদাউ করে পুড়ে যাচ্ছিল। রিনটি তার বরের কাছে শুধু স্ত্রীর পরিচয়েই পরিচিত ছিল কিন্তু সুব্রতর সে ছিল "বনলতা সেন।"

রিনটির সঙ্গে দেখা হলেই সুব্রত চাপা গলায় মন্ত্রোচ্চারণ করত,

'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল
নাটোরের বনলতা সেন······।'

তখন রিনটি গর্বিত মুখ তুলে ওর দিকে তাকাত। বলত, 'আমার মধ্যে কি যে তুমি দেখেছো।' সুব্রত বলত, 'কি যে দেখেছি তা তুমি নাই বা জানলে।' সুব্রত ওর ঘামে-ভেজা হাতে হাত রেখে গাঢ়স্বরে নিরুচ্চারে সমুদ্রের ফেনার মত কত কি বলত।

সুব্রত শ্মশানের চাতালে বসে কালি-পড়া লোহার থামে মাথা হেলাল। আগুনের তাপ খুব। চোখে মুখে হল্‌কা লাগছে।

রিনটির পা দুটো আস্তে আস্তে বেঁকে যাচ্ছে। কী সুন্দর পা ছিল

রিনটির। এখন রিনটির শরীরের কোনো অংশই আর দেখা যাচ্ছে না, চেনা যাচ্ছে না। ওর নিজের কাছে যা সবচেয়ে আনইম্পর্টেন্ট ছিল তা এখন আগুনের আক্রোশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। আগুনের ফুলকি উঠছে আকাশে।

সুব্রতর মাথার যন্ত্রণাটা খুব বেড়েছিল। আগুনের অনেক রকম রঙে সুব্রতর চোখ জ্বালা করছিল। চিতা থেকে বেগুনী, লাল, নীল, কমলা, হলদে রংমশালের রং উঠছিল আকাশে ফোয়ারার মত।

ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুব্রতর জ্বর জ্বর লাগতে লাগল। মাথাটা চাতালের থামে ভাল করে হেলান দিল সুব্রত। তারপর চোখ বুজে ফেলল।

সুব্রতর মনে হল ও রিনটির সঙ্গে (তখনো রিনটির বর হয়নি— বিয়ে হয়নি—) সেই পবিত্র সুগন্ধি রিনটির সঙ্গে, সীমারীয়ার পাশে এক হলুদ জঙ্গলে বেড়াতে গেছে। ওরা দুজনে নিরিবিলি একটা পাহাড়ি নালার পাশে কতকগুলি শান্ত শালগাছের ছায়ায় একটি বড় কালো পাথরে বসে গল্প করছে। গল্প করছে, কিন্তু কথা শোনা যাচ্ছে না। দুজনেই মুখ নাড়ছে। রিনটি ভীষণ হাসছে। রিনটির দাঁত ভালো না। হাসলেই রিনটির খারাপ দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ছে, কিন্তু সমস্ত মুখে এক দারুণ মিষ্টি ভাব ছড়িয়ে পড়ছে। সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে রিনটি হাসছে ; খুব হাসছে।

একটা চেঁচামেচিতে সুব্রত চোখ খুলল, দেখল ডোমটা রিনটির নাভিটা বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে বের করতে গিয়ে অনেকখানি ধুঁয়ো-ওঠা অর্ধদগ্ধ মাংসপিণ্ড বের করে ফেলেছে চিতার ভেতর থেকে—তাতেই চেঁচামেচি।

সুব্রত যত তাড়াতাড়ি পারে আবার চোখ বুজে ফেলল। সুব্রত কোনোদিন রিনটির নাভি দেখেনি। কিন্তু অনেকদিন কল্পনায় দেখেছে। কল্পনায় সে নাভি মৃগনাভির মত সুগন্ধি ছিল। দারুণ

সুন্দর ছিল। তার বনলতা সেনের নাত্নি এমনভাবে দেখতে চায়নি সুব্রত।

কোথায় যেন কি একটা ঘটে গেল—হঠাৎ চারদিকের সব গোলমাল থেমে গেল। আগুনের আভা, চিতার তাপ, রিনটির শরীরের পোড়া গন্ধ এ সমস্ত সুব্রতর অনুভবের বাইরের বস্তু হয়ে গেল। সমস্ত কোলকাতা শহরটা যেন হঠাৎ থাপু পাখির ডাকে ভরা কোনো দ্বাদশী চাঁদের রাতের মতো নিথর নির্জন হয়ে গেল। সুব্রত দেখল, কারা যেন ওকে একটা সুন্দর ফুল-সাজানো কাঁচের গাড়িতে সাজিয়ে গুজিয়ে শুইয়ে কোথায় যেন নিয়ে চলল। যে রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলল, সে রাস্তাটা সুব্রত চিনতে পারল। কিন্তু রাস্তায় কোনো ফিরিওলা ছিল না, ডিজেলের কালো প্রশ্বাস ছড়ানো বাস ছিলো না, কোনো কবিকে চাপা-দেওয়া খুনী ট্রামগাড়ি ছিলো না একটিও, মিছিল ছিল না, বোমার আওয়াজ ছিল না—শান্তি—সাবান-মেখে-চান-করে আসা রিনটির গায়ের গন্ধের মত—এক আশ্চর্য সুগন্ধি শান্তিতে সেই রাস্তা ভরে ছিল।

সুব্রত অবাক হয়ে দেখল, সেই আশ্চর্য শান্ত নির্জন পথের পাশে জীরহুল আর ফুলদাওয়াইর ঝাড় ফুটে আছে। একটি নীলকণ্ঠ পাখি সেই সুন্দর কাঁচের গাড়িটার উপর উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

যারা ওকে নিয়ে যাচ্ছে—তারা কেউ কথা বলছে না—হরিবোল হরিবোল বলে আর্তনাদ করছে না। রাসবিহারী অ্যাভিন্যু মহুয়া গাছে ছেয়ে গেছে। কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিমূল চতুর্দিক লালে লাল করে দিয়েছে। অনেকরকম পাখি ডাকছে। ঝিরঝির করে শান্ত হাওয়া বইছে। শুকনো পাতা গড়াচ্ছে মচমচিয়ে পথে পথে।

এমন একটি রাস্তা দিয়ে ওর রিনটির হাত ধরে এইরকম এক সকালে অনেকক্ষণ হাঁটবে বলে অনেকদিন ভেবেছিল সুব্রত। হয়নি।

এ জীবনে হয়নি। রিনটির শরীর খারাপ হয়ে গেছে। ওর বরের পেটের অসুখ করে গেছে। নানা কারণে, নানা বাধায় এরকম পথে, এরকম সকালে, রিনটির হাত ধরে হাঁটা হয়নি।

সুব্রত ভাবল কাঁচের গাড়ি থেকে নেমে রিনটিকে চিতার বিছানা থেকে তুলে নিয়ে এসে এখন হাঁটবে ওরা হাতে হাত রেখে।

রমেন হঠাৎ চীৎকার করে উঠল—'কি হল? কি হল? এ কি? এ কি?' কিন্তু রমেন হাত বাড়িয়ে ধরার আগেই সুব্রতর মাথাটা সশব্দে চাতালের উপর আছড়ে পড়ল। শরীরটা এলিয়ে এল কিন্তু হাঁটুর কাছ থেকে পা দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল। নাক বেয়ে কয়েক ফোঁটা নোংরা রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

রিনটির ভাসুর দৌড়ে ডাক্তার ডাকতে গেল।

চায়ের দোকানে ছেলেগুলো তখনো আড্ডা মারছিলো।

একজন শ্মশানের ভেতর থেকে জোরে দৌড়ে এসে বলল 'ঘাড়ে উট-পাখি। ঐ ১৩২/৩ নম্বরের সুব্রত পার্টি এইমাত্র টেঁসে গেল মাইরী।'

সবাই একসঙ্গে বলল, 'সে কিরে? কি হয়েছিল?'

লাল গেঞ্জী বলল, 'সেরিব্রাল থ্রম্বসিস্। কিন্তু আসলে পেরেম হয়েছিল। কেন? এতদিন পাড়ায় আছ, তোমরা কি দুজনের নেকু-নেকু ভাব দেখনি?

—'তা দেখব না কেন? কিন্তু প্রেম করে লাইফ দিয়ে দিল. এ যে লায়লামজনু বাবা। কোথাকার জানোয়ার মাইরী।'

—'পৃথিবীতে প্রেম বলে কিছু আছে না কি? এ পার্টি

মঙ্গলগ্রহের লোক নয় ত? প্রেমকে বোধ হয় ব্যাট হাতে ওয়ান-ডাউন খেলতে নামার মত একটা ভীষণ সিরিয়াস ব্যাপার বলে মনে করেছিল। হেভী ইডিয়ট যা হোক্।'

—'কটা বাজল দেখত?'

—'যত্ত ঝাম্—লাইফে একটুও শান্তি পেলাম না—ভাবলুম মিনুকে নিয়ে সিনেমা যাব—তা না দ্যাখ্ চিতায় গোঁত্তা মেরে মেরে সাড়ে-নটা কখন বাজল টেরও পেলাম না' বলেই পকেট থেকে 'লাজোয়াব রাতের' টিকিটটা বের করে, পাকিয়ে চায়ের দোকানের কেরোসিনের কুপী থেকে জ্বালিয়ে নিয়ে ছেলেটা সিগারেট ধরাল।

ঠিক তক্ষুনি পাশের গলিতে প্রচণ্ড শব্দ করে একটি বোমা ফাটল। অনেক লোক একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল। ছোটাছুটি শুরু হল। ওরা সকলে সে দিকে দৌড়ে গেল।

চায়ের দোকানের মালিক লুঙ্গি বাঁধতে বাঁধতে খড়ম খট খটিয়ে—'হারামজাদাদের মানা করলাম'—বলতে বলতে ঐ দিকে দৌড়ল।

একটা ছোট মাটির সরায় গঙ্গা থেকে মাটি তুলে ভর্তি করে রিনটির বর সরাটাকে চিতার পাশে রাখল। ডোমটা বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কালো পোড়া একতাল দুর্গন্ধ মাংসপিণ্ডকে সেই সরায় ভরে দিল। তারপর রিনটির চিতার ছাই পরিষ্কার করতে লেগে গেল। ঐ চিতাতেই সুব্রতকে চড়াবে বলে।

রিনটির বর সেই মাটির সরায় একদলা পাঁক চাপাল। তারপর গঙ্গার দিকে এগিয়ে চলল।

পেছনে পেছনে শ্মশানের ঠিকে-পুরুত সংস্কৃত মন্ত্র পড়তে পড়তে চলতে লাগল।

রিনটির বর সংস্কৃত জানে না। ওর ক্লান্ত কানে অতগুলো দুর্বোধ্য কটমট শব্দ শুধু ধাক্কা দিতে লাগল।

তারপর পিছল সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে নেমে, পচাপাঁক, প্রস্রাব ও মলের গন্ধভরা শীর্ণ গঙ্গায় রিনটির বর তার সুন্দরী মিষ্টি স্ত্রীর নাভিটিকে সরায় করে জলে ভাসিয়ে দিল।

সরাটি ঘোলা জলে হাত চারেক গিয়েই গুবুক্ শব্দ করে ডুবে গেল।

পুরুত দু টাকার নোটটা ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে বলল, 'শান্তি, ওঁ শান্তি।'

শবাগার

....

মতি নন্দী

মুকুন্দ খবরের কাগজের প্রথম পাতায় চারটি মৃত্যু সংবাদ দেখল, বাসিমুখেই, দু'জন বিদেশী মন্ত্রী, একজন বাঙালী ডাক্তার ও কেরলের এক এম পি। চারজনই করোনারি থ্রম্বসিসে। ওদের বয়স ৭২, ৫৫, ৫৮, ও ৫৬। মুকুন্দর বয়স ৫১, কিন্তু সে ব্যাঙ্কের প্রবীণ কেরানী। থাকে পৈতৃক বাড়িতে। ছোট সংসার, একতলা ভাড়া দেওয়া।

দোতালায় রান্নাঘর ও কলঘরের লাগোয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে মাজতে সে চিন্তিত স্বরে লীলাবতীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'থ্রম্বসিসে আজকাল খুব মরছে।'

লীলাবতী চা তৈরিতে ব্যস্ত। বলল, 'কে আবার মরল?'

হাঁ-করে ভিতরের পাটিতে বুরুশ ঘষতে ঘষতে মুকুন্দ বলল, 'খওরের কাগজে দিয়েছে, চাজ্জন্।'

'থম্বসিস হয়েই তো ছোঠ্ঠাকুঝ্ঝির শ্বশুর আপিস যাওয়ার সময় বাসের মধ্যে মরে গেল। পাশের লোকটা পর্যন্ত টের পায়নি। কি পাজি রোগরে বাবা!'

এরপর লীলাবতী যা-যা বলবে মুকুন্দর জানা আছে। কি দশাসই চেহারা ছিল, কি দারুণ রগড় করত, কি ভীষণ থাইয়ে ছিল ইত্যাদি। একতলার কলঘরের ছিটকিনি খোলার শব্দ হতেই মুকুন্দ বারান্দার

ধারে সরে এল। শুকনো শাড়িটা আলগা করে সদ্যস্নাত দেহে জড়িয়ে শিপ্রা বেরোচ্ছে। হাতে গোছা করে ভিজে কাপড়। শীতলপাটির মত গায়ের চামড়া, দেহটি নধর। লীলাবতী রান্নাঘর থেকে একটানা কথা বলে যাচ্ছে। মীরা স্কুলে যাবার জন্য আয়নার সামনে। মনু তার ঘরে এখনো ঘুমোচ্ছে।

শিপ্রা উঠোনের তারে কাপড় মেলে দিতে দিতে মুকুন্দকে দেখে ভ্রুকুটি করেই হাসল। গোড়ালি, মুখ ও দুটি হাত তোলা। চিবুক এবং বগলের কেশ থেকে জল গড়াচ্ছে। হাসতে গিয়েই ভারসাম্যটা টলে গেল সামান্য। তাইতে ওর বুক ও পাছার যৎসামান্য কম্পনটুকু উপভোগ করতে করতে মুকুন্দ মাজনের ফেনা গিলে, চেটো দিয়ে কষ মুছে নিয়ে হেসে লীলাবতীকে বলল, "এর থেকেও পাজি রোগ ক্যানসার।"

নিচের ভাড়াটে শিপ্রার স্বামী গৌরাঙ্গকে দিন কুড়ি আগে জবাব দিয়ে ক্যানসার হাসপাতাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন দিন গুণছে। লীলাবতী গলা নামিয়ে বলল, "যা অবস্থা দেখলুম, মনে হচ্ছে এ মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। বউ আর মেয়ের যে কি দশা হবে এরপর! মনুকে তুলে দাও তো, চা হয়ে' গেছে।"

মনুকে ডাকতে গিয়ে মুকুন্দ দরজার কাছে থমকে গেল। কাত হয়ে খাটে ঘুমোচ্ছে, লুঙ্গিটা হাঁটুর উপরে উঠে রয়েছে। বাইশ বছরের ছেলে, কলেজে পড়ে। ঈষৎ গম্ভীর প্রকৃতির। বাপের সঙ্গে কমই কথা বলে। মুকুন্দ সন্তর্পণে লুঙ্গিটা নামিয়ে মনুর কাঁধে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "ওঠ, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে কলঘরে মুখ ধুতে যাবার সময় মুকুন্দ দেখল, মেয়ের ফ্রকটা তারে মেলবার জন্য শিপ্রা ছুঁড়ে দিল এবং পড়ে গেল উঠোনের মেঝেয়। মুকুন্দর মনে পড়ল, তারটা এত উঁচু করে বেঁধেছিল গৌরাঙ্গই। ও খুব লম্বা। তখন ওর ক্যানসার ধরেনি।

দোতলা থেকে সিঁড়িটা এসে ঠেকেছে শিপ্রাদের দরজার পাশেই। ডানদিকে ঘুরে গেছে হাত-পনেরোর একটা গলি, সদর দরজা পর্যন্ত, বাঁদিকে উঠোন ও শিপ্রার রান্নাঘর। মুকুন্দ বাজারের থলি হাতে নীচে নামতেই শিপ্রা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে চাপাস্বরে বলল, "আজ কিন্তু রেশন তোলার শেষ দিন, নইলে হপ্তাটা পচে যাবে।"

"অফিস যাবার সময় দেব।" বলেই মুকুন্দ ওর পাছায় হাত রাখল।

"ধ্যাৎ," শিপ্রা কাজিল হেসে ছিটকে সরে গেল।

সদর দরজার গায়েই শিপ্রাদের ঘরের জানলা। মুকুন্দ একবার তাকাল, গৌরাঙ্গ বুকের উপর হাত রেখে স্থির চোখে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে। বাজার থেকে ফেরার সময়ও সে তাকাল। গৌরাঙ্গ জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে, চোখদুটো কঠিন, বরফের মত ঝকঝকে। যেন শীতলক্রোধ জমাট বেঁধে রয়েছে। অফিসে যাবার সময় মুকুন্দ শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে নামল। শিপ্রা দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে ঘরের দরজাটা ভেজানো। মুকুন্দর হাত থেকে দশটাকার নোটটা নেওয়া মাত্রই শিপ্রাকে সে জড়িয়ে ধরল। চুমু খেতে যাবে, কিন্তু শিপ্রার চোখ দেখে পিছন ফিরে তাকিয়েই তার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটল। মন্নু সদর দরজার কাছে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে। মুকুন্দর শরীরের মধ্যে তখন ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথায় উঠছে, হাড় থেকে মাংস খুলে খুলে পড়ছে।

শিপ্রা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মন্নু মাথা নিচু করে মুকুন্দর পাশ দিয়েই উপরে উঠে গেল। সদর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মুকুন্দ অসহায় বোধ করে অবশেষে শিপ্রার ঘরের জানলায় তাকাল। গৌরাঙ্গর চুল ধরে বাচ্চা মেয়েটি টানাটানি করছে। গৌরাঙ্গর চোখ থেকে জল গড়িয়ে ঠোঁটের কোল ঘুরে চোয়ালে পৌঁছে টলটলে একটা বিন্দু হয়ে রয়েছে।

বাসে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মুকুন্দর মনে পড়ল, জয়ার শ্বশুর বাসের মধ্যে থ্রম্বসিসে মারা গেছল। তারপর মনে হল, মন্নু কি আমায় ঘেন্না করবে?

"আজ সকালে আমাদের পাড়ার মধ্যে একটা খুন হয়েছে।" মুকুন্দর পিছনে কে একজন কাকে বলল, "পাইপগান দিয়ে মেরেছে। বছর আঠারো বয়স হবে।"

"রাস্তাতেই?"

"তবে নাতো কোথায়? বাড়ি থেকে বার করে এনে, রাস্তাভর্তি লোকের চোখের সামনে!"

"কেউ কিছু করল না।"

"পাগল! করতে গিয়ে কে প্রাণ খোয়াবে।"

"পুলিস!"

"এসে বডিটা নিয়ে গেল!"

"অ্যারেস্ট করেনিতো কাউকে? এটাই রক্ষে। যা পেটান পেটাচ্ছে!"

বাসের লোকেরা, এরপর, পেটানোর নানান বীভৎস পদ্ধতির আলোচনা শুরু করল। মুকুন্দ তখন ভাবতে লাগল, আরো পনেরো-কুড়ি বছর যদি বাঁচি তাহলে মন্নুকে নিয়েই তো বাঁচতে হবে! কিন্তু কি করে বাঁচব যদি ও ঘেন্না করে?

অফিসের লিফটে পাঁচতলায় ওঠার সময় সে ভাবতে লাগল, মন্নু কি ওর মাকে ব্যাপারটা বলে দেবে? একেবারে ছেলেমানুষ নয়, সিরিয়াস ধরনের। হয়তো লজ্জায় নাও বলতে পারে। এই সময় মুকুন্দ শুনল, তার সামনের লোকটি পাশেরজনকে বলছে—"না ভাই, শরীর খারাপ নয়। ভাগ্নেটা পরশু মার্ডার হয়েছে, এখনো লাশ পাওয়া যাচ্ছে না। মনটা তাই—" লিফট চারতলায় থামতেই ওরা দুজন বেরিয়ে গেল।

চেয়ারে বসামাত্র পাশের টেবিলের অজিত ধর মাথা হেলিয়ে বলল,

"মুকুন্দদা আজকের কাগজে দেখেছেন? চার-চারটে থ্রম্বসিস-ডেথ ফ্রন্ট পেজেই। সবাই অ্যাবাভ ফিফ্‌টি।"

"আমার ফিফটি-ওয়ান।" মুকুন্দ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল টেবলের ফাটল থেকে উঠে আসা ছারপোকাটার দিকে এবং সেটা একটা ফাইলের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবার পর আবার বলল, "আমার একাম্ন শুরু হয়েছে।"

"এবার সাবধান হোন। স্নেহজাতীয় জিনিস খাওয়া কমান আর লাইট ধরনের কিছু ব্যায়াম করুন।"

অজিত ধরের স্বাস্থ্যটি চমৎকার। বছর পনের আগে ওয়েটলিফটিং-এ স্টেট চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ফেদার ওয়েটে। বিয়ে করেনি। এখন তবলা শিখছে। মুকুন্দ ড্রয়ার থেকে দোয়াত বার করে কলমের ক্যাপ খুলতে খুলতে বলল, "তোমার এসব হবে না।"

"কি করে জানলেন?"

"যারা হ্যাপি, যাদের উদ্বেগ নেই তাদের হয় না। থ্রম্বসিসে কটা মেয়েমানুষ মরেছে?"

"কিন্তু আমি মেয়েমানুষ নই।" অজিত ধর গম্ভীর হয়ে নিজের টেবলে মুখ ফেরাল। মুকুন্দর মনে পড়ল, জয়ার শ্বশুরকে পাঁচদিন পর মর্গে পাওয়া যায়, পচন ধরে বীভৎস দেখাচ্ছিল, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বেরিয়ে এসেই জয়ার ভাসুর বমি করে ফেলে। আইডেন্টিফাই করার মত কোনকিছু সঙ্গে থাকলে ভদ্রলোক তার ছেলেকে বমি করাত না।

এবার মুকুন্দ, কৌতূহলবশতই ভাবল, বাসে আজ যদি থ্রম্বসিসে মারা যেতাম, তাহলে আমার লাশটার কি হত। বাসটা থেমে যাবে। কেউ বলবে হাসপাতালে, কেউ বলবে থানায় বাসটাকে নিয়ে চল। তারমধ্যে সেই লোকটা—যে বলেছিল, 'পাগল, করতে গিয়ে কে প্রাণ খোয়াবে,—বলবে "একদমই যখম মরে-গেছে তখন আমাদের অফিস লেট করিয়ে লাভ কি, বরং এখানেই নামিয়ে দিন, পাবলিক

কিংবা পুলিস ব্যবস্থা করে দেবে।" শুনে মনে মনে সবাই হাঁফ ছাড়বে, তবে দু-একজন আপত্তি জানিয়ে বলবে, "রাস্তায় নামিয়ে দেওয়াটা খুবই নিষ্ঠুর দেখাবে,—বরং বাসের একটা সীটে বসে থাকুক। সবাই অফিসে নেমে গেলে তারপর থানায় বা হাসপাতালে পৌঁছে দিলেই হবে।" এই কথার পর তর্ক বেধে যাবে। তখন ড্রাইভার বিরক্ত হয়ে বাসটা চালিয়ে দেবে। সবাই ড্রাইভারকে তখন উল্লুক বলবে।

মুকুন্দর মজা লাগছিল এইরকম ভাবতে। কিন্তু সত্যিই যদি থ্রম্বসিসে মারা যেতুম? এই অজিত ধর কি লিফটে উঠতে উঠতে কাউকে বলবে—"না মশাই, শরীর আমার ফিট আছে। বারো বছরের কলীগ মুকুন্দ সেন আজ পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ। যা দিনকাল, মার্ডার-টার্ডার হল কিনা কে জানে। লোকটা অবশ্য একদিক থেকে ভালই ছিল, পলিটিক্স করত না, তবে মদটদ খেত শুনেছি।"

আড়চোখে মুকুন্দ তাকল অজিত ধরের দিকে। শরীর দুর্বল হয়ে যাবে বলে বিয়ে করেনি। শরীর গরম হতে পারে বলে ফুটবল খেলা পর্যন্ত দেখে না। আড়াইটে বাজলেই ড্রয়ার থেকে একটা আপেল বার করে খায়। ওর থ্রম্বসিস হবে না। ওর ছেলে থাকত যদি, সে বমি করার সুযোগ পাবে না। পকেট হাতড়ে মুকুন্দ কয়েকটা নোট, খুচরো পয়সা আর এলাচের মোড়ক বার করল। এর কোনটা দিয়েই তাকে আইডেন্টিফাই করা যাবে না। মোড়কটা জনৈক ভোলানাথ গুঁইয়ের লণ্ড্রী বিল। সেটা কুচিয়ে ফেলে মুকুন্দ নিজের নামঠিকানা ইংরাজীতে একটা কাগজে লিখে, বুকপকেটে রেখে স্বস্তি বোধ করল।

অফিস থেকে বেরিয়ে মুকুন্দ শুনল, উত্তর কলকাতায় ট্রাম পুড়েছে তাই ট্রাম বন্ধ। বাস স্টপে গিয়ে দেখল শিশির নামে লীভ সেকশ্যানের নতুন ছেলেটি দাঁড়িয়ে। বছর পঁচিশ বয়স, ফার্স্ট ডিভিশনে ফুটবল খেলে। অফিস টীমে খেলবে বলেই চাকরি পেয়েছে। আঁটসাট

প্যাণ্ট, নাভির নীচে বেল্ট, উঁচু গোড়ালির ছুঁচলো জুতো আর ছিপছিপে শরীর। অফিসের মেয়েরা যে ওর দিকে তাকায় এটা ও জানে। কিন্তু শিশির এখন ধুতি-পাঞ্জাবী-চটি পরে দাঁড়িয়ে।

"ব্যাপার কি? এই বেশে তোমায় ঠিক মানাচ্ছে না ভাই, কেমন যেন বয়স্ক-বয়স্ক লাগছে।"

শিশিরকে মুহূর্তের জন্য অপ্রতিভ দেখাল। একটি সুঠাম মেয়ে শ্যামবাজারের বাসে ওঠার জন্য মরিয়া হয়ে ধাক্কা দিতে দিয়ে এগোল এবং হ্যাণ্ডেল ধরে পা রাখামাত্র বাস ছেড়ে ছিল। পা-দানির একটি যুবক তৎক্ষণাৎ মেয়েটির পিঠে বাহুর বেড় দিল। শিশির বাসটার থেকে চোখ সরিয়ে তিক্তস্বরে বলল, "এখন সবথেকে সেফ বুড়ো হয়ে যাওয়া। আমার পাশের বাড়ির ছেলেটাকে মাসখানেক আগে পুলিস রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এমন মেরেছে যে হাঁটুদুটো এখনো ভাল করে মুড়তে পারে না। আমি জানি ছেলেটা কোন গোলমালে নেই। ডাঁটো চেহারার জন্য ওর সর্বনাশ হল।"

মুকুন্দ চিন্তিত স্বরে বলল, "আমার ছেলেও গোলমালে থাকে না, কিন্তু কার সঙ্গে মিশছে তাতো জানি না।"

শিশির আলতোকরে চুলে হাত বুলিয়ে বলল, "আমার ভাই কাল বাড়িতে বোমা এনে লুকিয়ে রেখেছিল। জানেন মুকুন্দদা, আমরা খুব গরীব। খেলার জন্যই এই চাকরি। পঙ্গু হয়ে যাই যদি আমায় রাখবে কেন, এখনো তো কনফার্মড হইনি। এই শরীরটাই আমার সব।"

মুকুন্দকে আর কিছু বলতে না দিয়ে শিশির প্রায় ছুটেই রাস্তা পার হয়ে ভিড়ে মিশে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে মুকুন্দও হাঁটতে শুরু করল। আধঘণ্টা হাঁটার পর তার মনে হল রাস্তা ক্রমশ ফাঁকা দেখাচ্ছে, পথচারী কম, গাড়িগুলি জোরে যাচ্ছে, সি আর পি ভর্তি লরী তিন-চারবার চোখে পড়ল, ক্ষীণ বিস্ফোরণের শব্দও শুনতে পেল। মুকুন্দ স্থির করল, গলি ধরে যাওয়াই ভাল।

মিনিট কয়েক পরেই মুকুন্দর গা ছমছম করতে লাগল। যতই এগোয়, সব কিছু ভূতে পাওয়ার মত ঠেকছে। বাড়িগুলোর দরজা-জানলা বন্ধ। চাপা ফিসফাস শোনা যাচ্ছে। অন্ধকার ছাদে আবছা মুখের সারি। দূরে দূরে রাস্তার আলো, মাঝেরটা জ্বলছে না। দুধারের শ্যাওলাধরা, পলেস্তারা খসা, বিবর্ণ দেয়ালগুলোর মধ্যে গর্ত, ঢিপি আর আস্তাকুড়ভরা রাস্তাটাকে প্রাচীন সুড়ঙ্গের মত দেখাচ্ছে। নিজের পায়ের শব্দে মুকুন্দ এবার ভয় পেল।

আর একটু এগিয়ে, ডানদিকের গলিটা দিয়ে তিন-চার মিনিটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছন যায়। তবু মুকুন্দ আর এগোতে সাহস পেল না। পাশের সরু গলির মধ্যে ঢুকে বড় রাস্তার দিকে কিছুটা এগিয়েই, আচমকা একটা রাইফেল ও দুটো পিস্তলের মুখোমুখি হয়ে দু হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কোথায় যাচ্ছেন ?" সাদা প্যাণ্ট, হলুদ বুশশার্ট পরা লোকটি মুকুন্দর পেটে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করল।

"বাড়ি যাচ্ছি স্যার, পাশের বঙ্কু সরকার লেনে থাকি।"

"তাহলে এখানে কেন ?"

"অফিস থেকে ফিরছি। গোলমাল দেখে গলি দিয়ে যাচ্ছিলুম।"

"পাড়ায় কারা কারা বোমা ছোঁড়ে ?"

"জানি না, স্যার।"

"নাকি বলবেন না ?"

"সত্যি আমি জানি না।"

ইউনিফর্ম পরা ভারিক্কি ধরনের যে লোকটি এতক্ষণ শুধুই মুকুন্দর দিকে তাকিয়েছিল, বলল, "নিয়ে গিয়ে দেখাও তো, আইডেন্টিফাই করতে পারে কিনা।"

মুকুন্দর কোমরে পিস্তলের খোঁচা দিয়ে হলুদ বুশশার্ট বলল, "বাঁয়ে", সে তখুনি বাঁদিকে ফিরে, দুহাত তুলে, চলতে শুরু করল। রাস্তার যেখানটায় আলো কম এবং দুটো বাড়ির দেয়াল 'দ'-এর মত

হয়ে একটা কোণ তৈরী করেছে সেখানে টর্চের আলো ফেলে লোকটি বলল, "ওকে চেনেন ?"

মুকুন্দ দেখল একটা দেহ উপুড় হয়ে পড়ে, মুখটা পাশে ফেরান। দুহাত তোলা অবস্থায় এগিয়ে এসে ঝুঁকে "মন্নু" বলে অস্ফুটে কাতরে উঠেই বুঝল, দেখতে অনেকটা মন্নুর মতই। চোখের পাতা খোলা, নীল জামাটা কালো হয়ে পিঠ উন্মুক্ত, কঠিনভাবে আঙুলগুলো মুঠো করা, ঠোঁট দুটো চেপে রয়েছে, গলায় গভীর ক্ষত। হিঁচড়ে টেনে আনার দাগ প্যান্টে। গলা থেকে চোঁয়ান রক্ত থকথকে হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

"এর নাম মন্নু ?"

"না, না, আমার ছেলের নাম মন্নু। একে অনেকটা তার মত দেখতে। একে আমি একদম চিনি না স্যার।"

"কখনো একে দেখেননি ? ভাল করে দেখে বলুন।"

মুকুন্দ আবার ঝুঁকে পড়ল। গোড়ালি থেকে মাথার প্রান্ত জমাট বাঁধা আগ্নেয়গিরি লাভার একটি ঢেউ খেলানো খণ্ডের মত। এই খণ্ডটাই উত্তপ্তকালে ওর সর্বস্ব ছিল। ওর যন্ত্রণা, বিস্ময় আর দাপট। খোলা চোখ থেকে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নির্গত হচ্ছে না।

মাথা নেড়ে মুকুন্দ বলল, "না, একে কখনো দেখিনি।"

"আচ্ছা চলে যান, এধার-ওধার করবেন না।"

কিছুদূর গিয়ে মুকুন্দ ফিরে তাকাল। বুশশার্ট তাকে লক্ষ্য করছে। লাসটা এখন অন্ধকারে। মুকুন্দ মনে মনে বলল, আর একটা আনআইডেন্টিফায়েড ডেড বডি। তারপর বুকপকেটে হাত দিয়ে স্বস্তিবোধ করল। এবার গলিটা, আর একটা গলিকে কেটে সোজা মুকুন্দর পাড়ায় ঢুকে গেছে। মোড়টা আধো অন্ধকার। দুটি ছেলে হঠাৎ দেয়াল ফুঁড়েই যেন তার সামনে এসে দাঁড়াল। একজনের হাতে ফুট দুয়েক লম্বা ঝকঝকে ইস্পাত।

"কি জিজ্ঞেস করছিল ?"

মুকুন্দ চিনতে পারল ছেলেটিকে। মনুর বন্ধু ছিল ছোটবেলায়। তখন বাড়িতে আসত, নাম তাজু। না থেমে গঙ্গা পারাপার করে বলে সে শুনেছে। এখন পাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানেই প্রায় সময় কাটায়। মনু এখন আর মেশে না।

"কিছুই না। শুধু জানতে চাইল লাশটাকে চিনি কিনা।"

"আমাদের কারুর কথা জিজ্ঞেস করল ?"

"না।"

"খবরদার, বলবেন না কিছু।"

ওরা দুজন আবার দেয়ালে সেঁধিয়ে গেল। দুটি স্ত্রীলোককে নিয়ে একটি রিক্সা আসছে। একজনকে বিরক্তস্বরে মুকুন্দ বলতে শুনল, "ওম্মা, এইতো যাবার সময় দেখে গেলুম সব ঠাণ্ডা।"

জানালায় শিপ্রা দাঁড়িয়েছিল। মুকুন্দকে দেখেই আলো জ্বেলে দরজা খুলে বলল, "যা ভাবনা হচ্ছিল।"

"আমার জন্য ?"

"তবে নাতো কি।"

শুনে মুকুন্দর ভাল লাগল প্রথমে। তারপর ভাবল, গৌরাঙ্গর জন্য একদম নাভাবাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তাই বলল, "গৌরাঙ্গ আছে কেমন ?"

"একই রকম।" শিপ্রা সাধারণভাবে বলল এবং সহসা গলা নামিয়ে যোগ করল, "মনু কেমন-কেমন করে আজ তাকাচ্ছিল। কাউকে বলে দেবে না তো ? আমার বড্ড ভয় করছে।"

"বড় হয়েছে। মনে হয় না বলবে।"

মুকুন্দ তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এল। ঘরের জানলাগুলি বন্ধ। মীরা ও লীলাবতী সিঁটিয়ে বসে রয়েছে। তাকে দেখে ওরা হাঁফ ছাড়ল। মীরা বলল, "জানো কী কাণ্ড হয়েছে ! একটা ছেলের গলা কেটে ফেলে রেখে গেছে খুদিরাম বসাক স্ট্রীটে।" মনু পাশের

ঘর থেকে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "গোলমালের সময় অতুল বোস লেন দিয়ে না ঢুকে শেতলাতলার গলিটা দিয়ে আসাই সেফ্।"

ওর কথা শুনতে শুনতে মুকুন্দর মনে হল, মনু এতক্ষণ উদ্বেগের মধ্যে ছিল। ছেলেটা আমার জন্য ভাবে, হয়ত বমি করবে না।

পরদিন অফিসে বেলা বারোটা নাগাদ মুকুন্দকে একজন টেলিফোনে উত্তেজিত স্বরে বলল, "আপনার ছেলে মানবেন্দ্র সেনকে পুলিশ রাস্তা থেকে অ্যারেষ্ট করে নিয়ে গেছে।"

"কি বলছেন! মনুকে?" মুকুন্দ চীৎকার করে উঠল। "আপনি কি করে জানলেন?"

"আমার ভাইকেও ধরেছে। থানায় গেছলুম্। আমাকে নাম আর ফোন নম্বর দিয়ে আপনার ছেলে বলল, জানিয়ে দিতে। এখুনি থানায় গিয়ে চেষ্টা করুন, ছাড়াতে পারেন কিনা।"

ফোন রেখে দেওয়ার শব্দ পেল মুকুন্দ। তারপরই ওর চোখ-কান দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকতে লাগল। কিছুক্ষণ সে কিছুই দেখতে পেল না, শুনতে পেল না। তারপর কাতরস্বরে অজিত ধরকে বলল, "এইমাত্র একজন খবর দিল, ছেলেটাকে পুলিসে ধরেছে, রাস্তা থেকে। কিন্তু মনু তো ওসব করে না, অত্যন্ত ভাল ছেলে। এখন কি করি বলো তো?"

"দেরি করবেন না, এখুনি থানায় গিয়ে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করুন। কেস লিখিয়ে ফেললে আর উপায় নেই, চালান করে দেবে। শুনেছি প্রচণ্ড মার দিচ্ছে থানায়।"

"তোমার কেউ চেনাশুনো থানায় আছে? অন্তত যাকে বললে, মারধোরটা করবে না। মনুর ভীষণ দুর্বল শরীর।"

অজিত ধর মাথা নাড়ল।

"তুমি যাবে আমার সঙ্গে, থানায়?"

"সাড়ে তিনশো লোকের স্যালারি স্টেটমেণ্ট তৈরী করছি, মুকুন্দদা। চারদিন পরই মাইনে। এখনতো ফেলে রেখে—"

মুকুন্দ পাঁচতলা থেকে নামল সিঁড়ি দিয়ে। ট্যাক্সিতে বারদুয়েক বলল, "একটু জোরে চালান ভাই।" থানায় আট-দশটি ছেলের সঙ্গে মনুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও-সিকে বলল, "আমার ছেলে কোনকিছুর মধ্যে থাকে না স্যার, ওকে ভুল করে এনেছেন।"

"কোনটি আপনার ছেলে?" গম্ভীর এবং যেন ক্লান্ত, এমন স্বরে ও-সি বলল, মুকুন্দ আঙ্গুল তুলে দেখাবার সময় মনুর পাশে দাঁড়ান হাফ প্যাণ্ট পরা ছেলেটিকে কনুই তুলে খুব মন দিয়ে বাহুর থ্যাঁতলান জায়গাটা পরীক্ষা করতে দেখল। মনুর দিকে তাকিয়ে ও-সি বলল, "সব বাপ-মা এসেই বলে, তাদের ছেলে নিরপরাধ। যদি নিরপরাধ হয় তাহলে ছাড়া পাবে। আগে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখি।"

"কখন ছাড়বেন তাহলে?"

ও-সি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মনু হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে বলল, "আমি কিছু করিনি স্যার আমি কিছু জানি না। বিশ্বাস করুন, আমি শুধু কলেজে যাচ্ছিলুম। খাতা ছাড়া হাতে আর কিছু ছিল না।"

"চুপ করো।" কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল ও-সি'র পাশে দাঁড়ান ধুতিপরা লোকটি। থতমত হয়ে মনু তাকাল মুকুন্দের দিকে। দুটি ছেলে পাংশুমুখে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল। লোকটি ধমকে আবার বলল, "তাজু তোমার পাড়ার ছেলে আর তাকে তুমি চেন না?"

মুকুন্দ ব্যস্ত হয়ে বলল, "আমার ছেলে ওর সঙ্গে মেশে না স্যার।"

"বাজে কথা। আমাদের কাছে খবর আছে আপনার ছেলে ওর বন্ধু। তাজুকে কোথায় পাওয়া যাবে, দলে আর কে কে আছে, বলুক, আপনার ছেলেকে ছেড়ে দোব।"

মুকুন্দ দেখল মন্নু ঠক ঠক করে কাঁপছে। ওকে এত ভয় পেতে দেখে সেও কাতর হয়ে পড়ল। চোখের জল মন্নুর ঠোঁটের কোল ঘুরে চোয়াল পৌঁছে টলটল করছে। মুকুন্দের চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। আবছাভাবে গৌরাঙ্গর মুখটা ফুটে উঠল তার মনে। কাল সকালে এইরকম একটা বিন্দু টলটল করছিল ওর থুতনির কাছে। মেয়েটা তখন চুলধরে টানছিল। কিন্তু মন্নুর তো ক্যানসার হয়নি। মুকুন্দ বিষণ্ণচোখে তাকিয়ে রইল মন্নুর দিকে। শুধু কি শরীরের জন্যই ওর এই কান্না। রাস্তায় কাল বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়েছিল যে ছেলেটি সেও কি শরীরটাকে ভালবাসতো না!

ও-সি ঘরের একধারে গিয়ে লোকটির সঙ্গে চাপাস্বরে মিনিট দুয়েক কথা বলে ফিরে এল। "আপনি এখন যান, সন্ধ্যের দিকে এসে খোঁজ নেবেন।"

"বিশ্বাস করুন স্যার, আমার ছেলে জীবনে কখনো পলিটিক্স করেনি। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন।" মুকুন্দ ঝুঁকে ও-সি'র হাঁটুতে হাত রাখল। হাতটা সরিয়ে দিতে ও-সি বলল, "আচ্ছা ঘণ্টা দু-তিন পরেই আসুন, নিরপরাধ হলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব।"

বেরিয়ে এসে মুকুন্দ ঠিক করতে পারল না এবার কি করবে। থানার সামনেই একটা বাড়ির রকে বসে পড়ল। এখন অফিসে ফেরা আর এখানে বসে থাকা একই ব্যাপার। লীলাবতীর কান্নাকাটির থেকেও ভাল, বসে থাকতে থাকতে সে অবসন্ন বোধ করতে শুরু করল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে তাকিয়ে রইল ফটকে। ক্লান্ত মস্তিষ্কে এলোপাথাড়ি নানান বীভৎস দৃশ্য এখন সে দেখতে পাচ্ছে, অদ্ভুত করুণ শব্দ শুনতে পাচ্ছে। প্রত্যেকটাই স্নায়ুবিদারক।

ছটফট করে মুকুন্দ উঠে পড়ল। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বারবার সে শিপ্রার দেহে, নানাবিধ অশ্লীল শব্দে এবং প্রম্বসিসে নিজেকে আবদ্ধ করে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করল। কিন্তু সফল হল না। সবকিছু ছাপিয়ে মন্নুর হঠাৎ কান্নাটা তাকে পেয়ে বসছে। ঘণ্টাখানেক

পর সে আবার থানার সামনে ফিরে এল এবং রকে বসতে গিয়ে দেখল মনু মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসছে।

"মনু।" ছোট্ট, তীক্ষ্ণস্বরে মুকুন্দ ডাকল। মনু মুখ তুলে তাকাল। মুকুন্দ ছুটে গিয়ে প্রথমেই তন্নতন্ন করে ওর আপাদ-মস্তক দেখল। তারপর হেসে বলল, "ছেড়ে দিল।"

মাথা নেড়ে মনু ফিকে হাসল।

"মারধোর করেনি?"

"হাতটা মুচড়ে দিয়েছিল ধরার সময়।"

ওর কাঁধে আলতো করে হাত রেখে, হাঁটতে হাঁটতে মুকুন্দ বলল, "অনেকক্ষণ খাস্‌নি, আয় এই দোকানটায়।"

"আমার খিদে নেই।"

"ধরল কেন তোকে?"

"যে ছেলেগুলোকে থানায় দেখলে, ওরা কোন্ একটা স্কুলে ভাঙ্গচোর করে বোমা ফাটিয়ে এসে আমার পাশ দিয়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ প্লেন ড্রেস পুলিস ঘিরে ধরে ওদের সঙ্গে আমাকেও ভ্যানে তুলল।"

"তুই যদি বুড়োমানুষ হতিস তাহলে ধরত না।"

মনু জবাব দিল না। মিনিটখানেক পর মুকুন্দ বলল, "অফিসে ফোন পেয়েই সোজা থানায় এসেছি। বাড়ির কেউ জানে না, তুই বাড়িতে এ সম্পর্কে কিছু বলিস না, তাহলেই তোর মা কান্না জুড়ে দেবে।"

ঘাড় ফিরিয়ে মনু তাকাল ওর দিকে। চোখদুটো দেখে মুকুন্দের বুকের মধ্যে ক্ষীণ একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে আবছাভাবে সে গৌরাঙ্গর চোখদুটি দেখতে পেল। ঠিক এই চাহনিতেই সে চিত হয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়েছিল। মুকুন্দের আবার মনে হল, মনুর কেন ক্যানসার হবে!

"তোকে আর কিছু কি জিজ্ঞাসা করেছে?"

চমকে উঠে মনু ভ্রু কুঁচকে অস্বাভাবিক স্বরে বলল, "কি জিজ্ঞাসা করবে ?"

"যা জানতে চাইছিল।"

"কিছু জিজ্ঞাসা করেনি।" মনু দাঁড়িয়ে পড়ল। "আমি এখন বাড়ি যাব না, তুমি কি বাড়ি যাবে ?"

"আমি মুকুন্দ দু'ধারে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "দেখি কোথাও গিয়ে সময় কাটাতে পারি কিনা।"

মনু ভিড়ে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মুকুন্দ তাকিয়ে রইল। তারপর স্থির করল, ও ক্লাস নাইনে ওঠার পর আর মাতাল হইনি, আজ হব।

রাত প্রায় বারোটায় মুকুন্দ বাড়ি ফিরল। কড়ানাড়ার আগেই সদরদরজা খুলে গেল। অন্ধকারে শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরার জন্য হাত বাড়াতেই চাপাস্বরে মনু বলল, "এখন এত রাত করে বাড়ি ফিরো না।"

মুকুন্দ অন্ধকারের মধ্যে মনুর মুখটা দুই করতলে একবার চেপে ধরে, কথা না বলে, দোতলায় উঠে গেল।

দেরিতে ঘুম ভাঙ্গল তার, চা খেতে খেতে মনুর খোঁজ করল। দুটি ছেলে তাকে ডেকে নিয়ে গেছে শুনেই চায়ের কাপ রেখে তাড়াতাড়ি মুকুন্দ রাস্তায় বেরিয়ে এসে মনুকে দেখতে পেল না। ভয়ে বুক শুকিয়ে এল তার, শিপ্রাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "কারা ডাকতে এসেছিল ?"

"একজনকে দেখেছি, রোগাপানা, ফর্সা, মনুরই বয়সী।"

"হাতে কিছু ছিল ?"

"কেন ?" ভীতস্বরে শিপ্রা বলল।

ধমকে উঠল মুকুন্দ, "যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও।"

"অতশত দেখিনি।"

মুকুন্দ এবার ছুটে রাস্তায় বেরোল, ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত পরিচিতদের

কাছে খোঁজ নিতে নিতে পৌঁছল। সেখান থেকে ছ্বতিনটে গলি ঘুরে, গলাকাটা লাসটা যেখানে পড়েছিল সেখানে হাজির হল। এইসময় তার বুকফাটা কান্না পেল। বাড়ি ফিরতেই শিপ্রা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "মন্টু তো অনেকক্ষণ ফিরেছে।"

একটা করে সিঁড়ি টপকে মুকুন্দ দোতলায় এল। মন্টু তার ঘরে চেয়ারে বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে। মুকুন্দ ঘরে ঢুকেই বলল, "কেন ওরা এসেছিল ?"

"কারা !" মন্টু স্থির চোখে মুকুন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চাহনিটা তুলে নিয়ে আবার জানালার বাইরে তাকাল।

"ওরা কি জেনেছে ?" ব্যাগ্র স্বরে মুকুন্দ বলল।

"কি জানবে ?" মন্টু এবার তীব্রচোখে তাকালো।

মুকুন্দ ফিসফিস করে বলল, "আমি জানি, আমি জানি।"

"কি জান তুমি ?"

"তোকে ভয় পেতে দেখেছিলুম।"

"কিসের ভয় ?"

"শরীরটার জন্য ভয়।"

"তুমি পাও না ?" প্রশ্নটি করার জন্যই যেন নিজের ওপর অভিমানে মন্টুর বসারভঙ্গি কঠিন হয়ে গেল।

"হ্যাঁ পাই।" মুকুন্দ কোমল কণ্ঠে বলল। "আমি তোকে দোষ দিচ্ছিনারে। যদি বলতে না চাস তো বলিস না। কিন্তু তুই আমার ছেলে, তোর জন্য আমি ভয় পাচ্ছি। সব বাবাই পায়। এটা কাপুরুষতা নয়।"

"তোমার ভয়টা ছেলের প্রাণের জন্য, তাই সেটা কাপুরুষতা নয়।" মন্টু যান্ত্রিকস্বরে যেন মুখস্ত বলল।

"এভাবে কথাটা নিচ্ছিস কেন।" মুকুন্দ বিব্রত হয়ে বলল। "আমাকে ঘেন্না করার নিশ্চয় অন্য কারণ আছে, কিন্তু এ জন্য করিসনি।"

"তুমি কি আমায় ঘেন্না করছ, আমি যা করেছি ?"

"মোটেই না। আমি চিরকাল তোকে ভালবাসব।"

"কিন্তু আমি নিজেকে ঘেন্না করছি। থানায় তুমি এমনকরে আমার দিকে তাকালে, মনে হল আমি একটা মরা মানুষ। কিরকম যেন ভয় করল আমার। নয়তো একটা কথাও বলতাম না, কিছুতেই না।" মনু উঠে দাঁড়াল। টেবলের বইগুলো অযথা ওলটপালট করতে করতে মোচড়ান স্বরে বলল, "তোমার জন্য তোমার জন্য। তুমি আমায় করাপ্ট করেছ।"

মনু একবার শুধু মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। মুকুন্দ তখন, প্রত্যাশামত নিশ্চিতরূপে দেখতে পেল, কঠিন বরফের মত ঝকঝকে ওর চোখদুটি। যেন শীতল ক্রোধে জমাট বেঁধে রয়েছে।

মুকুন্দর অফিসে যাবার সময় শিপ্রা দাঁড়িয়েছিল তার ঘরের দরজায়। সে হাসল। মুকুন্দ ভ্রুক্ষেপ করল না। গলির মোড়ে লাল ডোরাকাটা জামা গায়ে তাজু দাঁড়িয়ে। মুকুন্দ তাকাল না। বাস মাঝপথে বিকল হয়ে থেমে গেল। মুকুন্দ কণ্ডাক্টরের কাছ থেকে ভাড়ার পয়সা ফেরৎ নিল না। অজিত ধরের প্রশ্নের উত্তরে জানাল, "খবরটা ভুল। মনুকে ধরেনি।" ছুটির পর ট্রামে উঠল। ট্রাম থেকে নেমে মিনিট তিনেক হেঁটে বাড়ি। নামামাত্র দেখল জটলা করে লোকেরা ভীতচোখে তার পাড়ার দিকে তাকিয়ে বলাবলি করছে। একজন তাকে বলল, "ওদিকে যাবেন না মশাই। এইমাত্র পরপর চারটে গুলির শব্দ হল।" মুকুন্দ সে কথায় কান দিল না। একটা পুলিসের ভ্যান দাঁড়িয়ে। সেটাকে ঘুরে পার হয়েই থমকে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তারপর মাথা নামিয়ে গলিতে ঢুকল। তার পাশ দিয়ে দুটো লোক পিস্তল ও রাইফেল পরিবৃত একটা লাল ডোরাকাটা নিথরদেহ বহন করে নিয়ে গেল। টপটপ করে রক্ত ঝরছে। মুকুন্দ পিছন ফিরে তাকাল না। থমথমে গলির দুপাশের ভীত, বিস্মিত এবং অব্যক্ত চাহনি ও মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সে বাড়িতে ঢুকল।

মন্নু তার ঘরে খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে। মুকুন্দ দরজার কাছ থেকে বলল, "তাজুকে পুলিসে নিয়ে গেল। বোধ হয় বেঁচে নেই।"

লীলাবতী ও মীরা ছুটে এল বিবরণ শোনার জন্য। মুকুন্দ তখন কলঘরে ঢুকল। পিছনে পায়ের শব্দে সে ঘাড় ফেরাতেই দেখল মন্নু ঘর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে কলঘরের দিকেই আসছে। "কি হল!" বলে মুকুন্দ দ্রুত গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। মন্নু তখন হড়হড় করে মুকুন্দর গায়ে বমি করল।

মধ্য রাত্রে মুকুন্দ নীচে নেমে এসে শিপ্রার ঘরের দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে যেতেই ঘরে ঢুকে শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরল।

"একি, একি! ঘরের মধ্যে নয়। ও রয়েছে যে!"

"থাকুক্‌গে।" শিপ্রাকে মেঝেতে শোয়াতে শোয়াতে মুকুন্দ বলল। "ওতো মরে যাচ্ছেই। তাহলে আবার ভয় কিসের।"

দিনকাল

....

রমাপদ চৌধুরী

আমাদের বড় মেয়েকে নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। সে একটু ঠাণ্ডা প্রকৃতির, ছেলেবেলা থেকেই একটু বেশী লাজুক, এবং আমাদের দু'জনেই খুব বাধ্য ছিল। তার বি এস-সি পরীক্ষার ফল বের হওয়ার আগেই হঠাৎ একটি ভাল যোগাযোগ হয়ে গেল, অরুণা বললে "ছেলেটি চমৎকার, তার বাড়ির পরিবেশটিও আমার পছন্দ হয়েছিল," আমি অরুণার সামনেই একদিন রুবিকে ডেকে জিগ্যেস করলাম, "এ বিয়েতে তোর মত আছে তো রুবি?" রুবি বিষম লজ্জিত মুখ করে আমার সামনে থেকে পালিয়ে গেল। পরে অরুণার কাছে শুনলাম সে নাকি বলেছে, "আমার আবার মত কি, মেয়ের কিসে ভাল বাবা-মা ছাড়া আর কেউ বোঝে নাকি!" শুনে আমার সত্যি খুব ভাল লেগেছিল। সৌভাগ্য আমাদের, ওরা সুখী হয়েছে।

আমার একমাত্র ছেলে অন্তুর বয়েস এখন একুশ। অন্তুর ভাল নাম নিরুপম। ও যখন স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকলো তখন ওকে দেখে নিতান্তই বালক মনে হতো। অন্তু কখনো কখনো আমাদের লুকিয়ে চুল কাটার সেলুনে দাড়ি কামিয়ে আসতো, আমরা বুঝতে পারতাম, এবং ওর এই বড় হওয়ার চেষ্টা দেখে আমি ও অরুণা চোখাচোখি ভাবে নিঃশব্দে হাসতাম। ঐ বয়েস তো একদিন আমারও ছিল, তখন কি

করে যে নিজেকে পূর্ণবয়স্ক যুবক ভাবতাম জানি না। আমার যতদূর মনে পড়ে প্রায় ঐ বয়সেই আমি প্রথম প্রেমে পড়ি। এবং সেটাই আমার জীবনের প্রথম ও শেষ প্রেম। সে-সব দিনের কথা অরুণা কিছুই জানে না, জানলেও ও খুব একটা বিচলিত হতো বলে মনে হয় না। তবু আমার সেই কলেজ-জীবনের পরিচ্ছন্ন প্রেমটুকুকে বিশুদ্ধ রাখার জন্যেই অরুণার কাছে তার কোন আভাস কোনদিনই দিইনি। এমন কি আমার কখনো কখনো মনে হয়েছে সেই পরম বঞ্চনা ও চরম আঘাতের কথা কাউকে বলতে গেলে এই বাহান্ন বছর বয়সেও হয়তো আমার চোখের পাতা ভিজে যেতে পারে।

অন্তকে নিয়ে সে-জন্যেই আমার দুর্ভাবনার শেষ ছিল না। যৌবনের সেই হঠকারিতার পর থেকে প্রেম আমার কাছে একটি বিভীষিকা। তিরিশ-বত্রিশ বছর কেটে গেছে, সমস্ত স্মৃতি এখন ঝাপসা, কিন্তু প্রেমের মধ্যে, বিশেষ করে ব্যর্থপ্রেমের মধ্যে কি অসহনীয় কষ্ট, কি দুরন্ত জ্বালা, তা আমার আজও মনে আছে। আছে বলেই অন্তকে নিয়ে আমার এত ভাবনা।

রুবি অন্তর চেয়ে দু' বছরের বড়। তার ফলে রুবির সঙ্গে কলেজে যে মেয়েরা পড়তো তাদের দু'একজন আমাদের বাড়ি আসতো। তারা কিন্তু কেউই অন্তকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতো না। আমাদের কাছে অবশ্য সেটুকুই ছিল সান্ত্বনা। আমি হাসতে হাসতে অরুণাকে একদিন বলেছিলাম, "ভাগ্যিস রুবি ওর ছোট বোন নয়!" শুনে অরুণা অবাক হয়ে হেসে ফেলেছিল।—"কি যে বলো, প্রেম কি অত সস্তা নাকি!"

আমি বলতে পারতাম না যে প্রেম খুব সুলভ নয় বলেই আমার এত ভয়।

আসলে অন্তকে আমরা দুজনেই যে খুব ভালবাসি, দুজনেই যে তার জন্যে খুব গর্বিত, এটাই শেষ কথা নয়। আমরা তাকে রুবির মতই সুখী দেখতে চেয়েছিলাম। এবং প্রেম সম্পর্কে আমার নিজের

আতঙ্ক আমি নিশ্চয়ই অন্তর ওপর চাপিয়ে দিতে চাইনি। আমি মনে মনে এমন একটা উদার চিন্তাকেও লালন করেছি যে অন্ত যদি কোন মেয়েকে ভালবাসে, তাকে বিয়ে করতে চায়, তা হলে আমি সম্মতি দেবো তো নিশ্চয়ই, এমন কি অরুণার মনে কোন দ্বিধা থাকলেও আমি তা দূর করে দেবো। প্রকৃতপক্ষে প্রেমে আমার কোন ভয় ছিল না, ভয় ছিল ব্যর্থপ্রেমে।

আমার সমবয়স্ক সহকর্মীদের কয়েক-জনকে আমার রীতিমত বৃদ্ধ মনে হতো। অথচ আমি নিজে কিছুতেই আমার নিজের বয়েসকে অনুভব করতে পারতাম না। সে জন্য সমবয়স্কদের সঙ্গে আমার তেমন মেলামেশা ছিল না। তাদের আলোচনায় আমি কোন আকর্ষণ বোধ করতাম না, তাদের সুখ-দুঃখ আমাকে স্পর্শ করতো না। কারণ চিন্তাভাবনা বা মানসিকতায় আমি এখনো যুবক। বাহান্ন বছরের যুবক। চাকরি থেকে অবসর নিতে আর ক'বছর বাকী আছে সে হিসেব একদিন অন্যের মুখে শুনে আমি বিষণ্ণ বোধ করেছিলাম। তবে আমার সেই সহকর্মীর মত বিব্রত বোধ করি নি। কারণ লেখাপড়ায় অন্ত খুব উজ্জ্বল না হলেও তার পরীক্ষার ফল কখনো তার বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানিকে আমার চোখে নিষ্প্রভ করে দেয়নি। অন্ত চিরকালই অত্যন্ত উৎফুল্ল চরিত্রের ছেলে। এবং অত্যন্ত কোমল স্বভাবের। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিব্রত হবার কারণ ছিল না।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অন্ত স্বাভাবিক ব্যবহার করতো। সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে কখনো কখনো সে রাস্তায় যখন কথা বলত বা কোন বিষয় নিয়ে হাসাহাসি করতো তখন তার মধ্যে কোন জড়তা থাকতো না। অল্পবয়স থেকেই সেই মেয়ে কটির সঙ্গে সে বড় হয়েছে, রাস্তায় ক্রিকেট খেলেছে, একদল হয়ে সরস্বতী পুজো করেছে। সুতরাং তাদের মধ্যে কারো সম্পর্কে অন্তর কোন দুর্বলতা আছে কিনা আমি অকারণেই কখনো কখনো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। কখনো মনে হয়েছে তেমন কোন সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারলে

আমি খুশীই হবো, অরুণার সঙ্গে ভাগাভাগি করে সেই মজাটুকু উপভোগ করবো।

অন্তু যেবার পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে ভর্তি হলো সেই বছর আমি প্রথম নিজেকে একটু বয়স্ক মনে করতে পারলাম। রুবির বিয়ের সময় এই অনুভূতিটা আসেনি, বরং মনে হয়েছিল রুবির বিয়েটা আমাকে জোর করে বয়স্কদের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। কিন্তু ছেলে বড়ো হলে নিজেরই বুড়ো হতে ইচ্ছে করে।

একবার অরুণার সঙ্গে পুজোর বাজার করতে বেরিয়েছিলাম, সঙ্গে অন্তু কিছুতেই যেতে চায় নি, তবু অরুণা তাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল একালের জামাইদের পছন্দ জানতে এবং রুবির জন্য শাড়ি বাছার কাজে সাহায্য পাবে বলে। সেখানে ভিড়ের মধ্যে লাজুক ভাবে ও যে দুটি মেয়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখেছিল আমি সে-দুটি মেয়েকে লক্ষ্য করেছিলাম। এবং অন্তুর রুচি ও পছন্দ দেখে খুশী হয়েছিলাম।

তাই প্রথম যেদিন ওর কাছে একটি টেলিফোন এলো, আমি ভয় পাই নি। ভীষণ মজা পেয়েছিলাম।

টেলিফোন তুলে 'হ্যালো' বলতেই একটি মধুর মেয়েলি কণ্ঠ জিগ্যেস করলো, "নিরুপম আছে?"

আমি বললাম, "না, সে একটু বাইরে গেছে, এক্ষুনি ফিরবে।"

আমি প্রথমটা বেশ আশ্চর্য হয়েছিলাম। আমাদের সময়ে কোন মেয়ে এভাবে টেলিফোন করেনি। মেয়েদের গলা শোনার জন্যে অন্যের বাড়ি থেকে আমরা তিনটি বন্ধু একবার টেলিফোন একসচেঞ্জে সময় জানতে চেয়ে ফোন করেছিলাম, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অপারেটর মিষ্টি গলায় জবাব দিয়েছিল এটুকুই মনে আছে। সেকালে অটোমেটিক টেলিফোন ছিল না, অপারেটর বেশির ভাগই ছিল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

যে মেয়েটি নিরুপমের খোঁজ করছিল তার নাম জিজ্ঞেস করতে আমার সঙ্কোচ হলো, তাছাড়া আমি একটু বেশী বেশী নরম গলায় উত্তর দিলাম। কারণ আমি শুনেছিলাম আজকাল ঐ বয়সের ছেলেদের অনেক মেয়ে বন্ধু থাকে, আমি বিস্মিত হয়েছি বা অপছন্দ করেছি কোনক্রমে জানতে পারলে মেয়েটি নিশ্চয় কলেজে তা রাষ্ট্র করে নিরুপমকে লজ্জায় ফেলবে।

তাই আমি মেয়েটিকে জিগ্যেস করলাম, 'নিরুপম ফিরে এলে তাকে কি কিছু বলতে হবে?"

মেয়েটি এক নিমেষের জন্যে কি যেন ভাবলো, তারপর বললে, "না, আমিই আবার ফোন করবো।"

মেয়েটির নাম বললো না বলেই আমার মনে ঈষৎ খটকা লাগলো।

কিছুক্ষণ বাদেই নিরুপম এলো। আমি সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললাম, "তোর ফোন এসেছিল, এখনি আবার রিং করবে বলেছে।"

আমার মনে হলো নিরুপম একটু অস্বস্তি বোধ করলো।

মিনিট পনেরো বাদে টেলিফোন বেজে উঠল আবার। নিরুপম রিসিভার তুললো। আমি সে-ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলাম যাতে নিরুপম না মনে করে আমি তার দিকে কান পেতে আছি।

মেয়েটির এই ফোন করার ঘটনাটা আমার বাহান্ন বছরের মনে তোলপাড় আনলো, শুধু কৌতুকই নয়, রোমাঞ্চের স্পর্শও ছিল ঘটনাটিতে। আমি অরুণাকে এক সময়ে সে কথা বললাম, যদিও আমার মনে দ্বিধা এবং ভয় ছিল যে অরুণা হয়তো ঘটনাটিকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। অরুণা কিন্তু অবাক হয়ে সশব্দে হেসে উঠলো, হাসি থামলে ওর মুখের ওপর একটা মুগ্ধভাব ফুটে উঠলো। আমার মনে হলো ছেলের জন্য অরুণার কোন দুশ্চিন্তা নেই, ও যেন একটু গর্বই বোধ করছে। এবং ঠিক তখনই আমার নিজেরও মনে হলো আমিও একটু গর্বিত বোধ করছি।

মেয়েটি টেলিফোনে অন্তুকে কি বলেছিল আমার জানার কথা নয়। তার নাম হয়তো অন্তুকে জিগ্যেস করলেই জানতে পারতাম। কিন্তু আমি কিছুই জানতে চেষ্টা করি নি, যদিও আমার সে-বিষয়ে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। ফলে, কল্পনায় তিন চারটি একালের সুন্দর সুন্দর নাম নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করেছিলাম, এবং ভেবে নিয়েছিলাম মেয়েটি নিশ্চয়ই অন্তুর সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা করার কথা বলেছে। কারণ, আমার মনে আছে, তখন অন্তুর কলেজে পর পর তিনদিন ছুটি ছিল।

একটি মেয়ে আমার একুশ বছরের ছেলেকে বাড়িতে টেলিফোন করেছে—এই ছোট্ট ঘটনাটি আমার মনে এমনই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল যে আপিসের দু-একজন সহকর্মী বন্ধুকে না বলে পারি নি। তারা কেউ এ ঘটনার কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছে, কেউ একটি প্রেমোপাখ্যান শোনার মত মুখভাব করে তা উপভোগ করেছে এবং তাদের নিজেদের যৌবনকাল কিভাবে বঞ্চিত হয়েছে তা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। বলা অপ্রয়োজন যে আমিও সেই কপট দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সুর মিলিয়েছি।

এর পর অন্তুর কাছে আরো কয়েকবার আরো ঘন ঘন মেয়েলা গলার টেলিফোন এসেছে। সে-সব সময়ে কখনো আমি নিজেই রিসিভার তুলেছি, কখনো অরুণা। তখন আর আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা 'মজা' নয়, বরং কখনো কখনো মনে হয়েছে অন্তু আমাদের যেন উপেক্ষা করছে, কিংবা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করছে না। তা না হলে সে নিশ্চয় তার বান্ধবীদের বাড়িতে ফোন করতে নিষেধ করে দিতো। অন্তু যে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকদিন আগে থেকেই সিগারেট খাওয়া ধরেছে আমি জানতাম, তার পকেটে একখানা চিঠি পোস্ট করার জন্যে রাখতে গিয়ে দেশলাই দেখেছিলাম একদিন। আরেকবার ও বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পরই আমি ঢুকতে গিয়ে একরাশ ধোঁয়া এবং সিগারেটের গন্ধ পেয়েছিলাম। এই বয়সে সিগারেট খাওয়াকে

আমি খুব দোষের মনে করতাম না, কিন্তু সেজন্যে অন্তু আমার চোখের সামনে টেবিলে সিগারেটের প্যাকেট রাখলেও সহ্য করতে হবে এতখানি উদার আমি হতে পারি নি। ও অবশ্য তা করেও নি কোনদিন্ এবং সম্ভবত ঐ বয়সে পুরো প্যাকেট সিগারেট কেনায় ওরা অভ্যস্তও হয় না। আমি নিজে ঐ বয়সে খুচরো একটি সিগারেট কিনে দোকানের দড়িতে ধরিয়ে নিতাম। সে যাই হোক, ঘন ঘন টেলিফোন আসা আমার কাছে প্রায় চোখের সামনে সিগারেট ধরানোর সামিল মনে হতো।

প্রথম দিকে ব্যাপারটা উপভোগ করলেও অরুণার কাছেও এটা আর কৌতুক রইলো না। দেখতাম, অরুণাও বিরক্ত হতো, এবং আমি জানতাম বিরক্তিটা আসলে ওর রাগ। "জানি না" "নেই" বা "বলতে পারি না" গোছের উত্তর দিয়েও কোন কোনদিন রিসিভার নামিয়েও দিয়েছে।

আমি ঘরে বসে থাকলে অন্তু টেলিফোনে কাটা কাটা কথা বলতো, অস্পষ্ট ভাবে উত্তর দিতো, এবং আমার তা শুনে বেশ মজা লাগতো।

"—মেয়েটা কে রে ?" বেশ বিরক্তির সঙ্গেই একদিন অরুণা ওকে জিগ্যেস করেছিল। আমি তখন অন্তুর চোখের দিকে তাকাতে পারিনি।

কলেজের দু-একটি মেয়ের নাম অরুণার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, কারণ তাদের কথা অন্তু সেদিনই অরুণাকে হাসতে হাসতে বলেছিল। তাদের কথা বলার সময়ে অন্তু এমন ভাব করলো যেন তারা নিতান্তই নাবালিকা এবং নির্বোধ, বোকার মত কথা বলে এবং অন্তু যেন তাদের গ্রাহ্যই করে না।

অরুণা একদিন হাসতে হাসতে আমাকে বললো, "টুকটুক মেয়েটাই তো ওকে বেশী ফোন করে, জিগ্যেস করলাম কেমন দেখতে, অন্তু নাক সিঁটকে যা বর্ণনা দিলো, কোন ভয়ই নেই।"

টুকটুক নামটা আমি আগেও একদিন শুনেছিলাম। তার ভাল নাম যে ঋতা তাও অরুণা বলেছিল। আর আমি অবাক হয়ে ভেবেছিলাম, কলেজের মেয়েদের ডাক নামে পরিচিত হওয়া এ আবার কোন ধরনের আধুনিকতা। তাতে রুবি সেদিন এসেছিল, বললে, "তুমি বাবা এক্কেবারে সেকেলে। আমাদের সময়েও সব ছিল মিনি দত্ত, টুলি মিত্র, ফুচু সান্যাল।"

কিন্তু অন্তু টুকটুকের রূপের যে বর্ণনা দিক না কেন, একদিন আপিস থেকে ফিরতেই অরুণা চায়ের কাপ রেখে হাসতে হাসতে বললে, "ছেলের তোমার কাপালে অনেক দুঃখ আছে।"

আমি বিস্মিত হয়ে বললুম, "কেন।"

অরুণা হাসলো, বললে, "সেই টুকটুক! সে আজ এসেছিল।"

তারপর একটু থেমে বললে, "কি মিষ্টি চেহারা তুমি ভাবতে পারবে না, আর কি ভালো যে মেয়েটা! অন্তু কিনা ওকে দেখেও নাক সিঁটকোয়! ও ছেলের তা হ'লে কোন মেয়েই পছন্দ হবে না।"

আমি বললাম, "ছেলের বউ করার জন্যে তাকে বুঝি তোমার খুব পছন্দ হয়েছে?"

অরুণা হেসে ফেলে বললে, "তা বলছি না, কিন্তু সেদিন যে অন্তু বললে, টুকটুক দেখতে তেমন ভাল না! এর চেয়েও সুন্দর মেয়ে কি ওর কপালে জুটবে নাকি!"

আমার মনে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খটকা লাগলো। আমার মনে হলো টুকটুক সম্বন্ধে আমাদের যাতে কোন সন্দেহ না হয়, সেজন্যেই ঐ মিষ্টি চেহারার মেয়েটাকে অন্তু খাটো করে দেখবার চেষ্টা করেছে। টুকটুককে দেখার জন্যে আমার তখন খুবই আগ্রহ, আমি ফিরে আসার আগেই ওরা ছুটিতে চলে গেছে শুনে আমার খারাপ লাগলো। ভাবলাম, আরেকটু আগে কেন আসিনি।

এর দিনকয়েক পরেই দুপুরের দিকে আপিস থেকে বেরিয়েছি ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম জমা দিয়ে আসতে, হঠাৎ মেট্রোর নীচে

অন্তুকে দেখলাম, সঙ্গে রীতিমত সুশ্রী একটি মেয়ে। স্লিম চেহারা, এক মাথা শ্যাম্পু করা হাল্কা চুল। চোখ ছুটি....সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েটিকে এক নজরে দেখে নিয়েই আমি উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিলাম, পাছে অন্তু আমাকে দেখে ফেলে। অর্থাৎ লজ্জা যেন আমারই।

আমি অরুণাকে এসে ফিসফিস করে বর্ণনা দিলাম মেয়েটির আর অরুণা বললো, "বা রে, ঐ তো টুকটুক।"

টুকটুককে ভালো করে দেখার, কাছে বসে তার সঙ্গে কথা বলার আমার ভীষণ ইচ্ছে হতো। এবং আমার সবচেয়ে বড় কৌতূহল ছিল, তাকে দেখে বা তার সঙ্গে কথা বলে মেয়েটিকে যাচাই করে নেবার। আমার ধারণা ছিল, তার সঙ্গে কথা বলে আমি তার ভিতরের চরিত্রটি আবিষ্কার করতে পারবো এবং সেই সঙ্গে ধারণা করে নিতে পারবো সে সত্যিই অন্তুকে ভালবাসে কি না। কারণ, টুকটুক যথেষ্ট সুশ্রী বলেই আমার সেই পুরোনো ভয়টা মাঝে মাঝেই বুকের মধ্যে উঁকি দিতো। আমার কেবলই আশঙ্কা হত, শেষ অবধি অন্তু না সেই চরম আঘাতটা পেয়ে বসে।

পুত্রসন্তান যুবক হয়ে উঠলে বাহান্ন বছর বয়সের বাপকেই সব সময়ে তটস্থ থাকতে হয়। আমি মাঝে মাঝে আপিসছুটির পর সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে চৌরঙ্গীর ছু' একটি রেষ্টোরেণ্টে গিয়ে চা খেতে খেতে আড্ডা দিতাম, কোনদিন বা শ্রান্ত ক্লান্ত বোধ হলে তাদের সঙ্গে আউটরাম ঘাটের দিকে বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে বায়ু সেবনের জন্যে বেড়াতে যেতাম। অস্বীকার করবো না, বাহান্ন বছর বয়সেও আমার বুকের ভেতরটা যুবক রয়ে গেছে বলেই আমি ঐ সব সুদৃশ্য জায়গায় বেড়াতে গিয়ে কখনো সুদৃশ্য রমণীর দিকেও কয়েক পলক তাকিয়ে দেখেছি। কিন্তু ঐ সব স্থানগুলি প্রেমের তীর্থস্থান জানতাম বলেই আমার বেড়ানোর জায়গাও সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। কারণ, আমার তখন একটাই আতঙ্ক, কোথাও না ওদের ছুটিকে,

অর্থাৎ অন্তু ও টুকটুককে দেখে ফেলি। ওদের কোনদিন যদি লজ্জায় ফেলি, আমাকে দেখতে পেয়ে ওদের সুন্দর সন্ধ্যা যদি নষ্ট হয়, তাহলে আমার আর অনুশোচনার যেন শেষ থাকবে না।

এই সময়েই অন্তুদের কলেজে পুজোর ছুটি হ'লো। অরুণার কাছে শুনলাম, টুকটুক তার বাবা-মার সঙ্গে দিল্লী বেড়াতে যাচ্ছে। টুকটুক নিজেই নাকি তাকে বলে গেছে।

অরুণা বললে, ছেলেটা একেবারে অমানুষ আমার সামনেই টুকটুক বললে, "নিরুপম চিঠি দেবো উত্তর না দিলে দেখবে মজা, অন্তু কি বললে জানো? বললে, রিপ্লাই কার্ড দিও আর নয়ত এখনই খাম পোষ্টকার্ডের পয়সা দিয়ে যাও। সত্যি সত্যি ওর কাছ থেকে দুটো টাকা নিলো, আমার বকুনিতে কানই দিলো না।"

টুকটুক যে দিল্লী চলে গেছে তা কয়েক দিন পরেই টের পেলাম। কারণ, অন্তুর নামে যে চিঠিখানা এলো, তার ঠিকানা দেখেই বোঝা গেল সেটি কোন মেয়ের লেখা। আমি সে চিঠি নিজেই রেখে দিলাম, নিজেই অন্তুর হাতে তুলে দিলাম, অরুণাকে জানতেও দিলাম না। কারণ আমার ভয় ছিল, অরুণা সে চিঠি খুলে পড়তে পারে বা পড়ার পর ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারে। ফলে, ওদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি ঘটতে পারে। এবং মা বা বাবা সে-চিঠি পড়েছে বা নষ্ট করেছে জানতে পারলে অন্তু তখন নিশ্চয় আমাদের ঘৃণা করতে শুরু করবে।

কিছুদিন পরেই অরুণার কাছে শুনলাম টুকটুক ফিরে এসেছে। ফিরে এসেই সে নাকি অরুণাকে ফোন করেছিল। অরুণা বললে, "যাই বলো, টুকটুক আমাদের খুব ভালবাসে, চিঠি পায়নি ক'দিন অন্তুর কাছ থেকে, খুব ভাবনা হয়েছিল তার, বাড়ি ফিরেই ফোন করে জিগ্যেস করলো আমরা কেমন আছি।"

সত্যি সত্যিই টুকটুককে একদিন দেখলাম। দেখলাম মানে তাকে আমিই ডেকে আনলাম।

আমাদের ফ্লাটখানা তিনতলায়, সামনে একটুখানি ব্যালকনি আছে। সেদিন শরীরটা বিশেষ ভাল ছিল না, বছর শেষ হয়ে আসছে অথচ ক্যাজুয়েল লীভ পাওনা অনেক, ইচ্ছে করেই আপিস যাইনি। বিকেলে হঠাৎ শুনলাম, নীচে রাস্তা থেকে কোন একটি মেয়ে চীৎকার করে কাকে ডাকছে। দু'বার শোনার পরই মনে হলো মেয়েটি অন্তুকে ডাকছে। আমি ব্যালকনিতে বেরিয়ে দেখি নীচে রাস্তায় টুকটুক চিৎকার করে ডাকছে, অন্তু, অন্তু! ও তখন তিনতলার দিকে চোখ তুলে ডাকছিল, আমাকে দেখেই লজ্জা পেল। ও হয়ত সুট্ করে সরে পড়তো, মাথা নামিয়ে নিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে, তাই আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বললাম, "তুমি ওপরে এসো, এসো না!"

মেয়েটি সিঁড়ির দিকে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে মুখে হাসি আর লজ্জা ছড়িয়ে উঠে এলো, আমি তখন সিঁড়ির মাথায়।

আমি বললাম, "তুমি টুকটুক, না?"

টুকটুক ঘাড় কাৎ করলো। আর আমি বললাম, "অন্তু না থাকলে বুঝি আসা যায় না?"

অরুণাও ততক্ষণে এসে পড়েছে, হেসে বললে, "সে কথা বলো না, আমার সঙ্গে তো ও কতদিন এসে গল্প করে গেছে।"

আমি টুকটুককে সামনে বসিয়ে নানান গল্প শুরু করে দিলাম। আমি প্রায় তার সমবয়স্ক হবার চেষ্টা করলাম। হাসলাম এবং হাসালাম। আমি নিজেকে যথেষ্ট মডার্ন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলাম।

টুকটুক চলে যাবার পর আমি অরুণাকে বললাম, "যদি সত্যি সত্যি তেমন কিছু হয়, ভালই হয়, কি বলো?"

অরুণা মৃদু হেসে বললে, "মেয়েটা ভীষণ ভালো, তাই না?"

আমরা রাত্রে অন্ধকারে শুয়ে শুয়েও অন্তু এবং টুকটুককে নিয়ে কোন কোন দিন চাপা গলায় আলোচনা করেছি, আমাদের চোখকে

ফাঁকি দেবার যখনই ওরা চেষ্টা করেছে, আমরা হেসেছি। কখনো কখনো আমরা স্বপ্নও দেখেছি।

এরপর ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা কেমন সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। টুকটুক ফোন করলে আমি যদি রিসিভার তুলতাম তাহলে ও আগে আমার খবরাখবর নিতো, অরুণার, আর তারপর আমি নিজেই বলতাম "ধরো, অন্তকে ডেকে দিচ্ছি" কিংবা "অন্ত তো এখনো ফেরেনি, কলেজ যাওনি তুমি?" টুকটুক যখন বাড়িতে আসতো, আমি থাকলেও কখনো সটান অন্তর ঘরে চলে যেত, কখনো রান্নাঘরে অরুণার কাছে, আবার অন্তর ঘরে যাবার আগে এক মিনিট দাঁড়িয়ে কোন কোনদিন আমার সঙ্গে কথাও বলতো।

মাঝখানে হঠাৎ কি যে হয়েছিল আমি জানি না, বেশ কিছুদিন টুকটুক আসতোও না, ফোনও করতো না। সেই সময়ে আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। অরুণাকে জিগ্যেস করেছিলাম, "টুকটুকের কি খবর বলো তো?" অরুণা বললে, "ঝগড়া করেছে আবার কি। এত বলি, একদিন আসতে বলিস, কেবল এড়িয়ে যায়।"

শুনে আমার মনটা দমে গেল। বিশ্বাস হলো না। আমি মনে মনে ভয় পেলাম। আমি ভাবলাম, যে আতঙ্কটা আমার মনের মধ্যে বরাবর উঁকি দিয়েছে, সেটাই বোধহয় সত্যি হলো। আমার কেবল ইচ্ছে করতো, আগের মতই অন্তর ঘর থেকে ওদের দুজনের সশব্দ হাসি বা হট্টগোল বা তুচ্ছ ঝগড়াঝাটি ভেসে আসুক। একটা কাঠের বাজনা শুনেছিলাম ছেলেবেলায়, ওদের কথা-কাটাকাটি ঠিক তেমনি মিষ্টি লাগতো।

আমি সে-সময় অন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতাম। ও মাঝেমাঝেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেত, একটু খিটখিটেও হয়েছিল। খাবার টেবিলে বসে আমি লক্ষ্য করতাম, ওর ক্ষিদে ঠিক আগের মত নেই। আমি কি করবো ঠিক করতে পারতাম না, আমি

শুধু মনে মনে চাইতাম, ও যেন আঘাত না পায়, কষ্ট না পায়।

তখন গরম কাল, অন্তু বললো, "বাবা, চলো না এবার দার্জিলিং যাই।"

আমি ভাবলাম, কোলকাতা ওর কাছে এখন একটা যন্ত্রণা। ও এখান থেকে পালাতে চাইছে। পালাতে।

আমি অরুণাকে বললাম, "তাই চলো, অন্তু যখন বলছে...."

আমি অরুণাকে বললাম, "দোষ তোমারই। তুমি প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে বাড়িয়ে দিলে, অথচ শেষ রক্ষার কথা ভাবলে না।"

অন্তুর জন্যে আমার ভীষণ কষ্ট হতো অনেক রাত অবধি আমার ঘুম আসতো না। অরুণাও তার ব্যথা তার কষ্ট চেপে রেখেছিল, হঠাৎ একদিন রাত্রে কেঁদে ফেলে বললো, "আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না।" একটু থেমে হঠাৎ বললে, "আচ্ছা আমি যদি টুকটুকদের বাড়ি যাই?" আমি নিষেধ করলাম। "বললাম ওদের কাউকে তো আমরা চিনি না। কি জানি কি মনে করে বসবেন ওরা, তাছাড়া অন্তু জানলে রেগে যাবে, ওর হয়তো সম্মানে লাগবে।"

শেষ অবধি তাই দার্জিলিঙেই আমি গেলাম। ক্যাপিটল সিনেমার কাছেই হোটেল কুণ্ডুতে গিয়ে উঠলাম। সেদিনই বিকেলে বেড়াতে গেলাম ম্যালে।

আমরা কেউই দেখতে পাইনি, টুকটুক ছুটে এলো একমুখ হাসি নিয়ে। "অন্তু, তুমি? গ্রাণ্ড হয়েছে, কাকাবাবু আপনারাও এসেছেন।" বলে তার বাবা-মা ভাইবোনদের দিকে ফিরে তাকালো। আমাদের ডেকে নিয়ে গেল।

আলাপ হল সকলের সঙ্গে। বোঝা গেল অন্তুকে ওঁরা খুব ভাল করেই চেনেন, অন্তু ওঁদের বাড়ি অনেকবার গেছে।

টুকটুকের বাবা খুব সজ্জন, মা বেশ মিশুকে।

প্রতিদিন সকাল বিকেল আমাদের দেখা হতো, কখনো ম্যালে বেড়াতে এসে, কখনো দোকানে বাজারে, কখনো দল বেঁধেই আমরা এখানে-ওখানে যেতাম। কিন্তু অন্তু আর টুকটুক সব সময়ে আলাদা। হয় ওরা আমাদের সকলের পিছনে পিছিয়ে যেত, কিংবা তড়বড় করে অনেক আগে আগে চলে যেত। আবার এক একদিন ওরা দু'জনেই একেবারেই দলছাড়া হয়ে কোথায় যেত কে জানে।

আমি অরুণাকে বললাম, "যাক বাবা, ঝগড়া মিটে গেছে!"

অরুণা বললে, "ঝগড়া না ছাই।"

"—তার মানে?" আমি বুঝতে পারলাম না অরুণা কি বলতে চায়।

অরুণা হাসলো। "—সব প্ল্যান, সব প্ল্যান করে এসেছে, বুঝতে পারছো না। তা না হলে হঠাৎ দার্জিলিং আসতে চাইবে কেন অন্তু।" ওদের দু'জনকে দেখে আমরা দু'জনে আবার হাসাহাসি করলাম। আর অরুণা বললে, "দুটিতে বেশ মানায় কিন্তু।"

একদিন আমরা অতটা ওপরে উঠতে পারিনি, মাঝপথেই থেমে গিয়েছিলাম, আর অন্তু টুকটুক অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়ে একটা বিশাল পাথরের ওপরে বসেছিল। ওদের দু'জনের বসার ভঙ্গিটি ছিল ছবির মত। ওরা খুব হাসছিল আর গল্প করছিল।

সেদিকে তাকিয়ে আমি ফিসফিস করে অরুণাকে বললাম, "দ্যাখো দ্যাখো, ঠিক যেন মেড ফর ঈচ আদার!"

অরুণা হেসে উঠে বললে, "সত্যি!"

দার্জিলিং থেকে ফিরে এলাম খুব একটা খুশী মন নিয়ে। সমস্ত বুকের ভেতরটা যেন ভরাট। মনে হল জীবনে এত সুখী আমি কখনো হইনি। অন্তুও ট্রেনে আসবার সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, "ওয়াণ্ডারফুল, দার্জিলিং এত সুন্দর ভাবতেই পারিনি।" আমি আর অরুণা চোখ-চাওয়াচাওয়ি করে হাসি চেপেছিলাম।

কলকাতায় ফিরে এসে আবার সেই অসহ্য গরম, অন্য দিকে মন

দেবার জো'টি ছিল না। তবু এরই মাঝে আমি সহকর্মী বন্ধুদের কাছে দার্জিলিঙের ঘটনা সবিস্তার বলেছি, বলে আনন্দ পেয়েছি, আর কপট আক্ষেপের গলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছি, "আরে মশাই, কি নির্লজ্জ, কি সাহস মেয়েটারও, আমরা যেন বাবা মা নই, স্রেফ অচেনা পাবলিক।"

বন্ধুরা মজা পেয়েছে, সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, "এখনকার হালচালই ওরকম, কি আর করবো, আমরাও সহ্য করে যাচ্ছি।" তাদের মধ্যে ত্বু' একজন আবার গোঁড়া, বাহান্নতেই বৃদ্ধ, তারা দোষ দিয়েছে আমাকে, "আস্কারা দিয়ে আপনারাই তো ছেলেমেয়েদের মাথা খাচ্ছেন।"

আমি মনে মনে হেসেছি। এবং আমি মনে মনে স্বপ্ন দেখেছি। তারা তাদের ছেলেদের জন্যে অনেক কিছু চাইতো, ভাল রেজাল্ট, ভাল চাকরি, উন্নতি, আরো কত কি। আমার চাওয়া শুধু একটিই। অন্তু যেন সুখী হয়, অন্তুর এই একুশ বছরের স্বপ্নমাখা নরম বুকে যেন কেউ আঘাত না দেয়। এই বয়সেই সে যেন আমার মত ভেঙে না পড়ে। আমার একুশ বছরের মত।

অরুণার কাছে শুনেছিলাম, টুকটুক আবার এসেছিল একদিন, সারা তুপুর অন্তুর ঘরে বসে গল্প করেছে, অরুণা আচার রোদে দিয়েছিল, চেয়ে নিয়ে চেটে চেটে খেয়েছে।

সারা তুপুর ঘরের মধ্যে বসে গল্প করার কথায় আমার একটু ভয় হত, একটু অস্বস্তি। ঐ বয়েসটাকে বিশ্বাস করতে পারতাম না আমি, ভাবতাম শেষে কিছু একটা···পরমুহূর্তে মনে হত ওরা এত খারাপ হবে না, আমাদের মনটাই খারাপ।

রুবি একদিন এসে বললে, "জানো মা, তোমার জামাই বলছিল অন্তুর নাকি আজকাল খুব পাখা গজিয়েছে।"

অরুণা হেসে বললে, "তা আর কি করা যাবে, দিনকালই যে বদলে গেছে।"

রুবি বললে, আমার বেলায় তো খুব কড়া শাসন ছিল তোমার।

সত্যি কথা বলতে কি, রুবিকে আমরা একটু আগলে আগলেই রাখতাম। কিন্তু রুবি তো সুখী হয়েছে।

পরে শুনলাম, রুবি বলেছে অরুণাকে, 'তোমার জামাই দেখেছে, একটা ছিপছিপে মেয়েকে নিয়ে কি একটা হোটেল থেকে বেরুচ্ছে।' অরুণা বললে তোমাকে বলিনি, ভেবেছিলাম চোখের ভুল, সেদিন দুপুরে....'

অরুনা হঠাৎ অন্তুর ওপর রেগে গেল। আমাকে বললে, 'এভাবে বেশিদিন ভাল নয়, বিয়েটিয়েই যদি করতে চায় করুক না।'

কিছু একটা ঘটে যেতে পারে এই ভয় তারপর থেকে আমাকে পেয়ে বসলো। যদি কিছু ঘটে, আমি ভাবতাম, তা হলে আমাদের প্রশ্রয়ই তার জন্যে দায়ী। আবার ভাবতাম, অত ভয়ের কি আছে, ওরা বিয়ে করতে চাইলে টুকটুকের বাবা নিশ্চয় আপত্তি করবেন না। তিনি তো আরো মডার্ণ।

তবু ভয় হতো বলেই অরুণাকে বলেছিলাম, অন্তুকে স্পষ্ট করে জিগ্যেস করতে। তবে পাস করার আগে, কোন চাকরি না পেয়ে ওর বিয়ে করার কথা আমি ভাবতাম না।

ঠিক সেইসময়ে হঠাৎ টুকটুক একদিন এসে হাজির।—'নিরুপম আছে কাকাবাবু?'

আমি ওকে দেখে বেশ খুশী হয়ে উঠেছিলাম। বললাম, 'না।'

টুকটুক সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছিল, আমি বললাম, 'নিরুপম ছাড়া কি আর কারো সঙ্গে কথা বলতে তোমার ভাল লাগে না? আমরা বুড়ো হয়েছি বলে কি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতেও পারি না।'

টুকটুক মাথা নীচু করে লাজুক হাসলো। আমি বললাম, 'বসো এখানে।'

ও চুপটি করে সামনের চেয়ারে বসলো। বড় লম্বা ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে।

আমি বললাম, 'কি খবর টবর বলো তোমার। অন্তু এখুনি ফিরবে, ওকে ওষুধ কিনতে পাঠিয়েছি।'

টুকটুক মাথা নিচু করেই বললে, 'খবর একটা আছে কাকাবাবু।' মৃদু সলজ্জ হেসে বলল, 'আমার বিয়ে।'

'বিয়ে?' আমার বুকের মধ্যে কেউ যেন দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিলো। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো।—'কবে? কোথায়? কি করে ছেলেটি?'

আমি ঠিক কি প্রশ্ন করেছিলাম, আমার নিজেরই মনে নেই।

টুকটুক ব্যাগ থেকে একখানা চিঠি বের করে দিলো, আমি পড়লাম, কিন্তু কিছুই মাথার মধ্যে ঢুকলো না। সব অক্ষরগুলো ঝাপসা লাগলো। আমার বুকের মধ্যে একটা অসহ্য ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠলো। আমার ভিতরটা কেবল বলতে লাগলো, একি হলো, একি হলো।

কোনরকমে মুখে হাসি এনে বললাম, 'ভাল ভাল।'

টুকটুক উঠে বলল, 'আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি। নিরুপমকে একটু থাকতে বলবেন কাকাবাবু।'

টুকটুক চলে গেল, আর তখনই অরুণা এসে বললে, 'টুকটুকের গলা শুনছিলাম না?'

আমি অরুণাকে সব বললাম, অরুণা আমার সামনে এসে বসলো, আমরা পরস্পরের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হওয়ার পর নিঃশব্দে চোখ নামিয়ে রইলাম। ফিসফিস করে বললাম, 'এই বয়সে বেচারী' 'প্রথম থেকেই আমার এই এক ভয় ছিল।'

অরুণা বললে, 'এইটুকু ছেলে, ও সহ্য করবে কি করে।'

আমার সত্যি সত্যি কান্না পাচ্ছিল। আমার নিজের একুশ বছর বয়সের সেই আঘাতটার কথা মনে পড়ছিল। অন্তু ফিরে এসে ওষুধটা দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল, আমি ওকে কিছুই বলতে পারলাম না। এমন কি টুকটুক এসেছিল বা থাকতে বলেছে সে-কথাও বলতে পারলাম না।

মিনিট কয়েক পরেই টুকটুক ফিরে এলো, আমি ওকে অন্তুর ঘর দেখিয়ে দিলাম ইশারায়, শুধু বললাম আছে।

আমি আর অরুণা অন্তুর ঘরের দিকে তাকাতে পারলাম না। শুধু চুপ করে বসে রইলাম আতঙ্কে অপেক্ষায়। যেন এখনই একটা ভূমিকম্প হয়ে যাবে। অন্তুর বুকের মধ্যে এখনই একটা ভূমিকম্প হবে!

হঠাৎ একটা হট্টগোল ভেসে এলো ওর ঘর থেকে। চিৎকার, উল্লাস, হই হই। 'তুমি একটা ইডিয়ট', অন্তুর গলা। 'নিরুপম, ভাল হবে না বলছি, তুমি না হলে…'

আমি অরুনার চোখের দিকে তাকালাম। অরুণা আমার চোখের দিকে তাকালো।

একটু পরেই অন্তু আর টুকটুক বেরিয়ে এলো।

অন্তু চিৎকার করছে, 'আচ্ছা বাবা, মা, তুমি বলো, ষ্টুপিড বলবে না ওকে? ওর পরশু বিয়ে, একটা বন্ধুকেও এখনো নেমন্তন্ন করেনি।'

টুকটুক সাক্ষী মানলো অরুণাকে।—'আচ্ছা কাকীমা, আমি কাল পরশু দু' দু'বার ফোন করিনি? তুমি বাড়িতে থাকো নাকি কোন সময়ে!'

ওরা দু'জনে বেরিয়ে গেল বন্ধুদের নেমন্তন্ন করতে।

আমরা চুপ করে বসে রইলাম। পরস্পরের চোখের দিকে তাকালাম একটু অবাক হয়ে।

অরুণা হঠাৎ বললে, 'তুমি এবার নিশ্চিন্ত হলে তো!'

বললাম, 'জানি না, বুঝতে পারছি না।'

নীলুর দুঃখ

....

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সকালবেলাতেই নীলুর বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। মাসের একুশ তারিখ, ধারে কাছে কোনো পেমেণ্ট নেই। বাবা তিনদিনের জন্য মেয়ের বাড়িতে গেছে বারুইপুর—মহা টিক্‌রমবাজ লোক—সাউথ শিয়ালদায় গাড়িতে তুলে দিয়ে নীলু যখন প্রণাম করল তখন হাসি-হাসি মুখে বুড়ো নতুন সিগারেটের প্যাকেটের সিলোফেন ছিঁড়ছে। তিনদিন মায়ের আওতার বাইরে থাকবে বলেই বুঝি ঐ প্রসন্নতা—ভেবেছিল নীলু। গাড়ি ছাড়বার পর হঠাৎ খেয়াল হল, তিনদিনের বাজার খরচ রেখে গেছে তো! সেই সন্দেহ কাল সারা বিকেল খচখচ করছে, আজ সকালেই মশারির মধ্যে আধখানা ঢুকে তাকে ঠেলে তুলল মা—'বাজার যাবি না, ও নীলু?'

তখনই বোঝা গেল বুড়ো চাক্কি রেখে যায়নি। কাল নাকি টাকা তুলতে রনোকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু দস্তখত মেলেনি বলে উইথড্রয়াল ফর্ম ফেরৎ দিয়েছে পোষ্টাপিস। কিন্তু নীলু জানে পুরোটা টিক্‌রমবাজী। বুড়ো আগে ছিল রেলের গার্ড, রিটায়ার করার পর একটা মুদীর দোকান দিয়েছিল—অনভিজ্ঞ লোক, তার ওপর দোকান ভেঙে যেতো—ফলে দোকান গেল উঠে। এখন তিন রোজগেরে ছেলের টাকা নিয়ে পোষ্ট-অফিসে রাখে আর প্রতি সপ্তাহে খরচ তোলে।

প্রতিদিন বাজারের থলি দশমেসে পেটের মতো ফুলে না থাকলে বুড়োর মন ভজে না। মাসের শেষদিকে টাকা ফুরোলেই টিক্‌রমবাজী শুরু হয়। প্রতি সপ্তাহে যে লোক টাকা তুলছে তার নাকি দস্তখত মেলে না!

নীলু হাসে। সে কখনো বুড়োর ওপর রাগ করে না। বাবা তার দিকে আড়ে আড়ে চায় মাসের শেষ দিকটায়। ঝাঁক দেওয়ার নানা চেষ্টা করে। নীলুর সঙ্গে বাবার একটা লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে।

বাঙালের খাওয়া। তার ওপর পুঁটিয়ারির নাড়ুমামা, মামী, ছেলে, ছেলের বৌ—চারটে বাইরের লোক নিমন্ত্রিত, ঘরের লোক বারোজন—নীলু নিজে, মা, ছটা ভাই, দুটো ধুম্‌সী বোন, বিধবা মাখনীপিসী, বাবার জ্যাঠাতো ভাই, আইবুড়ো নিবারণ কাকা—বিশ চাক্কির নীচে বাজার নামে?

রবিবার। বাজার নামিয়ে রেখে নীলু একটু পাড়ায় বেরোয়। কদিন ধরেই পোগো ঘুরছে পিছন পিছন। তার কোমরে নানা আকৃতির সাতটা ছুরি। ছুরিগুলো তার মায়ের পুরোনো শাড়ির পাড় ছিঁড়ে তাই দিয়ে জড়িয়ে সযত্নে শার্টের তলায় গুঁজে রাখে পোগো। পাড়ার লোক বলে, পোগো দিনে সাতটা মার্ডার করে। নিতান্ত এলেবেলে লোকও পোগোকে যেতে দেখলে হেঁকে ডাক পাড়ে '—কী পোগোবাবু, আজ কটা মার্ডার হল?' পোগো হুস্ হাস্ করে চলে যায়।

পরশুদিন পোগোর মেজোবৌদি জানালা দিয়ে নীলুকে ডেকে বলেছিল—'পোগো যে তোমাকে মার্ডার করতে চায়, নীলু খবর রাখো?'

তাই বটে। নীলুর মনে পড়ল, কয়েকদিন যাবৎ সে অফিসে যাওয়ার সময়ে লক্ষ্য করেছে পোগো নিঃশব্দে আসছে পিছন পিছন। বাস-ষ্টপ পর্যন্ত আসে। নীলু কখনো ফিরে তাকালে পোগো উর্ধ্বমুখে আকাশ দেখে আর বিড়বিড় করে গাল দেয়।

আজ বিশচাক্কি ঝাঁক হয়ে যাওয়ায় নীলুর মেজাজ ভাল ছিল না। নবীনের মিষ্টির দোকানের সিঁড়িতে বসে সিগারেট ফুঁকছিল পোগো। নীলুকে দেখেই আকাশে তাকাল। না—দেখার ভান করে কিছুদূর গিয়েই নীলু টের পেল পোগো পিছু নিয়েছে।

নীলু ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পোগো উল্টোবাগে ঘুরে হাঁটতে লাগল। এগিয়ে গিয়ে তার পাছায় ডান পায়ের একটা লাথি কষাল নীলু—'শালা, বদের হাঁড়ি।'

কাঁই শব্দ করে ঘুরে দাঁড়ায় পোগো। জিভ আর প্যালেটের কোন দোষ আছে পোগোর, এখনো জিভের আড় ভাঙেনি। ছত্রিশ বছরের শরীরে তিন বছর বয়সী মগজ নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। গরম খেয়ে বলল—'খুব ঠাবহান, নী,লু বলে ডিট্টি খুব ঠাবহান।'

—'ফের! কসাবো আর একটা?'

পোগো থতিয়ে যায়। শার্টের ভিতরে লুকানো হাত ছুরি বের করবার প্রাক্কালের ভঙ্গীতে বলে—'একদিন ফুটে ডাবি ঠালা।'

নীলু আর একবার ডান পা তুলতেই পোগো পিছিয়ে যায়। বিড় বিড় করতে কারখানার পাশের গলিতে ঢুকে পড়ে।

পোগো সেই কবে থেকে মার্ডারের স্বপ্ন দেখে সাত আটখানা ছুরি বিছানায় নিয়ে ঘুমোতে যায়। পাছে নিজের ছুরি ফুটে নিজে মরে—সেই ভয়ে ও ঘুমোলে ওর মা এসে হাতড়ে হাতড়ে ছুরিগুলো সরিয়ে নেয়। মার্ডারের বড় সখ পোগোর। সারাদিন সে লোককে কত মার্ডারের গল্প করে! কলকাতায় হাঙ্গামা লাগলে ছাদে উঠে দুহাত তুলে লাফায়। মার্ডারের গল্প যখন শোনে তখন নিথর হয়ে যায়।

নীলু গতবার গ্রীষ্মে দার্জিলিঙ বেড়াতে গিয়ে একটা ভোজালি কিনেছিল। তার সেই শখের ভোজালিটা দিনসাতেক আগে একদিনের জন্য ধার নিয়েছিল পোগো। ফেরত দেওয়ার সময়ে চাপা গলায় বলেছিল—'ভয় নেই, ভাল করে ঢুয়ে ডিয়েছি।'

'—কী ধুয়েছিস ?' জিজ্ঞেস করেছিল নীলু।

অর্থপূর্ণ হেসেছিল পোগো, উত্তর দেয়নি। তোমরা বুঝে নাও কী ধুয়েছি। সেদিনও একটা লাথি কষিয়েছিল নীলু—শালার শয়তানী বুদ্ধি দেখ। 'ধুয়ে দিয়েছি—কী ধুয়েছিস আবে পোগোর বাচ্চা ?'

সেই থেকেই বোধহয় নীলুকে মার্ডার করার জন্য ঘুরছে পোগো। তার লিষ্টে নীলু ছাড়া আরো অনেকের নাম আছে যাদের সে মার্ডার করতে চায়।

আজ সকালে বৃটিশকে খুঁজেছে নীলু। কাল বৃটিশ জিতেছে। দুশো সত্তর কি আশি টাকা। সেই নিয়ে খিচাং হয়ে গেল কাল।

গলির মুখ আটকে খুদে প্যাণ্ডেল বেঁধে বাচ্চাদের ক্লাবের রজত-জয়ন্তী হচ্ছিল কাল সন্ধেবেলায়। পাড়ার মেয়ে—বৌ, বাচ্চারা ভিড় করেছিল খুব। সেই ফাংশন যখন জমজমাট তখন বড় রাস্তায় ট্যাক্সি থামিয়ে বৃটিশ নামল। টলতে টলতে ঢুকল গলিতে। দু বগলে বাংলার বোতল। সঙ্গে ছট্কু। পাড়ায় পা দিয়ে ফাংশনের ভিড় দেখে নিজেকে জাহির করার জন্য দুহাত ওপরে তুলে হাঁকাড় ছেড়েছিল বৃটিশ—ঈ-ঈ-ঈ-দ্ কা চা-আ-আ-দ! বগল থেকে দুটো বোতল পড়ে গিয়ে ফট্—ফটাস্ করে ভাঙল। হুড়দোড় লেগে গিয়েছিল বাচ্চাদের ফাংশনে। পাঁচ বছরের টুমিরাণী তখন ডায়াসে দাঁড়িয়ে 'কাঠবেরালী, কাঠবেরালী, পেয়ারা তুমি খাও.......'বলে দুলতে দুলতে থেমে ভ্যাঁ করার জন্য হ্যাঁ করেছিল মাত্র। সেই সময়ে নীলু, জগু, জাপান এসে দুটোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। হরতুনের চায়ের দোকানে। নীলু বৃটিশের মাথায় জল ঢালে আর জাপান পিছন থেকে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে জিজ্ঞেস করে—কত জিতেছিস ? প্রথমে বৃটিশ চেঁচিয়ে বলেছিল—'আবে, পঞ্চা-আশ-হা-জা-আ-র।' জাপান আরো দুবার হাঁটু চালাতেই সেটা নেমে দাঁড়াল দু হাজারে। সেটাও বিশ্বাস হল না কারো। পাড়ার বুকি বিশুর কাছ থেকে সবাই জেনেছে, ঈদ কা চাঁদ হট ফেবারিট ছিল। আরো কয়েকবার ঝাঁকাড়

খেয়ে সত্যি কথা বলল বৃটিশ—'তিনশো মাইরি বলছি—বিশ্বাস কর,' পকেট সার্চ করে শ'দুইয়ের মতো পাওয়া গিয়েছিল।

আজ সকালে তাই বৃটিশকেই খুঁজছে নীলু। মাসের একুশ তারিখ। বৃটিশের কাছে ত্রিশ টাকা পাওনা। গত শীতে দর্জির দোকান থেকে বৃটিশের টেরিকটনের প্যান্টটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল নীলু। এতদিন চায়নি। গতকাল নিয়ে নিতে পারত, কিন্তু মাতালের কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয় বলে নেয়নি। আজ দেখা হলে চেয়ে নেবে।

চায়ের দোকানে বৃটিশকে পাওয়া গেল না। ভি আই পি রোডের মাঝখানে যে সবুজ ঘাসের চত্বরে বসে তারা আড্ডা মারে সেখানেও না। ফুলবাগানের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দেখল নীলু। কোথাও নেই। কাল রাতে নীলু বেশীক্ষণ ছিল না হরতুনের দোকানে। জাপান, জগু ওরা বৃটিশকে ঘিরে বসেছিল। বহুকাল তারা এমন মানুষ দেখেনি যার পকেটে ফালতু দুশো টাকা। জাপান মুখ চোখাচ্ছিল। কে জানে রাতে আবার ওরা ট্যাক্সি ধরে ধর্মতলার দিকে গিয়েছিল কিনা! গিয়ে থাকলে ওরা এখনো বিছানা নিয়ে আছে। দুপুর গড়িয়ে উঠবে। বৃটিশের বাড়িতে আজকাল আর যায় না নীলু। বৃটিশের মা আর দাদার সন্দেহ ওকে নষ্ট করেছে নীলুই। নইলে নীলু গিয়ে বৃটিশকে টেনে তুলত বিছানা থেকে, বলত,—'না হকের পয়সা পেয়েছিস, হিস্যা চাইনা, আমার হক্কেরটা দিয়ে দে।'

নাঃ। আবার ভেবে দেখল নীলু। দুশো টাকা—মাত্র দুশো টাকার আয়ু এ বাজারে কতক্ষণ? কাল যদি ওরা সেকেণ্ড টাইম গিয়ে থাকে ধর্মতলায় তবে বৃটিশের পকেটে এখন হপ্তার খরচও নেই।

মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায় নীলু। ভাবে বিশ চাক্কি যদি ঝাঁক হয়েই গেল তবে কী ভাবে বাড়ির লোকজনের ওপর একটা মৃদু প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

অমনি শোভন আর তার বৌ বল্লরীর কথা মনে পড়ে গেল তার।

শোভন কাজ করে কাষ্টমসে। তিনবার তিনটে বিলিতি টেরিলিনের শার্ট তাকে দিয়েছে শোভন, আর দিয়েছে সস্তায় একটা গ্রুয়েন ঘড়ি। তার ভদ্রলোক বন্ধুদের মধ্যে শোভন একজন—যাকে বাড়িতে ডাকা যায়। কতবার ভেবেছে নীলু, শোভন, বল্লরী আর ওদের দুটো কচি মেয়েকে এক দুপুরের জন্য বাড়িতে নিয়ে আসবে, খাইয়ে দেবে ভাল করে। খেয়ালই থাকে না এসব কথা।

মাত্র তিনষ্টপ দূরে থাকে শোভন। মাত্র সকাল ন'টা বাজে। আজ ছুটির দিন বল্লরী নিশ্চয়ই রান্না চাপিয়ে ফেলেনি। উনুনে আচ দিয়ে চা-ফা লুচি-ফুচি হচ্ছে এখনো। দুপুরে খাওয়ার কথা বলার পক্ষে খুব বেশি দেরি বোধহয় হয়নি এখনো।

ছত্রিশ নম্বর বাসটা থামতেই উঠে পড়ল নীলু।

উঠেই বুঝতে পারে। বাসটা দখল করে আছে দশ বারো জন ছেলে ছোকরা। পরনে শার্ট পায়জামা, কিংবা সরু প্যাণ্ট, বয়স ষোলোর এদিক ওদিক। তাদের হাসির শব্দ থুথু ফেলার আগের গলা খাঁকারির—খ্য-অ্যা-অ্যার মতো শোনাচ্ছিল। লেডীজ সীটে দু'তিনজন মেয়েছেলে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে, দুচারজন ভদ্রলোক ঘাড় সটান করে পাথরের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে আছে। ছোকরারা নিজেদের মধ্যেই চেঁচিয়ে কথা বলছে। উল্টোপাল্টা কথা, গানের কলি, কণ্ডাকটর দুজন দু দরজায় সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে, ভাড়া চাইবার সাহস নেই।

তবু ছোকরাদের একজন দলের পরমেশ নামে আর একজনকে ডেকে বলছে—'পরমেশ আমাদের ভাড়াটা দিবি না?'

'—কত করে?'

'—আমাদের হাফ্-টিকিট। পাঁচ পয়সা করে দিয়ে দে।'

'—এই যে কণ্ডাকটর দাদা, পাঁচ পয়সার টিকিট আছে তো? বারোখানা দিন।'

পিছনের কণ্ডাকটর রোগা, লম্বা, ফর্সা। না কামানো কয়েক

দিনের দাড়ি থুতনিতে জমে আছে। এবড়োখেবড়ো গজিয়েছে গোঁফ। তাতে তাকে বিষন্ন দেখায়। সে তবু একটু হাসলো ছোকরাদের কথায়, অসহায় হাসিটি।

নীলু বসার জায়গা পায়নি। কণ্ডাকটরের পাশে দাঁড়িয়ে সে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল।

বাইরে কোথাও পরিবার পরিকল্পনার হেডিং দেখে জানালার পাশে বসা একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল—'লাল ত্রিভুজটা কী বল্ তো মাইরি।'

'—ট্র্যাফিক সিগন্যাল রে, লাল দেখলে থেমে যাবি।'

'—আর নিরোধ! নিরোধটা কী যেন!'

'—রাজার টুপি........রাজার টুপি.......'

—খ্যা,—অ্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যা.......

—খ্যা........

পরের স্টপে বাস আসতে তারা হেঁকে বলল—বেঁধে লেডীজ......

নেমে গেল সবাই। বাসটাকে ফাঁকা নিস্তব্ধ মনে হল এবার। সবাই শরীর শ্লথ করে দিল। একজন চশমা চোখে যুবা কণ্ডাকটরের দিকে চেয়ে বলল—'লাথি দিয়ে নামিয়ে দিতে পারেন না এসব এলিমেন্টকে।'

কণ্ডাকটর ম্লান মুখে হাসে।

ঝুঁকে নীলু দেখছিল ছেলেগুলো রাস্তা থেকে বাসের উদ্দেশে টিটকিরি ছুঁড়ে দিচ্ছে, কান কেমন গরম হয়ে যায় তার। লাফিয়ে নেমে পড়তে ইচ্ছে করে। লাঠি, ছোরা, বোমা যা হোক অস্ত্র নিয়ে কয়েকটাকে খুন করে আসতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ পোগোর মুখখানা মনে পড়ে নীলুর। জামার আড়ালে ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়াত পোগো। স্বপ্ন দেখেছে মার্ডারের। তারা সবাই পোগোর পিছনে লাগে, মাঝে মধ্যে লাথি কষায়। তবু কেন যে পোগোর মতোই এক তীব্র মার্ডারের ইচ্ছে জেগে ওঠে নীলুর

মধ্যেও মাঝে মাঝে। এত তীব্র সেই ইচ্ছে যে আবেগ কমে গেলে শরীরে একটা অবসাদ আসে। তেতো হয়ে যায় মন।

শোভন বাথরুমে। বল্লরী এসে দরজা খুলে চোখ কপালে তুলল '—ওমা, আপনার কথাই ভাবছিলাম সকালবেলায়। অনেকদিন বাঁচবেন।'

শোভনের বৈঠকখানাটি খুব ছিমছাম, সাজানো। বেতের সোফা, কাঁচের বুককেস, গ্রুণ্ডিগের রেডিওগ্রাম, কাঠের টবে মানিপ্ল্যাণ্ট, দেয়ালে বিদেশী বারো ছবিওলা ক্যালেণ্ডার, মেঝেয় কয়ের কার্পেট। মাঝখানে নীচু টেবিলের ওপর মাখনের মতো রঙের ঝক্‌ঝকে অ্যাশ-ট্রেটার সৌন্দর্যও দেখবার মতন, মেঝেয় ইংরেজি ছড়ার বই খুলে বসেছিল শোভনের চার আর তিন বছর বয়সের মেয়ে মিলি আর জুলি। একটু ইংরেজি কায়দায় থাকতেই ভালবাসে শোভন। মিলিকে কিণ্ডার গার্টেনের বাস এসে নিয়ে যায় রোজ। সে ইংরিজি ছড়া মুখস্থ বলে।

নীলুকে দেখেই মিলি জুলি টপাটপ উঠে দৌড়ে এল।

মিলি বলে—'তুমি বলছিলে ভাত খেলে হাত এঁটো হয়। এঁটো কি ?'

তুজনকে তু কোলে তুলে নিয়ে ভারী রকমের সুখবোধ করে নীলু ওদের গায়ে শৈশবের আশ্চর্য সুগন্ধ।

মিলিজুলি তার চুল, জামার কলার লণ্ডভণ্ড করতে থাকে। তাদের শরীরের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে নীলু বল্লরীকে বলে— 'তোমার হাঁড়ি চড়ে গেছে নাকি উনুনে!'

'—এইবার চড়বে, বাজার এলো এইমাত্র।'

'—হাঁড়ি ক্যানসেল করো আজ। বাপ গেছে বারুইপুর, সকালেই বিশচাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। সেটা পুষিয়ে নিতে হবে তো! তোমার এ তুটো পুঁটলি নিয়ে তুপুরের আগেই চলে যেও আমার গাড্ডায়, ঘুমে লিও সবাই।'

বল্লরী ঝেঁঝে ওঠে—'কী যে সব অসভ্য কথা শিখেছেন, বাজে লোকেদের কাছ থেকে। নেমন্তন্নের ঐ ভাষা !'

বাথরুম থেকে শোভন চেঁচিয়ে বলে—'চলে যাস না নীলু, কথা আছে।'

'—যেও কিন্তু। নীলু বল্লরীকে বলে—নইলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না।'

'—বাঃ আমার যে ডালের জল চড়ানো হয়ে গেছে। এত বেলায় কি নেমন্তন্ন করে মানুষ !'

নীলু সেসব কথায় কান দেয় না। মিলিজুলির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। শোভন সকালেই দাড়ি কামিয়েছে। নীল গাল, মেদবহুল শরীরে এঁটে বসেছে ফিনফিনে গেঞ্জি, পরনে পাটভাঙ্গা পায়জামা, গত বছর যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে এল শোভন। বাসা খুঁজে দিয়েছিল নীলুই। চারদিনের নোটিশে। এখন সুখে আছে শোভন। যৌথ পরিবার থাকার সময় এত নিশ্চিন্ত আর তৃপ্ত আর সুখী দেখাতো না তাকে।

পাছে হিংসা হয় সেই ভয়ে চোখ সরিয়ে নেয় নীলু।

নেমন্তন্নের ব্যাপার শুনে শোভন হাসে—'আমিও যাবো যাবো করছিলাম তোর কাছে। এর মধ্যেই চলে যেতাম। ভালই হল।'

এক কাপ চা আর প্লেটে বিস্কুট সাজিয়ে ঘরে আসে বল্লরী।

শোভন হতাশ গলায় বলে—'বাঃ মোটে এক কাপ করলে। ছুটির দিনে এ সময়ে আমার তো এক কাপ পাওনা।'

বল্লরী গম্ভীরভাবে বলে—'বাথরুমে যাওয়ার আগেই তো এক কাপ খেয়েছো।' মিষ্টি ঝগড়া করে দুজন। মিলি জুলির গায়ের অদ্ভুত সুগন্ধে ডুবে থেকে শোভন আর বল্লরীর আদর করা গলার স্বর শোনে নীলু, সম্মোহিত হয়ে যেতে থাকে।

তারপরই হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে—'চলিরে। তোরা ঠিক চলে যাস।'

'—শুনুন, শুনুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।, বল্লরী তাকে থামায়।'

'—কী কথা ?'

'—বলছিলুম না আজ সকালেই ভেবেছি আপনার কথা। তার মানে নালিশ আছে একটা। কারা বলুন তো আমাদের বাড়ির দেয়ালে রাজনীতির কথা লিখে যায়? তারা কারা? আপনাদেরই তো এলাকা এটা, আপনার জানবার কথা!'

'—কী লিখেছে ?'

'—সে অনেক কথা। ঢোকার সময় দেখেননি? বর্ষার পরেই নিজেদের খরচে বাইরেটা রঙ করালুম। দেখুন গিয়ে কালোরঙ দিয়ে ছবি এঁকে লিখে কী করে গেছে শ্রী! তাছাড়া রাতভর লেখে, গোলমালে আমরা কাল রাতে ঘুমাতে পারিনি।'

নীলু উদাসভাবে বলে—'বারণ করে দিলেই পারো।'

'—কে বারণ করবে? আপনার বন্ধু ঘুমোতে না পেরে উঠে সিগারেট ধরালো আর ইংরেজিতে আপনমনে গালাগাল—ভ্যাগাবণ্ডস্ মিসক্রিট্স্, প্যারাসাইট্স্........আরো কত কী? সাহস নেই যে উঠে ছেলেগুলোকে ধমকাবে।'

'—তা তুমি ধমকালে না কেন?' নীলু বলে উদাসভাবটা বজায় রেখেই।

বল্লরী হাসল উজ্জ্বলভাবে। বলল—'ধমকাইনি নাকি। শেষমেষ আমিই তো উঠলাম, জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললাম—ভাই, আমরা কি রাতে একটু ঘুমাবো না? আপনার বন্ধু তো আমার কাণ্ড দেখে অস্থির। পিছন থেকে আঁচল টেনে ফিস্‌ফিস্ করে বলছে —চলে এসো, ওরা ভীষণ ইতর, যা তা বলে দেবে। কিন্তু ছেলেগুলো খারাপ না। বেশ ভদ্রলোকের মত চেহারা। ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছে, হাতে কিছু চটি চটি বই, প্যাম্ফ্লেট। আমার দিকে হাতজোড় করে বলল—বৌদি, আমাদেরও তো ঘুম নেই।

এখন তো ঘুমের সময় না এদেশে। বললুম—আমার দেয়ালটা অমন নোংরা হয়ে গেল যে! একটা ছেলে বলল—কে বলল নোংরা! বরং আপনার দেয়ালটা অনেক ইম্পর্ট্যাণ্ট হল আগের চেয়ে। লোকে এখানে দাঁড়াবে, দেখবে, জ্ঞানলাভ করবে। আমি বুঝলুম খামোখা কথা বলে লাভ নেই। জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছি অমনি একটা মিষ্টি চেহারার ছেলে এগিয়ে এসে বলল—বৌদি, আমাদের একটু চা খাওয়াবেন। আমরা ছজন আছি!'

নীলু চমকে উঠে বলে—'খাওয়ালে নাকি?'

বল্লরী মাথা হেলিয়ে বলল—'খাওয়াবো না কেন?'

—'সে কী!'

শোভন মাথা নেড়ে বলল—'আর বলিস না, ভীষণ ডেয়ারিং এই মহিলাটি, একদিন বিপদে পড়বে।'

'আহা ভয়ের কী! এইটুকু-টুকু সব ছেলে, আমার ভাই বাবলুর বয়সী। মিষ্টি কথাবার্তা। তাছাড়া এই শরতের হিমে সারা রাত জেগে বাইরে থাকছে—ওদের জন্য না হয় একটু কষ্ট করলাম!'

শোভন হাসে, হাত তুলে বল্লরীকে থামিয়ে বলে—'তার মানে তুমিও ওদের দলে।'

'—আহা, আমি কী জানি ওরা কোন দলের? আজকাল হাজারো দল দেয়ালে লেখে। আমি কী করে বুঝবো।'

'—তুমি ঠিকই বুঝেছো। তোমার ভাই বাবলু কোন দলে তা কি আমি জানি না। সেদিন খবরের কাগজে বাবলুর কলেজের ইলেক্শনের রেজাল্ট তোমাকে দেখালুম না? তুমি ভাইয়ের দলের সিমপ্যাথাইজার।'

অসহায়ভাবে বল্লরী নীলুর দিকে তাকায়, কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলে—'না, বিশ্বাস করুন। আমি দেখিওনি ওরা কি লিখেছে।'

নীলু হাসে—'কিন্তু চা তো খাইয়েছ!'

'—হ্যাঁ। সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। গ্যাস জ্বেলে ছ'

পেয়ালা চা করতে কতক্ষণ লাগে? ওরা কী খুশী হল! বলল—বৌদি, দরকার পড়লে আমাদের ডাকবেন। যাওয়ার সময় পেয়ালাগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দিয়ে গেল। ওরা ভাল না?'

নীলু শান্তভাবে একটু মুচকি হাসে—'কিন্তু তোমার নালিশ ছিল বলছিলে যে। এ তো নালিশ নয়। প্রশংসা।'

'—না, নালিশই। কারণ, আজ সকালে হঠাৎ গোটা দুই বড় বড় ছেলে এসে হাজির। বলল—আপনাদের দেয়ালে এসব লেখা কেন? আপনারা কেন এসব অ্যালাউ করেন? আপনার বন্ধু ঘটনাটা বুঝিয়ে বলতে ওরা থম্থমে মুখ করে চলে গেল। আপনি ওই দুজনকে যদি চিনতে পারেন তবে বলবেন—ওরা যেন আর আমাদের দেয়ালে না লেখে। লিখলে আমরা বড় বিপদে পড়ে যাই। দুদলের মাঝখানে থাকতে ভয় করে আমাদের, বলবেন যদি চিনতে পারেন।'

শোভন মাথা নেড়ে বলে—'তার চেয়ে নীলু, তুই আমার জন্য আর একটা বাসা দেখ। এই দেয়ালের লেখা নিয়ে ব্যাপার কদ্দুর গড়ায় কে জানে। এর পর বোমা কিংবা পেটো ছুঁড়ে দিয়ে যাবে জানালা দিয়ে, রাস্তায় পেলে আলু টপকাবে, তার ওপর বল্লরী ওদের চা খাইয়েছে—যদি সে ঘটনার সাক্ষীসাবুদ কেউ থেকে থাকে তবে এখানে থাকাটা বেশ রিস্কি এখন।'

বল্লরী নীলুর দিকে চেয়ে বলল—'বুঝলেন তো! আমাদের কোনো দলের ওপর রাগ নেই। রাতজাগা দুটো ছেলেকে চা খাইয়েছি—সে তো আর দল বুঝে নয়! অন্য দলের হলেও খাওয়াতুম।'

বেরিয়ে আসার সময়ে, দেয়ালের লেখাটা নীলু একপলক দেখল। তেমন কিছু দেখার নেই। সারা কলকাতার দেয়াল জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিপ্লবের ডাক। নিঃশব্দে।

কয়েকদিন আগে সকালবেলায় হরলালের জ্যাঠামশাইকে নীলু

দেখেছিল, প্রার্তঃভ্রমন সেরে ফেরার পথে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দেয়ালের সামনে, পড়ছেন লেখা। নীলুকে দেখে ডাক দিলেন তিনি। বললেন—'এইসব লেখা দেখছো নীলু? কী রকম স্বার্থপরতার কথা! আমাদের ছেলেবেলায় মানুষকে স্বার্থত্যাগের কথাই শেখানো হত। এখন এরা শেখাচ্ছে স্বার্থসচেতন হতে, হিংস্র হতে—দেখেছো কী রকম উল্টো শিক্ষা!'

নীলু শুনে হেসেছিল।

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন—'হেসো না, রামকৃষ্ণদেব যে কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছিলেন তার মানে বোঝো?'

নীলু মাথা নেড়েছিল। 'না।'

উনি বললেন—'আমি এতদিনে সেটা বুঝেছি, রামকৃষ্ণ আমাদের দুটো অশুভ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে বলেছিলেন। একটা হচ্ছে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব, অন্যটা মার্ক্সিজম। ফ্রয়েডের প্রতীক কামিনী, মার্কসের কাঞ্চন। ও দুই তত্ত্ব পৃথিবীকে ব্যভিচার আর স্বার্থপরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তোমার কী মনে হয়?'

নীলু ভীষণ হেসে ফেলেছিল।

হরলালের জ্যাঠামশাই রেগে গিয়ে দেয়ালে লাঠি ঠুকে বললেন—'তবে এর মানে কী? অ্যাঁ পড়ে দেখ, এসব ভীষণ স্বার্থপরতার কথা কিনা!'

তারপর থেকে যতবার সেই কথা মনে পড়েছে ততবার হেসেছে নীলু। একা একা, বেলা বেড়ে গেছে, বাসায় খবর দেওয়া নেই যে শোভনরা খাবে। খবরটা দেওয়া দরকার। ফুলবাগানের মোড় থেকে নীলু একটা শর্টকাট ধরল। বড় রাস্তায় যেখানে গলির মুখ এসে মিশেছে সেখানেই দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাধন—নীলুর চতুর্থ ভাই, কলেজের শেষ ইয়ারে পড়ে। নীলুকে দেখে সিগারেট লুকোলো, পথ চলাতে অচেনা মানুষের মতো দুজনে দুজনকে চেয়ে দেখল একটু। চোখ সরিয়ে নিল। তাদের দেখে কেউ বুঝবে না যে

তারা এক মায়ের পেটে জন্মেছে, একই খাদের নীচে একই বিছানায় শোয়, নীলু শুধু জানে সাধন তার ভাই। সাধনের আর কিছুই জানে না সে। কোন দল করছে সাধন, কোন পথে যাচ্ছে, কেমন তার চরিত্র—কিছুই জানা নেই নীলুর। কেবল মাঝে মাঝে ভোরবেলা উঠে সে দেখে সাধনের আঙুলে, হাতে কিংবা জামায় আলকাতরার দাগ। তখন মনে পড়ে, গভীর রাতে ঘুমোতে এসেছিল সাধন। এখন কেন জানে না, সাধনের সংগে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছিল নীলুর। সাধন তুই কেমন আছিস? তোর জামাপ্যাণ্ট নিয়েছিস তুই? অনার্স ছাড়িসনি তো? এরকম কত জিজ্ঞাসা করার আছে।

একটু এগিয়ে গিয়েছিল নীলু। থেমে ফিরে আসবে কিনা ভেবে ইতস্তত করছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখল সাধন তার দিকেই চেয়ে আছে একদৃষ্টে। হয়তো জিজ্ঞাসা করতে চায়—দাদা, ভাল আছিস তো? বড্ড রোগা হয়ে গেছিস, তোর ঘাড়ের নলী দেখা যাচ্ছেরে! কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে হল না শেষ পর্যন্ত, না? ওরা বড়লোক, তাই? তুই আলাদা বাসা করতে রাজি হলি না, তাই? না হোক কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে—কিন্তু আমরা—ভাইয়েরা তো জানি তোর মন কত বড়, বাবার পর তুই কেমন আগলে আছিস আমাদের। আহারে দাদা, রোদে ঘুরিস না, বাড়ি যা। আমার জন্য ভাবিস না—আমি রাতচরা—কিন্তু নষ্ট হচ্ছি না রে, ভয় নেই? কয়েক পলক নির্জন গলিপথে তারা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে এরকম নিঃশব্দ কথা বলল, তারপর সামান্য লজ্জা পেয়ে নীলু বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে লাগল।

দুপুরে বাড়ীতে কাণ্ড হয়ে গেল খুব, নাড়ুমামী কলকল করে কথা বলে, সেই সঙ্গে মা আর ছোটো বোনটা, শোভনের দুই মেয়ে কাণ্ড করল আরো বেশী। বাইরের ঘরে শোভন আর নীলু শুয়েছিল—ঘুমোতে পারল না। সাধন ছাড়া অন্য ভাইয়েরা

যে যার আগে খেয়ে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে কি আস্তানায় কেটে পড়েছিল, তবু যজ্ঞিবাড়ির ভিড়ের মতো হয়ে রইল রবিবারের দুপুর।

সবার শেষে খেতে এল সাধন। মিষ্টি মুখের ডৌলটুকু আর গায়ের ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে তেতে কেমন টেনে গেছে। মেঝেতে ছক্ পেতে বাইরের ঘরেই লুডো খেলছিল বল্লরী, মামী, আর নীলুর দুই বোন। সাধন ঘরে ঢুকতেই নীলু বল্লরীর মুখখানা লক্ষ্য করল। যা ভেবেছিল তা হল না, বল্লরী চিনতেও পারল না সাধনকে, মুখ তুলে দেখল একটু, তারপর চালুনীর ভিতর ছক্কাটাকে খটাখট্ পেড়ে দান ফেলল। সাধনও চিনল না। একটু হতাশ হল নীলু; হয়তো রাতের সেই ছেলেটা সত্যিই সাধন ছিল না, নয়তো এখনকার মানুষ পরস্পরের মুখ বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

নীলু গলা উঁচু করে বলল—তোমার মেয়েদুটো বড় কাণ্ড করছে বল্লরী, ওদের নিয়ে যাও।

—আঃ, একটু রাখুন না বাবা, আমি প্রায় ঘরে পৌঁছে গেছি।

রাত্রির শোতে শোভন আর বল্লরী জোর করে টেনে নিয়ে গেল নীলুকে। অনেক দামী টিকিটে বাজে একটা বাংলা ছবি দেখল তারা, তারপর ট্যাক্সিতে ফিরল।

জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। ফুলবাগানের মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে জ্যোৎস্নায় ধীরে ধীরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল নীলু। রাস্তা ফাঁকা। দুধের মতো জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। দেয়ালে দেয়ালে বিপ্লবের ডাক। নিরপেক্ষ মানুষেরা তারই আড়ালে শুয়ে আছে। দূরে দূরে কোথাও পেটো ফাটাবার আওয়াজ ওঠে, মাঝে মধ্যে গলির মুখে মুখে যুদ্ধের ব্যূহ তৈরী করে লড়াই শুরু হয়। সাধন আছে ঐ দলে। কে জানে একদিন হয়তো তার নামে একটা শহীদস্তম্ভ উইঢিবির মতো গজিয়ে উঠবে গলির মুখে। পাড়া আজ নিস্তব্ধ, তার মানে নীলুর ছোটোলোক বন্ধুরা কেউ আজ মেজাজে নেই। হয়তো বৃটিশ

আজ মাল খায়নি, জগু আর জাপান গেছে ঘুমোতে। ভাবতে ভালই লাগে।

শোভন আর বল্লরীর ভালবাসার বিয়ে, বড় সংসার ছেড়ে এসে সুখে আছে ওরা। কুসুমের বাবা শেষ পর্যন্ত মত করলেন না। এই বিশাল পরিবারে তাঁর আদরের মেয়ে এসে অথৈ জলে পড়বে, বাসা ছেড়ে যেতে পারল না নীলু। যেতে কষ্ট হয়েছিল, কষ্ট হয়েছিল কুসুমের জন্যও। কোনটা ভাল হত তা সে বুঝলই না, একা হলে ঘুরে ফিরে কুসুমের কথা বড় মনে পড়ে।

বাবা ফিরবে পরশু। আরো দুদিন তার কিছু চাক্কি ঝাঁক যাবে, হাসিমুখেই মেনে নেবে নীলু। নয়তো রাগ করবে। কিন্তু ঝাঁক হবেই। বাবা ফিরে এসে নীলুর দিকে আড়ে আড়ে অপরাধীর মতো তাকাবে, হাসবে মিটিমিটি। খেলটুকু ভালই লাগবে নীলুর। সে এই সংসারের জন্য প্রেমিকাকে ত্যাগ করেছে—কুসুমকে—এই চিন্তায় সে কি মাঝে মাঝে নিজেকে মহৎ ভাববে? একা থাকলে অনেক চিন্তার টুকরো ঝড়ে ওড়া কুটোকাটার মতো মাথার ভিতরে চক্কর খায়।

বাড়ির ছায়া থেকে পোগো হঠাৎ নিঃশব্দে পিছু নেয়। মনে মনে হাসে নীলু। তারপর ফিরে বলে—'পোগো, কী চাস?' পোগো দূর থেকে বলে—'ঠালা, টোকে মার্ডার করব।' ক্লান্ত গলায় নীলু বলে—'আয়, করে যা মার্ডার।' পোগো চুপ থাকে একটু, সতর্ক গলায় বলে,—'মারবি না বল!'

বড় কষ্ট হয় নীলুর। ধীরে ধীরে পোগোর দিকে এগিয়ে বলে—'মারবো না। আয়, একটা সিগারেট খা।' পোগো খুশী হয়ে এগিয়ে আসে।

নিশুত রাতে এক ঘুমন্ত বাড়ির সিঁড়িতে বসে নীলু, পাশে পাগলা পোগো। সিগারেট ধরিয়ে নেয় দুজনে। তারপর—যা নীলু কখনো কাউকে বলতে পারেনা—সেই হৃদয়ের দুঃখের গল্প—কুসুমের গল্প—অনর্গল বলে যায় পোগোর কাছে। পোগো নিবিষ্ট মনে বুঝবার চেষ্টা করে।

তুষার হরিণী

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আমি শঙ্কর। তোমাকে কোন চিঠি লেখার কথা ছিল না দেবীকা। গত দু'বছরে আমরা অনেক চিঠি লিখেছি। এখন বেশ পিছনে তাকিয়ে মনে হয় আমাদেরও একটা অতীত আছে। যে অতীতের নাম দিয়েছ তুমি—মন যা করিয়েছে তাই করেছি। লিখেছ —আমার বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই, তাই আমি বিয়ে করব না।

তুমি যা বুঝেছ তার ওপর নতুন কিছু বোঝাতে যাওয়ার মানে হয় না। বিদেশে পড়তে গেছ। তোমার বয়সে আমার মার কোলে তিন ছেলে। তোমার ধারণা কতখানি ঠিক তা তর্ক ক'রে বোঝাবার জিনিস নয়। বয়েস হবে। সংসার করবে। তোমার মনই তোমাকে সব বলবে।

তবে আমার কোন ক্ষতিও হয়নি লাভও হয়নি। স্বভাবে মানুষ আর ঋতু এক রকমের। মেঘ বৃষ্টি ঝড় এ-সব তো পর পর সাজানো। তাই আর ভাবি না।

তোমার চিঠি পেয়ে মন খারাপ হল। রবিবার। মেসের ঘরে তালা দিয়ে লাইব্রেরীতে এলাম। লাইব্রেরীতে সুরমার সঙ্গে দেখা। সুরমাকে তুমি চিনবে না। আমার মুখে নাম শুনে থাকতে পার। কথা সেরেই ঘরে ফিরব। চাকরির পরীক্ষার এই এক জ্বালা।

'কি ব্যাপার! লাইব্রেরীতে!'

'অফিস নেই। তুপুর বেলা কি করব।'

ক' দানা এলাচ দিল মুখে। চাপা গন্ধ পেলাম। পরীক্ষার আগে ঘুম না এলে তুমি ব্রোমাইড মিকশ্চার খেতে। 'এসে ভাল করেছ।' কি বলা যায়। গতবার বি. এ পরীক্ষায় বসেনি। এবারে বসেছিল। এগ্রিগেটে শর্ট। হয়ত আর পরীক্ষা দেবে না।

'আরও পরীক্ষা আছে নাকি?'

'এখনও একটা পেপার বাকি।'

'খুব কঠিন বুঝি।' হাসতে হাসতে চাইল। ছোট, ভালভাবে সাজান দাঁত। স্যাকরার ছোট হাতুড়ি দিয়ে ঠুক্‌ঠুক্‌ করে একটা একটা দাঁত তুলে ফেলতে ইচ্ছে হবে। তোমার দাঁত ভারি ভারি। হাসলে বয়েস কমে যেত।

'তোমার দাঁত তো খুব সুন্দর।'

'সস্তায় স্ক্রেপ করালাম সে-দিন। পোকা হচ্ছিল। আচ্ছা এনামেল উঠে যায় নি তো?' দাঁতে দাঁত লাগিয়ে দেখাল।

কারখানার চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফিরে যখন পড়াশুনো শুরু করলাম তখন সুরমার সঙ্গে আলাপ। টেষ্টের আগেই কলেজ ছেড়ে দিল। শুনেছিলাম সাত মাস মাইনে বাকি। লাইব্রেরীতে একদিন দেখলাম কার গ্রন্থাবলী পড়ছে। কাবলি জুতোর ফিতে নেই। সামনের দিকে কাদা লেগে শুকিয়ে আছে। সেবারে পরীক্ষা দিল না। এ-সব তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগের কথা।

অনেকদিন পরে আবার মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে সুরমার সঙ্গে। কখনও লাইব্রেরীতে। কখনও বাসে-ট্রামে। মাঝের ক'বছর অদৃশ্য হয়েছিল। কোথায় ছিল জানি না। ক্যানটিনে কোনের টেবিলটায় চেয়ার এগিয়ে দিয়ে নিজেও বসল সুরমা। চায়ের পয়সা দিতে গিয়ে তোমার নীল চিঠিটা শব্দ ক'রে উঠল পকেটে!

'না না পয়সা আপনি দেবেন কেন? বারে, আমি এখন চাকরি করি।' ব'লেই হাত ধুতে গেল বেসিনে। তা সত্যি। মাসদুয়েক চাকরি পেয়েছে সুরমা।

দু'টো করে রসোগোল্লা আর ডবল ওমলেট এল।

'চা একটু পরে দিয়ো।' ব'লেই গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়াতে লাগল ওমলেটে। কোমরের নীল রুমালটা দেখা যাচ্ছে। এক পরত চর্বি বেরিয়ে আছে। এত খাবার। অনেক পয়সার ব্যাপার। বারণ করব। কিন্তু কি হবে। ইচ্ছেও করে না। আসলে তোমার চিঠিটা ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে।

সুরমাও চাকরিতে ঢুকে কয়েকদিনে বদলে এসেছে। এই তো পরীক্ষার ক'দিন আগে একখানা ছবি দেখে সিনেমা হল থেকে লাইব্রেরীতে এসে হাজির। অনেক কষ্ট দুঃখের পর নায়ককে ফিরে পাওয়া নিয়ে ছবির গল্প। নিশ্চয় বুকে হাত রেখে চিৎ হয়ে শোয় রাতে। স্বপ্ন দেখতে দেখতে বোবায় ধরে।

'কার কথা ভাবছেন?' অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিলাম। তোমার সামনে খুব কথা বলতাম। এমনিও সুরমা খানিক চপল হতে ভালবাসে। উত্তর দিয়ে অন্য কথায় এলাম। 'অফিস কেমন লাগছে?......ভক্তের সংখ্যা?'

'ধমকে দিয়েছি।' কথার সঙ্গে চামচে ওমলেট কাঁটা থামল না। ঠোঁটের ওপর ঘাম দিয়েছে। মুখে নাকে তেল গড়াচ্ছে। মুখ থেকে পড় পড় ওমলেটের টুকরো ঠোঁট বাড়িয়ে ধরছিল। সুরমাকে দেখছিলাম। কাছের থেকে দেখলে কাছের লাগে। তোমারও আমাকে নিজের লাগত। লিখেছিলে: 'আমাকে যেন ভুল বুঝে তুমি কখনও ছেড়ে যেও না। আমরা কত অল্পদিন আর আছি পৃথিবীতে।'

কথাগুলো প'ড়ে মনে হত আমারও মান আছে। তুমি মেলার পাখি নও যে টিপলে ডেকে উঠবে। আয়ুর উপর এখন আর তেমন

দখল কার আছে। সারাটা দিন যেন বিকেল হয়ে আছে। পৃথিবীতে অনেক দিন থাকব। বাঁচব কতদিন। সুরমাকে কি বলি? সিনেমা সিনেমাই। আর আমার সম্বলই বা কতটুকু। কি অনুযোগ সুরমার সে-দিন। 'আজ বাদ কাল পরীক্ষা। এখনও কলমের নিব বদলান নি? চলুন একটা কিনবেন।'

গলির অন্ধকারে কাঠের সিড়ি খুঁজে সুরমা এসে হাজির। বেশ আরামে দরজা জুড়ে দাঁড়ালো। পেছনের ইট বোঝাই ফাঁকা মাঠটা খালি মসজিদের ভাঙ্গা ছাদ ঢেকে ফেলেছে। কলম নিই কি ক'রে। কি দেব।

একটু একটু ক'রে রাত হতে শুরু হল। যেমনি বৃষ্টির দিনে চেপে বৃষ্টি আসে। ক্যানটিন থেকে মাঠে এসে বসলাম। কি নিয়ে কথা বলি। 'অনেক বদলে গেছ।'

পা ভাঁজ করে নিল সুরমা। 'কোথায়?' চোখের মনি পায়ে রাখল। ছোটরা খেলতে এসে ঘাসের মধ্যে কাচের মার্বেল সন্ধ্যেবেলা ফেলে গেছে। নখের মাথাগুলো ভোঁতা। আঙুলে চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে ঢেকে দিল সুরমা।

'এই যেমন আজকাল আমাকে স্নেহ করতে শুরু করেছ।'

হঠাৎ সুরমা মুখোমুখি তাকাল, 'আমি আপনাকে স্নেহ করতে পারি? আপনার বন্ধুরা বলে না আমি কি খারাপ দেখতে।'

হাসতে গিয়ে থামতে হল। কোন বন্ধুদের কথা বলছে। যারা কোনো কালো রোগা মেয়ের সঙ্গে দেখলে বলে—'শেষে এই তোর টেষ্ট! ছিঃ!' কেউ ভালবাসে জানলে তো ভরে যাই। এ-সব কথা সুরমাকে বলি নি। তোমাকে বললে তুমি থেমে থাকতে। সুরমা শুনলে কি করত জানি না। তুমি একরকম। সুরমা আর এক রকম। মুখে হাত রেখে দাঁতে ঠোঁট চেপে যখন হাসে তখন বাঁ-পাশ থেকে দেখলে চোখ দুটি খুব সুন্দর লাগে। চিঠিতে জানিয়েছিলে কেমন দেখতে হয়েছ; 'আমি আয়নাতে একদিন নিজেকে দেখে

বুঝতে পারি, এখানে এসে আমি অনেক সুন্দর হয়েছি। রঙ মসৃণ হয়েছে। হাড় বের করা গলা একটু নিটোল হয়েছে। চোদ্দ পাউণ্ড ওজন বেড়েছে।' চিঠিটা প'ড়ে মনে হয়েছিল—মোটা মোটা একটা লম্বা মাছ মাটি কি শ্যাওলা খেয়ে আরও পাকাল আরও পেছল হয়ে জলে ডুবে গেল। আমাদের শরীরে আঙুরের মতো ফলন্ত সার পদার্থ রক্তে গিয়ে মেশে। তাতে লাবণ্য হয়।

সুরমাকে বললাম, 'তুমিই বলো, আজকাল আগের চেয়ে বেশী স্নেহ কর কিনা?'

'কেন খুব দেরী হয়ে গেছে?' না-ঢাকা শরীর দেখলাম। শাড়ীতে অন্ধকারে শুধু গলা হাত আবছা দেখা যায়। বাঁ-হাতের কব্জি নাড়তেই বালাটা দুলতে লাগল। বলি কি ক'রে-আমি তো তাতান লোহা নই—অনাদরে ফেলে রাখলে ঠাণ্ডা শক্ত হব। নতুন কথায় এলাম। 'বেশ মোটা হয়েছ।'

'কক্ষনো না। সত্যি?'

কথা বলতে খারাপ লাগছিল। আসলে তোমার ওপর রাগটা তখনও থিতোয় নি। তাছাড়া রবিবার দুপুরে নতুন শাড়ী পরে এসেছে। কিছু তো বলতেই হবে। তার ওপর এতগুলো পয়সা খরচ করল। 'তুমি কি আমাকে ভালবাস।'

এর চেয়ে বললে হত, চল একটা সিনেমা দেখে আসি। ছ'টা এখনও বাজেনি। না থেমেই বললাম, 'কিন্তু আমার তো···' 'কোথায় ফুরোলেন?' হেসেই বলল সুরমা। অফিসের ক্যানটিনে রুটি রসগোল্লার রস দিয়ে টিফিন করে। আরামে খায়। রুটি ভর্তি মুখে জন্তুর মতো হাসে তখন।

'ফুরোবো কোথা থেকে? তুমি তো বেশ লোক! অফিস কেমন লাগছে বললে না।'

'লাগবার মত কিছু নেই।'

'তবু দু'-একজন।'

'তারাও আমার মত মাছিমারা কেরানী।' কথা বলছিলাম অন্ধকারে বসে। লাইব্রেরীর টানা বারান্দায় কেউ নেই। ভাগ্যিস আমাদের মা বাবার মাথা ঠাণ্ডা ছিল। না হলে কোথায় যেতাম? আঁচ্ছা দেখ, আমি এসব ভাবছি। আমার ভাবনার সঙ্গে কোন যোগ নেই সামনে বসে থাকা এই মেয়েটির। কথা নেই।

'এখুনি আমাকে নিতে পার?' আগে ভাবি নি। কেন বলতে গেলাম? আর সত্যিই তো আমাকে কিভাবে নেবে ও। ওকেই তো নেওয়ার জন্যে লোক দরকার। পা ঢেকে বসল সুরমা।

'আমাকে বিয়ে করতে পারবে? চাকরি নেই।' জোর দিয়ে বললাম। তুমিও জোর দিয়ে লিখতে; 'জীবনে তোমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না।'

সুরমার হাতখানা টেনে নিলাম। আঙ্গুল দিয়ে চেরা সিঁথিটায় দাগ দিলাম। কানের নরম লতি ধ'রে টেনে দেখলাম। দুল পরে নি। পরলে ব্যথা পেত। পেলেও চুপ ক'রে থাকত। বেকায়দায় আমার হাত টেনে নিল সুরমা। যেন বেওয়ারিশ জিনিষ। রেলে কাটা পড়ে লাইনের পাশে পড়েছিল এতক্ষণ। একটু পরে আমার হাত ছেড়ে দিল। ওর দু'টো হাত ভর্ত্তি ঘাম। 'লাগে তোমার আমাকে ভাল? আমার কাছেই তো আমাকে কেমন খারাপ লাগে।' কাঁধটা ধরে কাছে নিয়ে এলাম। অর্ডার দিয়ে তৈরী ব্লাউজ। পিঠটা মন্দ না। তবে বেশিক্ষণ ভাল লাগবে না। কাঁধের হাড়ের ডিমটা বুড়ো আঙ্গুলে ঘষে দেখলাম। মাংস সরিয়ে হাড়ের ওপর রাখলে খসখসে লাগত। কোমরটা সরু। চোখে কালি। নাকের ফুটো দু'টো নরম। ওখান থেকে শরীরের সব হাওয়া নিতে হয়। এ-সব ভাবছি। খুসিতে কেমন শব্দ করল সুরমা। একটা 'উ' বলে থেমে গেল। আমরা নৌকায় ভাসছি না। মাঠে ব'সে। ওর মাথা আমার কাঁধে হেলানো নয় যে অমন আরামে শব্দ করবে।

সময় নেই আর। বললাম, 'কাছে এস আরও,' ইচ্ছে ছিল

চুমু খাই। কেমন লাগবে কে জানে। অন্যের মুখ। কেমন গন্ধ। তোমার মুখের গন্ধ টের পাইনি। খাবার পেলে মাড়ির পাশে লালা বেরোয়। যাদুঘরে আগের কালের বানরের মাড়ি আছে। সত্যি বলতে কি খেয়ে মনে হত কি খেলাম! মাংস মাংস লাগল শুধু।

'যদি আপনার ভাল না লাগে।' এত জড়সড় কেন ও। এতে আরও খারাপ লাগে।

'ধ্যাৎ!' ব'লে হাত সরিয়ে নিয়ে এলাম। ফাঁকা কোলে ব্যাগটা উপুড় ক'রে ঢেলে গোছাতে লাগল।

দূরে সরকারী কোয়ার্টার। বারান্দায় বারান্দায় আলো। পাশেই ঠাণ্ডায় এতটুকু হয়ে সুরমা ব'সে আছে! খানিক কথা বলো ওর সঙ্গে, দেখবে এক জায়গায় এসে থেমে পড়েছে। নামটাই কেমন যুদ্ধের আগেকার! আচ্ছা তুমি আর বাঁচবে কত বছর? আমি তো বেশী হলে তিরিশ বছর আর। এখনই কেমন পুরনো লাগে। হাতে গায়ে গলায় মুখে ছাতকুড়ো পড়ছে মনে হচ্ছে। বুকের দুপাশে ঝোলানো হাত সেই একই পুরনো বুক বেয়ে নেমেছে।

সুরমা এখন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি তো বলতেই, 'আমরা যখন শাড়ি ধরলাম প্রথম, দলবেঁধে বেড়িয়ে ফিরেই হিসাব নিতাম,'কার দিকে কটা ছেলে তাকিয়েছে।' তাকালে এমন কিছু আসে যায় না। চোখের টান সব সময়ই থাকে।

পুরনো বাড়িটার ছাদে ভাঙ্গা পরীটা কাল সারাদিন কাৎ হয়ে বৃষ্টি ভিজেছে। দুপুরবেলায় বাসটা দুর্গাপুর রেলব্রীজে উঠল, দেখি একটা বুড়ো কুকুর ছাইগাদায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। এমনভাবে জিভ বেরনো, যেন হাসছে আরামে।

আমরা ম'রে যাব। ঠিক এখুনই নিজের ওপর রাগ হল। তার চেয়ে বেশী হল সুরমার ওপর। বোকার মত ব'সে। সে কোন কথা তো বলতে পারে।

'তোমার বাবা তোমার বিয়ে দিয়ে দেয়না কেন ? বয়েস কত হল ?'

এখানে অন্ধকার। হাঁটুতে মুখ রাখল। মাথাশুদ্ধ শরীরটা দুলছে। মাটিতে চোখ। বলল, 'বাইশ। জমানো টাকা নেই বাবার।' একটা ঘাসের মূলশুদ্ধ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে থেমে পড়ল, 'কাকেই বা বিয়ে করব ?'

'কেন, কাউকে, ভালবেসে বিয়ে করো।'

'ভয় করে। ভীষণ ভয় করে।'

মাঠের শেষ দিকটায় বসলে ভাল হত। সেখানে একটা ঝিল আছে। একটা ঢিল নিয়ে জলে ছুঁড়ে দিতাম। অন্তত এই অন্ধকারে জলে একটা চেনা শব্দ উঠত। তাও ভাল লাগত। কিন্তু কথাগুলো কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুই যে চিনি না এর। বললাম, 'ভয় কিসের ?'

'সব ফাঁকিবাজ।' ইস্কুলে জ্যামিতি পড়েছে সুরমা। ইহাই স্বতঃসিদ্ধ। ইহাই উপপাদ্য বিষয়। সুরমার ওপরে নয়। নিজের ওপরেই কেমন একটা মায়া হল। গালে দাড়ি, চোখ বসা, কাবলির গোড়ালিতে পেরেক। সামান্য ক' বছরের জীবন। এত নষ্টর পরেও একটা মেয়ের কাছে আমি দামি। সুরমা আমাকে মহৎ করে। কে মহৎ ! ভাবলে জন্মটাকেই মায়া হয়।

মাঠ ফেলে দিয়ে আলোতে এলাম। হাঁটতে হাঁটতে আলিপুর রোড পিছনে প'ড়ে থাকল। তিনের বি বাস হুশ করে চ'লে গেল।

'দেখছেন, আবার এইভাবে হাঁটছেন। ভীষণ ভয় করে। আপনি কোনদিন চাপা পড়বেন'। আমার মনে হয়, যদি চাপাই পড়ি, তবে যেন একেবারে পড়ি। উঃ ! খোঁড়া হয়ে ঘরের মধ্যে প'ড়ে থাকা। ভাবাই যায় না।

পাড়ার রকের জটলার আলোচনা থেমে গেল আমাদের দেখে। একটা হ্যারিকেন হাতে অন্ধকার পার করে দিয়ে আসা যাবে, এমন ভয়ও না। অথচ সুরমাকে তখনও বলার মত কিছু নেই। 'আচ্ছা

তোমার জন্যে ভাল ছেলে খুঁজে দেব ? খুব আদর করবে। তোমাকে ছাড়া এক পা চলবে না।'

আসলে ইচ্ছে হচ্ছিল, সুরমাকে এই ভয় পার করে দিয়ে আসি। ঠিক তখন তোমার কথা একেবারে ভুলে গেছি।

'আমারটা আমি বুঝব। আচ্ছা আপনি কি হতে চান বলুন তো ? কি আপনার ভাল লাগে ?'

'তোমার জেনে কি হবে।' কয়লার গাড়ির মোষ লেজের বাড়ি মারল হাতে।

'না। এমনি। আপনি কেমন মনমরা হয়ে বসে থাকেন। ঠিক বুঝিনা।' সুরমার ঠোঁট দুখানা নীলচে লাগছে। কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে গেছে। তার ওপর ভিড়ে হাঁটতেও হচ্ছে আমার পাশে পাশে, সুরমার একদিন বিয়ে হবে। এমন ঠোঁটের মেয়েরা পঞ্চাশ পঞ্চান্নয় ভারিক্কী গিন্নী হয়ে ছোট যাঁতিতে সুপুরি কুচোয়। ছেলের বউর কাছে জরদার কৌটটা কোথায় জানতে চায়।

হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গা পেরিয়ে নবগ্রহ মন্দির। প্রণামীর থালায় ব্যাগ খুলে পয়সা দিল সুরমা। মাথা নিচু করে নমস্কারও করল।

'কি বললে ভগবানকে ?'

'বলব কেন ? ইচ্ছের কথা বলে দিলে কামনা হয়ে যায়।' অল্পবয়সী ঠাকুরমা কথা বলছে মনে হবে। শুনতে কিন্তু ভাল লাগছিল।

কালীঘাটে নিওন আলো ষ্টেট বাস ঠেলাগাড়ি-পাশে বাঁকিয়ে ট্রাম স্টপে এলাম। 'আচ্ছা, আমরা দু'জন তো হাঁটছি অনেকের সঙ্গে। অনেকে দেখছে হয়তো।'

তারপর ঠোঁট উলটেই বললে 'দেখুক গে।'

চুপচাপ। পানের দোকান। ট্রাফিকের লাল আলো। হাজরা পার্কে মিটিং হচ্ছে। সুরমা ডান পাশ দিয়ে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে ওয়েল-গড়িয়ার ট্রাম লাইনে এসে গেছি।

'আমরা হাঁটছি পাশাপাশি। অথচ লোকে কত ভুল বুঝবে। ভাববে....' কথাটা শেষ করল না, হাসল, ঘাম মুছল রুমালে—তারপর বলল, 'হয়ত ভাববে, কপোত-কপোতী যথা,.......কি মিথ্যে!'

পাউডার ঘামে গড়িয়ে রেনু রেনু হয়ে জমেছে। হয়ত কাছে দাঁড়ালে একটা উৎকট গন্ধ পেতাম। ডাক্তারখানার ঘড়িতে পৌনে আটটা।

'তুমি আগে ট্রামে ওঠ। অনেক হেঁটেছ। আমাকেও ঘর খুলে পড়তে বসতে হবে।' পকেট হাতরে দেখলাম, চাবিটা আছে তো? না মাঠে পড়ে গেছে।

'সে হবে না। আপনি ট্রামে উঠুন। আমি তুলে দেব।'

ষ্টপ না ছুঁয়েই তিনখানা ট্রাম চলে গেল। আরো আগে ঘরে ফেরা উচিত ছিল। পরশু পরীক্ষা। তারপর দিন একটা ইন্টারভিউ আছে। জামা কাপড় আর্জেন্ট কাচাতে হবে। আমার চেয়ে ছোট হয়ে আমাকে ট্রামে তুলে দেবে। সে কি রকম কথা! চল ও দিকের ফুটপাতে।

'না, আমি যেন প্রত্যেকবার আপনাকে তুলে দিতে পারি।' পানের দোকানের আলো এসে পড়েছে মুখে। একটা ছেলে—যে সুরমাকে অনেক আদর করতে পারবে, তাকে খুঁজে আনতে হবে।

ট্রামে আর ওঠা হল না। তুমি লিখেছ, মনে মনে মিল থাকলেও বাজার দরে আমি তোমার চেয়ে ছোট। আসল কথা, আমি যা তাতে তুমি খুশি না। হয়তো জবুথুবু হয়ে ব্যাপারটা অনেকদিন ভাবতাম, যদি না সুরমার সঙ্গে দেখা হত সে-দিন। তুমি কেন যে বলো, জীবন শূন্য, ভালবাসার কোন মানে নেই—তা আমি বুঝি না। তোমার জন্য আমার এখন কষ্ট হয়।

সুরমা অফিস ফেরত পরীক্ষা হলে আসতে চাইছিল। বারন করে দিলাম। তুমি থাকলেও চাইতে। পাড়ার পার্কে কুয়াশার এমন

রং আছে যে, কিছুদূর এগিয়ে গেলে পথ থেকে প্রায় দেখা যায় না। আবার সেই তালা খুলে ঘরে ঢুকতে হবে। একতলার মাতাল আয়েঙ্গারের চোখ এড়ালেও ওর কুকুরটা নতুন কাউকে দেখলেই এমন চেঁচাতে শুরু করবে। তুমি এলে মাঠটাতে গিয়ে বসতে। সুরমাকে মাঠে নিয়ে বসাতে মায়া হল। অনেকক্ষণ তো মাঠেই ছিল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। ধাপগুলো ভাঙ্গাচোরা ক'দিন ধরে সারা বাড়ির ইলেকট্রিক ফিউজ।

হ্যারিকেনের আলোয় আয়েঙ্গার ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। ওপাশে চেন অভাবে গলায় দড়ি-বাঁধা কুকুরটা লম্বা সাদা মত কি কামড়াচ্ছে। এনামেলের টোল খাওয়া গামলাটায় হাড়ের গুতো লেগে মাঝে মাঝে খালি বাড়িতে দীর্ঘ শব্দ উঠছে।

গা ভেঙ্গে ঘুম আসছিল। শার্টটা জানলার তাকে রেখে দিলাম। চশমা বালিশের ওপর। খাতাগুলোও। মোমটাকে খুঁজে জানলায় দাঁড় করিয়ে দিলাম। এই আলোতে চোখই ব্যথা করে। বিকেল থাকতে ঘরে এলে ইট-ছড়ানো মাঠ, ফাঁকা মসজিদের ভাঙ্গা ছাদ, মাতাল আয়েঙ্গারের দড়িতে ঝোলান ভিজে ট্রাউজার সব দেখা যেত জানলা দিয়ে।

সুরমা বিছানাতে বসল পা মুড়ে। 'আপনি বুঝি নাম্বার টেন খান।' সিগারেটের প্যাকেটটা তখনও হাতে।

কথাগুলো শুনলে যে কেউ ভাববে পাশের বাড়ির ক্লাস ফাইভের ফ্রক-পরা একটা মেয়ে হঠাৎ এ-ঘরে ঢুকে পড়েছে! বেঁকানো ঘাড় মোমের আলোতে কালো মোটা রবারের পাইপ হয়ে আছে। তার ওপর মাথাটা বসানো। সুরমা ছাদ থেকে বাঁধানো চাতালে পড়লে সবসুদ্ধ রক্ত পড়বে তিন ঘটি। বিকেলে ট্রামে কাটা-পড়া কুকুরের রক্ত দেখলে মনে হয় গা থেকে কয়েকটা গাঢ় লাল ভেলভেটের ফিতে বেরিয়ে এসেছে।

সে-বারে তুমি গ্যাসট্রিক আলসারে ভুগে মেডিকেল কলেজের ব্লাড ডিপার্টমেণ্টে ছিলে। সব রক্তশূন্য রোগী হাসপাতালের লাল কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে। বিকেলেও আলো জ্বলছিল। বাইরের মাঠে সূর্যের আলোয় ধাঙড়দের ছেলেরা হৈ হৈ করে বাতাবিলেবু পিটিয়ে বল খেলছে। ঘরের মধ্যে চাপা শুকনো রক্তের গন্ধ। জলে ভেজা ঝুরঝুরে জঙ ধরা জানলার শিকের গন্ধ যেন। সঙ্গে দাড়ি, খারাপ মাড়ি, আধোয়া ঘাড়ের গন্ধও মিশেছিল।

আচ্ছা, আমি তুমি সুরমা, আমরা তিনজনে কোন হাসপাতালে ম'রে গেলাম। আমাদের মড়া নেবার জন্যে কোন দাবিদার নেই। ডাক্তারবাবু আমাদের পছন্দ করে অসুধ মাখিয়ে ঠাণ্ডাঘরে পাঠিয়ে দিল। কিছুদিন পরে আর মাংস নেই। ডাক্তারির তিনজন নতুন ষ্টুডেণ্ট আমাদের কিনে নিল। আমরা কেমিষ্ট্রি য়্যানাটমির সঙ্গে এক হয়ে গেলাম।

ভাগ্যিস সুরমা বলেনি এত সিগারেট খান কেন? কলকাতায় বসন্ত হলে তুমি লণ্ডন থেকে সাবধানে থাকতে লিখতে। অতি ব্যবহারে শরীরটা কেমন জীর্ণ লাগে। জোড়গুলো আলগা লাগছে। বেশ ক্লান্ত ছিলাম। বিছানায় শুয়েই সুরমাকে একগ্লাস জল দিতে বললাম। কুঁজো থেকে জল ভরার ভঙ্গি, আঁচল বাঁচিয়ে ধীরে সুস্থে জলের গ্লাস হাতে ঠোঁট টিপে যে-ভাবে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো, তাতে ওকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। জল খেয়ে বললাম, 'গ্লাস ধুয়ে রাখতে হবে না। ওখানেই রেখে দিয়ে কাছে এসে বসো।'

'না। আর বসব না। রাত হয়ে যাচ্ছে।' ব'লে, আমার পাশে বসল। চুলের পাশে নাক দিয়ে গন্ধ নিলাম। বাধা দিল না। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে খানিকক্ষণ। এই আলোয় বৃস্টির ধারা চোখে পড়ে না। একটা কাঁঠালিপোকা বাইরে থেকে উড়ে এসে থপ করে কাগজের ওপর পড়ল। পাখা উড়িয়ে কাগজে কি বিশ্রী শব্দ করছে

একটানা। কলমটা তুলে নিলাম। ছামলে নিব দিয়ে গেঁথে তুলব। প্রায় থেমেছে। কলম তুললাম। সুরমা কথা না ব'লে বাঁ হাতে আলগোছে আমার কলমসুদ্ধ হাত সরিয়ে দিল ও-পাশে। সঙ্গে সঙ্গে পাখা বুজিয়ে পোকাটা স্তব্ধ হয়ে গেল। বাইরে শব্দ করে বৃষ্টি হচ্ছে। সুরমা একদৃষ্টিতে কাঁঠালি পোকাটাকে দেখছে। সুরমার দিকে তাকালাম। কলমটা হাত থেকে পড়ে ছোট শব্দ করে গড়াতে গড়াতে ঢালু মেঝে দিয়ে চলেছে। স্থির হয়ে আছে সুরমা। যেখানে খোপা শুরু সেখানে মুখ রেখেছি। কাঁপল। মুখে হাসি। আঙুল পেছনে পাঠালো খোপা সাজাতে। ঘাড় ভেঙ্গে খোঁপা পিঠে ছড়িয়ে পড়ল। চুলে তেল দেয় নি। চোখ বুজে মুখ ডুবিয়ে মনে হল এণ্ডির চাদরে মুখ রেখেছি। মাথা ঘুরিয়ে, চুমু খেলাম ঠোঁটে। তেমন কিছু লাগল না। সুরমা আমার মাথা দু'হাতে কোলে তুলে নিল। ভীষণ জোরে আমার মুখে ঠোঁট জিব ঘষে দিল। পোষ্ট অফিসের খামে লাগানো আঠার গন্ধ পাচ্ছি। ঠোঁটের ওপর দারুণ ঘাম হয়েছে। গলার নিচে একটা সরু হারে, ঘামে, ক্যাতকেতে হয়ে গেছে। আমি তখন ওর নাকের ফুটো দেখছিলাম। এইটুকু পথ দিয়ে কি করে এত হাওয়া যায় শরীরে।

পিঠে মুখ রাখব। সুরমা নড়ল না। আমি পিঠ খুলে নিলাম। আরও ঘাম। পিঠে মুখ রেখে ওর শিরদাঁড়াটা দেখছিলাম। বড় বড় ঢান্ মাছের প্রায় এমন মোটা শিরদাঁড়া হয়। কতদিন মাছের শিরদাঁড়া দাঁতে চিবিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছি। সুরমা খুব ক্লান্ত। এই শরীরে কতখানি হেঁটেছে। সবসুদ্ধ পঁচানব্বই পাউণ্ড হবে ওর।

বললাম, 'আচ্ছা, তোমার চুলে যখন চোখ ডুবিয়ে ছিলাম তখন কি মনে হচ্ছিল আমার বলো তো ?'

'বারে! আমি কি করে বলব আপনার কথা ?' এমন তীক্ষ্ণগলা চিরে হাসল!

'আমার তো মনে হচ্ছিল অন্ধকারে জল ভর্তি নৌকার ভরাডুবি হচ্ছে। তোমার কেমন লাগছিল ? মনে মনে হাসছিল যেন।'

'কি করে বলব ! মনে নেই।'

'চুলে তো কোন ইন্দ্রিয় নেই। তবে অমন সুখী ভাবটা দেখাচ্ছিলে কি করে ?'

'আপনারা কখন কি করেন, তার কি কিছু ঠিক আছে। মুখ-টুখ কিছু বুঝি না।' জানলার অন্ধকার, বৃষ্টির ছাট্ আসছে। দেওয়ালে বিলিতি চা কোম্পাণীর ক্যালেণ্ডার। হিমালয়ের বরফ আচ্ছন্ন প্রান্তরে বড় বড় নীল পাইন গাছ দাঁড়িয়ে আছে। দূরে উচুঁ-নীচু সমতল ঠাসা চায়ের চাষ। পাহাড়ের নীল চুড়ো। পাইনের আড়ালে বরফের ওপর হরিণ ছুটতে গিয়ে থমকে পড়ছে। বাঁকানো শিং। গাছের শুকনো ডালও হতে পারে। টী কোম্পাণীর ক্যালেণ্ডার। ছবিটা দেখলে চায়ের কথা মনে পড়ে না কিছুতেই। একটু থেমে বলতে লাগল সুরমা, 'আপনার ভাল লাগছে এই ভেবেই কেমন ভাল লাগে।'

খানিক পরে উঠে এলাম বাইরে। কাঠের সিঁড়িতে এসে দেখলাম, বৃষ্টি হচ্ছে কিনা। না। থেমে গেছে। মোম ধরিয়ে সেই আগুনে সিগারেট ধরালাম। চোখ কি একটা রক্তনীল তরলে জ্যাবজেবে হয়ে উঠেছে। মোমের পোড়া সুতোর ছাই উড়ে সিগারেট ধরাবার সময় চোখে প'ড়ে থাকবে। একটা লাঠিপেটা কুকুরের মত করে কাঁদতে লাগলাম। একটানা। থামতেই চায়না। আমার কোথাও কোন আধ শুকনো ঘা ছিল। কী একটা খুবজোরে এসে লেগেছে সেখানে। অনেকটা ইচ্ছে নেই—তবু কাঁদছি। কোনও হাত নেই আমার।

পুলিস ফাঁড়িতে লোহা পিটিয়ে ঘণ্টা দিচ্ছে। আলাদা আলদা শব্দ। শুনলাম। রাত দশটা। দূরের ট্রামের শব্দ এখন জাহাজের নোঙর তোলার মতো লাগবে। লণ্ডনে এখন বিকেল। হয়ত এ সময়ে দক্ষিণ উপকুলে তুষার ঝড়ও উঠতে পারে। পা

অবদি লম্বা ছায়া ফেলা কোট আছে তোমার। ঠাণ্ডা লাগবার ভয় নেই।

ময়লা মেঝের ছাই মাখানো আঁচল কাঁধে ফেলল। কপালে হাত ঘষল, মুখের হাসি মুছল আচলে, তারপর বাইরে এসে দাঁড়াল ঠিক আমার পেছন ফেরা লম্বা ছায়াটার মাঝখানে। তারপর একটা একটা ধাপ পেরিয়ে গেল। কাঠের সিঁড়িটা কাঁপতে লাগল। মাতাল আয়েঙ্গারের কুকুরটা হ্যারিকেন উলটে চেঁচাচ্ছে। সাদা বড় হাড়খানা মুখ থেকে ছিটকে বারান্দার কিনারে প'ড়ে ছিট ছিট বৃষ্টিতে ভিজছে। সুরমা এসব দেখলও না। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মনে হচ্ছিল, ওর মেরুদণ্ডে মচমচ শব্দ হচ্ছে।

এখানে বরফ পড়ে না। তবু রাত দশটায় চাপ চাপ ধোঁয়া এ বাড়ি সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এ পাড়াটাকে শুষে খায়। তার ওপর আবার বৃষ্টি হল। নিশ্বাস আটকে আসছে। ইস্কুলে ছোট মেয়ের মত পথের খালি দেশলাই খোলে পা দিয়ে ঠোক্কর দিতে দিতে সুরমা চলে গেল। সেই কখন বেরিয়েছে। ভাবলাম ডেকে বলি, 'পা চালিয়ে যাও।' এমন ধীরে সুস্থে খেলতে খেলতে যাচ্ছে। অবশ্যি ট্রাম লাইন অবধি এ গলিটায় লোকজনের যাতায়াত বেশি নয়।

ঘরে এলাম। কাঠালি পোকাটা সেখানেই ব'সে। আচ্ছা, কাল পরীক্ষা, পরশু ইন্টারভিউ। পরশু যদি চাকরী যায়। কি বলব সুরমাকে, কি বলব তাকে ?

তোমার বয়সে আমার মার কোলে তিন ছেলে। আগের কালে অবশ্য অল্প বয়সে বিয়ে হত। তবু তুমি তো সবই জান। সবই বোঝ।

পিকুর ডায়রি

....

সত্যজিৎ রায়

মাঝে মাঝে মা তখন বকে সুখদেওকে বল্ল আচ্ছা কর়কে ধোতা নেই। আর সুখদেও বল্ল মেমসাব মেমসাব কেন বলে মাকে মা কি মেম নাকি। আর মা কি সাহেব নাকি খুব মজার বেপারটা। তারপর ত ঘুম এল কখন যে এসে যায় ঘুম কেউ জানেনা দাদু বলে মরে গেলেই নাকি লম্বা ঘুম আর খালি সপনো আর যা দেখতে চাই তাই সপনো খালি।

*　　　*　　　*

আমার ডাইরিটা একটা জায়গায় যেখানে লুকিয়ে রাখি কেউ জানে না কিন্তু। সেটা আমাদের পুরোন গ্রামাফোন সেটা হাত দিয়ে দম দেয় আর সেটা কেউ বাজায়না কারণ নোতুনটাতো ইলেকটিকে আর লং প্লেং বাজে তাই আর পুরোনটা বাজায় না সেই সেটার মধ্যেই ডাইরিটা আর তাই কেউ জানে না যে আমি ডাইরি লিখি। আমিতো অনেক লিখি তাই আমার আঙুলটায় একটু বেথা তাই মা যখন নোক কাটছে আমি তখন বল্লাম আঃ আর মা বল্ল কি হয়েছে বেথা নাকি আমি বল্লাম না না তাহলে যে জেনেই যাবে মা আমি ডাইরি লিখি। ডাইরি দাদু বলেছে যে কাউকেই দেখাবে না খালি নিজে লেখে আর পড়ে খালি নিজেই আর কেউ না। আমার ছররা আর বাইসটা

আছে আমি শুনেছি . কিন্তু চড়াইটা খুব বদমাইস আসেইনি আর। আমি ছাতে খালি ট্যাংকে গুলি মারি টং টং আওজ হয় আর ছোট ছোট গোল গোল গোল গোল দাগ হয় যায় তাই তাহলে ভাবছি পায়রাই মারব। পায়রারা চুপচাপ খুব বসে থাকে। আর হাঠে আর বেসি ওড়েনা। দাদা পাচদিনতো আসেনি দাদার তাই ঘরটাই খালি আর আলনায় একটা সাট, সেটা সাদা আর একটা নিল প্যাণ্ট ঝুলছে খালি আর বইটই সব। কাল আমি যখন বুদবুদ করছিলাম খুব বড় একটা সেটা ওড়াবো তখন ঠিক সুনলাম হুন পেলাম আর বল্লাম হিতেসকাকু আর মা বল্লেন ডারলিং তুমি ধিংড়ার বাড়ি যাওনা আজ ধিংড়ারতো ছুটি। আমি বল্লাম ধিংড়া আমার কানের পাশে যেটা ঝুলপি খালি উপরে টানে আর বেথা লাগে তাই যাবো না মা বোল্লেন তাহলে ছাতে এআর গানটা নিয়ে আমি বোল্লাম তাহলে পায়রা মারবো মা বল্লে ছি ছি ছি তা কেন এমনি মারো আকাসে যাও আমি বল্লাম ধেত আকাসে আবার কোথায় টিপ করব মা বোল্ল তাহলে ওনুকুলের কাছে যাওনা আমি বল্লাম ওনুকুলতো তাসই খেলে আর দারোয়ান আর সুখদেও আরেকটা লোক সব তাস খেলে আমি তাই কোথাও যাব না। আর মা তখখুনি ঠাস করে একটা মারলো জোরসে তাই আমি খাটের ডানডায় আমার ধাককাই লেগে গেল। আমি একটু কানলাম কিন্তু বেসি না একটু আর তারপর তো মা চলে গেলো আর আমি আরেকটু কানলাম বেশি কিন্তু না আর তারপর ভাবলাম ফ্রিজে গিয়ে দেখা যাক কি আছে তাই দেখি দুটো লেডিকেনি আর একটা সেটা ট্ংকার কৃম রোল সেটা সব খেলাম তারপর তো বোতল থেকে ঢক ঢক ঢক একেবারে গেলাসেই ঢালিনি। তারপর একটা ইলাসটেট উকলি সেটা বাবার টেবিলে দেখলাম তাতে ভালো ছবিটবি নেই খালি একটা ডনেল ডাক। আর তারপর বারান্দায় দৌড়ালাম আর একটু হাইজাম একটা মোড়ার উপর দিয়ে একটা আগে ছোট সেটা খুব সহজ আর তারপর বড়টা

সেটায় একবার খ্যাচ করে লাগল তাই দেখলাম ছোড়ে গেছে আর একটু একটু রক্ত তাই বাতরুমেতো ডেটোল ছিল ডেটোলে লাগে না কিন্তু টিনচারাইডিনে লাগে তাই ডেটোলি দিলাম। আর তখখুনি দৌড়ে দেখলাম জেঠ প্লেনটা খুব জোরসে চলে গেল বাবা যখন গেল জেঠে তখন দমদমে আমি গেলাম। আর বাবা লনডন থেকে একটা ইলেকটিক সেভ আনল সেটা নিজের আর আমার জনে জুতো দুটো আর একটা আসট্রেনট সেটা খেলার কিন্তু খুব বড় সেটা তো রনিদা খারাপ করে দিল। তারপর যাই আর কি একটু অংকটংক করি।

* * *

আমি আবার আজকে ডাইরি লিখছি। আমার ছররা ফুরিয়ে গেছে আর পায়রাটার গায়ে কেন লাগলো না নিশ্চই বোন্দুকটা বাজে তাহালে। আমি ভাবছি এটাকে ফেলেই দেবো তাহলে। দাদার, ড্রয়ারে আজ একটা দেখলাম টেক্কা দেসলাই তাহালে দাদাতো সিগারেট খায় নিশ্চই নাহালে কেন দেসলাই। কিন্তু দাদা আসেনি কোথায় গেছে ভগবান জানে কি বোধয় ভগবানো জানে না। যদি এবার মা যদি যায় তাহালেই মুশকিল একবার কাল রাততিরে মা বল্লেন যে চলে যাবেন বাবাকে আমি তো দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম একটু তাই জেগেছিলাম চোখটা জোরসে বন্ধো করে তাই মা জানে পিকুতো ঘুমাচ্ছে আর বাবাও ভাবছিলেন তাই তাই ওরা খুব জোরসে কথা বলছিলেন। এখন বাড়িতে আমি আর দাদু খালি আর ওনুকুল বোধয় নিশ্চয়ই তাস খেলছে আর তাই বাড়ির ভিতরে আর কেউ নেই খালি আমি আর দাদু। দাদু নিচে থাকে দাদু ডকটার বেনারজিতো বলেছিলেন সিড়ি দিয়ে ওঠা না দাদুরত কনোরারি থমবোসি তাই। দাদুর তাই একটা ঘণ্টা সেটা নিয়ে যদি টিং টিং টিং টিং টিং করলেই সোনা যায়। আজ একবার সুনলাম দাদু বাজাচ্ছে তখন আমি জালনা দিয়ে থুতু ফেলছিলাম থুক থুক থুক যাতে অনেকদূর যায় আর তখখুনি টিং টিং টিং শুনলাম আর তখখুনি

বুঝলাম যে এটা দাদু তখন আমি আরো চারটা থু থু ফেললাম একটা পাচিলেরো ওদিকে। আর তারপর ভাবলাম যে যাই দাদু ডাকছে। আর গেলাম সিড়ি দিয়ে দুম দুম কাঠের তো সিড়ি তাই দুম দুম আওজ হয়। গিয়ে দেখি চুপচাপ দাদু সুয়ে আছে আর কিন্তু ঘুমোচ্ছে না তাই বল্লাম দাদু কি বেপার কিন্তু দাদু কিন্তু কিছু বল্লনা খালি উপরের দিকেই দেখছে। পাখিটার উসা ফানটার দিকে দাদুর ঘরেই খালি উসা সবিতো জিই-সি আর তখখুনি আবার টেলিফোনটা সুনলাম বাজলো তাই দৌড়ে এসে উপরে এলাম তখন অনেকবার বেজেছে বোল্লাম হ্যালো আর শুনলাম মিস্‌টার সারমা হায় আমি তখখুনি বল্লাম সারমাটারমা নেই হায় রং নাম্বার বলে কাড়াক করে রেখে দিলাম। আর তারপর দৌড়েতো খুব হাপিয়েছি তাই সোফার গিয়ে সুলাম আর পাটা তুলেই দিলাম মাতো নেই তাই পাটা তুলেই দেখলাম ময়লা কিন্তু মা তো নেই। আর এখন আবার আমার বিছানাতে লিখছি ডাইরি আর পাতাই কিন্তু নেই এখন আর কেউ নেই খালি আমি আর দাদু আর একটা খালি মাছি আছে খালি খালি আসছে, আর জ্বালাতোন ভারি বদমাইস মাছিটা আর বাস এইবার পাতা শেস খাতা শেস বাস শেস।

বিপ্লব ও রাজমোহন

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

রাজমোহন যে এতদিন সুইসাইড করেনি তার কারণ মাত্র একটা। কারণ এই যে সে একটা রিভলবার সংগ্রহ করতে পারেনি। সংগ্রহ করতে পারেনি বল্লে ঠিক বলা হয় না। একটা রিভলবার, বলা উচিত, তার হাতে এসে যায়নি। যার-পর-নেই এফর্টলেশ ছিল তার জীবন, বিনা চেষ্টায় সে এতকাল বেঁচে থেকেছে—অসুখে, অ্যাকসিডেণ্টে বা ভিটামিনের অভাবে ৬০।৬১ নাগাদ মরে যাবার আগে পর্যন্ত সে বিনা চেষ্টায় বেঁচেও থাকবে, মানে, ততদিন পর্যন্ত, চেষ্টাবিনা যদি না একটা রিভলবার তার হাতে উঠে আসে। এন, এন, কুণ্ডুর দোকানে সে একবার নিশ্চয়ই যাবে, যদি যেতে হয়। এটা ক্যাজুয়াল ব্যাপার, কেন পারবে না যেতে? যদি রিভলবার পায় ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে লোড করার। লোডেড পাবে এতটা আশা করা তার পক্ষেও অন্যায়। এই যে সেবার সাপ বেরুল বাগানে, না ঠিক বেরোয় নি, সরু ডালে লেজ আটকে দোল খাচ্ছিল সাপটা। নতুন শীতের রোদে লাল হয়ে উঠেছিল তার মাথা, নাকি অগ্নি রাঙাই ছিল সেটা, তা আজ রাজমোহন বলতে পারে না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেদিন একটা লাঠি পাওয়া গেল না তাদের বাড়িতে, তা যদি লাঠিই না থাকে তো রাজমোহন করবেটা

কী। অগত্যা, সে ও রমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেজের নাড়ায় গাছ থেকে শেষক'টি শিউলি ঝ'রে পড়তে দেখল। আ, গাছতলা ভরে গিয়েছিল ফুলে।

সে চায় শুধু ঘোড়াটা টিপতে, রাজমোহন। সে দাঁড়িয়ে করবে, মুণ্ডু পাদ্রীদের 'আমেন' বলার সময় যেমন ঈষৎ ঝুঁকিয়ে, কপালে নলটা ঠেকিয়ে রাখবে, নল ঠাণ্ডা, ৪ থেকে ৬-মুহূর্তের মধ্যে সে সটান মেঝেয় পড়ে যাবে আশা করে। পিস্তলের শব্দ শুনতে পাবে, দূরত্বকে শব্দের গতি দিয়ে ভাগ করে দেখেছে রাজমোহন। আশা তো করে ততক্ষণ চেতনা থাকবে ও মাথায় কোনো আঘাত পাবে না। তবে মাথা, বিশেষত মাথাটা তার খুব জোরে ঠুকে যাবে মেঝেয়, নিশ্চিত একটু ফুলেও থাকবে সেখানটা, যেমন এ ক্ষেত্রে প্রায়ই ফুলে থাকে? না, দরজায় সে খিল দিয়ে রাখবে না। ধাক্কাধাক্কি....সে বড় বিশ্রী!

তো, ঐ কপালে রিভলবার, এটা একটা ফিক্সেশানের মত হয়ে গেছে রাজমোহনের, 'অনন্যোপায়' শব্দটা তার ক্ষেত্রেই এখন প্রযোজ্য। কেননা, অন্য উপায় নেই যার, সে-ই তো অনন্যোপায়? রাজমোহনের অন্য-উপায় নেই।

এ নয় যে বিলিতি ছবি দেখে দেখে বা বয়স হবার পর থেকে বাঙলার তুলনায় ইংলিশ কেতাব বহু বেশি পড়ার জন্যেই রাজমোহন উপায়-ব্যাপারে এমন নাচার। রোহিণী এ্যাটেমপ্ট করেছিল হরিদ্রাগ্রামের বারুণি পুকুরে, ১৬বছর বয়সে প্রথম পাঠের সময় স্বয়ং গোবিন্দলাল হয়ে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে সর্বশেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সে, রাজমোহন, স্বচক্ষে দেখেছিল জল কাচের মত স্বচ্ছ। জলের তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। স্ফটিকমণ্ডিত, হৈম প্রতিমার মত রোহিণী জলতলে শুয়ে আছে। সন্ধ্যার জলে তার কলসী ভেসে যাচ্ছে। আরো ১৬-বছর পরে সহসা-একদিন কোনো একদিন, শুধু-ঐ, কেবল ঐ-অংশটুকু পুনরায় পাঠ করার প্রথম প্রয়োজন হয় রাজমোহনের।

তখন মাঝরাত। তখনো টুকুন রমার পেটে নড়ত। গলা থেকে সন্তর্পণে রমার হাত নামিয়ে রেখে সে উঠে পড়ে ও পাশের ঘরে তার ছোট্ট কালো উরুসমান বুককেসটির দিকে এগিয়ে যায়। উপিন্দর নামে এক ছুঁতোর তাদের বেনেটোলার পৈতৃক বাড়ির সামনে রোজ র‍্যাঁদা ঘষত। তাকে দিয়েই সেল্‌ফটি করিয়েছিল রাজমোহন। সমস্ত মাপ বলে দিয়েছিল ও ডিজাইন এঁকে দিয়েছিল। এটি ছিল উপিন্দরের তৈরি প্রথম আসবাব। সে পারিশ্রমিক নিতে চায়নি। পায়াগুলোতে রাজমোহন লাগিয়ে দিয়েছিল পিতলের উজ্জ্বল শৃ।

সেই থেকে শুরু। ১৬-বছর পরে টেবিলল্যাম্পের নিচে প্রয়োজনীয় অংশটুকু পুনরায় পাঠ করতে গিয়ে এবারো রাজমোহন ছাখে রোহিণী সেই একইভাবে জলের নিচে জল আলো ক'রে শুয়ে আছে। তফাৎ শুধু এই যে, হায়, এবার সে পরবর্তী ষোড়শ পরিচ্ছেদ পড়ে দেখার কোনোরূপ বা বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করেনা, যেখানে, রোহিণীর রক্তকুসুমকান্তি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধ'রে, বড় বড় ফুঁ দিয়ে, গোবিন্দলাল মুমূর্ষুর হৃৎস্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। বরং ভাসমান কলসী এবার তার অত্যন্ত ভোঁতাভাবে ছত্তিশগড়ী গান-এর দু'টি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে যায়। মনে না পড়ে যাবে কোথা, সে ইতিমধ্যে, ঐ ১৬-বছরে, বিষ্ণু দে পড়েছিল।

এ-রকমভাবে প্রতিটি পদ্ধতিই সে বিবেচনা ও পুনর্বিবেচনা ক'রে দেখেছে, পটাসিয়াম থেকে শুরু ক'রে রিস্টের শিরা কচ্‌ করে কেটে গরম জলে ডুবিয়ে-রাখা, কটা বা। কী যেন নাম ছিল মুদিটার.... আলাব্রেশট গ্রেফ! হ্যাঁ, গ্রেফই তো। সেও প্রায় ১০।১২ বছর হতে চলল যখন দোকানি নেই অথচ থরেথরে সাজানো জিনিশ এমন দোকানে বালক অসকারের হাত ধরে ২৪-বছরের যুবক রাজমোহন নীরবে প্রবেশ করে ও দরজা ঠেলে সংলগ্ন গুদামে প্রথম ঢোকে। পাল্লা-খোলা আয়তাকার আলো গিয়ে পড়েছিল প্রায়ান্ধকার গুদামের মাঝবরাবর খালি ফলের বাক্স পর্যন্ত, আলো বাক্সর ওপর গ্রেফের

বুটসুদ্ধ, গোড়ালি জড়িয়ে ধরেছিল। বালক অসকার মনে করেছিল গ্রেফ বুঝি বাক্সর ওপর দাঁড়িয়ে লেংচে তাক থেকে কিছু পাড়ছে। কাছাকাছি গিয়ে প্রথমে সে ছাখে বাক্সর ওপর বিছিয়ে-রাখা খালি পেঁয়াজের ক'টি থলে, তারপরেই বস্তা ও জুতোর ডগার মধ্যে ফাঁক টুকু তার চোখে পড়ে। আপাদমাথা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল ঐটুকু ছেলেটার, মুখ শুকিয়ে এতটুকু, গোড়ালি থেকে ইঞ্চি-ইঞ্চি ক'রে তারা, সে ও অসকার, একসঙ্গেই তো ওপরের দিকে তাকিয়েছিল। যুদ্ধপূর্ব পোল্যাণ্ডের ডেনজিগ শহরের মুদি আলব্রেশট গ্রেফ-এর অন্ধকার অবয়ব অনুভব করেছিল।

একযুগ পরে একদিন র‍্যাক থেকে বইটি আবারো টেনে বের-করার তার প্রয়োজন হ'ল, কাঁপা ব্যগ্র হাতে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ ওল্টাতে পাল্টাতে থাকে, পাতায় পাতায় তার সে কী খোঁজাখুঁজি। অবশেষে পায়। ৩১৪-পাতায় আজো, ১০-বছর পরে, সব অবিকল তেম্নি, শরতের অতিরিক্ত আলো জড়িয়ে ধ'রে আছে গেফের পা-ছু'খানি, হাঁটু পর্যন্ত কালচে সবুজ মোজা, গ্রেফ যাতে গার্টার লাগাতে ভোলেনি! ডানহাতে বুকের কাছে বাগিয়ে ধরে আছে তার ধুলি-মলিন ফেল্টের হ্যাট, সে ছাখে। কিন্তু হায়, এখন সেই বালক অসকার আর নেই। এখন সে একা। এবার পড়ে তার কিছুই মনে হয় না। ৩১৪-পাতায় আজো ঝুলছে, একদিন ছিল যখন, যা দেখে, সে ভয় পেয়েছিল। আজ ভয় পায়, আর ভয় পায় না এই দেখে। আজ কান্না পায়।

রেলবাঁধের ওপর মর্নিং-স্কুল যাবার পথে অতি প্রত্যুষে দূর থেকে তারা, সে ও বেচু, দেখতে পেয়েছিল অস্ফুট ভিড়, শুনতে পেয়েছিল তার আবছা কোলাহল। তখনো পুলিশ আসেনি। তবু ভিড় ঠেলে লাইনের ধারে ধড় ও কাটামুণ্ডু দেখার সাহস তাদের হয়নি। তারা স্কুলের পথ ধ'রে এগিয়ে যায়। স্লিপারের ওপর ঘন রক্তের ফোঁটা পড়ে থাকতে দেখে সে ভেবেছিল রাতের মালগাড়ি থেকে চালানি

ভেড়া কি শুয়োরের মাংসের রক্ত, বস্তুত অনেকটা দূরে লাইনের ধারে মেজদার কনুই-থেকে-কাটা নীল ও কর্কশ হাত দেখেও সে চিনতে পারে নি। "কিছু বুঝতে পারছি না মাইরি," এডেন বন্দরে কেনা মহার্ঘ রিস্টওয়াচের রক্তাক্ত কাচে কান পেতে রেখে বেচু বলেছিল ; অর্থাৎ এখনো চলছে কি না। আজ আর জানার উপায় নেই।

রাজমোহনও ছুঁয়ে দেখেছিল বৈকি। হ্যাঁ, রাজমোহন, রাজমোহনই তো। রাজমোহন ছুঁয়েছিল! সে যে প্রায় মিনিটদুই ধ'রে, কিছু না-জেনে, অবুঝ সে চেপে ধ'রে বসেছিল তার দাদা লেফটেন্যান্ট কিশোরীমোহনের কাটা হাত, মূলে মূলে টের পেয়েছিল শটসার্কিটের শিউরানি, যে-হাড়গুলো নরম হয়ে এসেছিল, সে তো তারই। সেদিনের সেই মুহুর্মুহুঃ ও উপর্যুপর হৃৎস্পন্দনগুলির একটি, মাত্র একটির জন্যে আজ সে কিনা দাম দিতে পারে। ওওও রাজমোহন!

৩১৪-পৃষ্ঠায় গ্রেক আজো তেম্নি মানানসই ঝুলে রয়েছে, অবশ্য মেজদা আর তেমনভাবে লাইনের ধারে পড়ে নেই। পনের পরিচ্ছেদে রোহিণী কিন্তু জল আলো ক'রে শুয়ে আছে। জলের তলায় তাকে মানায় না, রাজমোহনকে, সে ভেবে দেখেছে। সে রোহিণী নয়। রোহিণীকে মানায়। সে গ্রেক নয়। সে রাজমোহন। আত্মহত্যার উপায়-ব্যাপারে তার আর-কোনো অনুসন্ধান নেই। নাআ!

বিশেষত, এই ব্যাপারটায় তো নিঃসংশয় রাজমোহন যে আর-যে যে ভাবেই করুক, করলে, অন্তত তাকে করতে হবে সেফ্‌টি খুলে কপালে নল-রেখে কিছুক্ষণ, তারপর স্রেফ ঘোড়াটা টিপে দিয়ে। আজ কেবল ঘোড়া টিপে-দেওয়াতেই তার একমাত্র বিশ্বাস, আহা, 'বিশ্বাস' কথাটা আজ, অবশেষে, রাজমোহনের ক্ষেত্রে কত সত্যি! রাজমোহন, কপালে নল-রেখে ঘোড়া-টিপে দেওয়াতে, কী? না বিশ্বাস করে। তবে বুঝি একেবারে বিশ্বাসভ্রষ্ট হয় নি রাজমোহন, ভ্রষ্ট হয়ে হারায়নি জীবনের একাগ্রতা, রাজমোহনের বিশ্বাস আছে। রাজমোহন বিশ্বাস করে।

মাত্র বছর পাঁচেক আগেও রাজমোহন এ-রকম ছিল না। তারপর গত ৫-বছরে সে অনেক পাল্টে গেছে। আগে কেমন টানাসুরে ডাকতে পারত ; "ট্যাকসীঈঈঈঈ!" প্রতিটি ক্ষেত্রে মোটা ও গম্ভীর গলা বেরুত। সোজা উঠে ভেতরে গিয়ে ব'সে সে কতবার বলেছে, "বালি চলো।" গেছে। নিউমার্কেটে ফেরৎ দিতে গেছে টিনের স্যুটকেশ। নিয়েছে। এখন নেয় না। পাল্টে গেছে। মানুষ পাল্টায়। পাল্টে-যাওয়া বলতে কী বোঝায় সে এখন বোঝে বৈকি। 'চেতনাধারার ছাপ জীবনকে গড়ে না, জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে'—এটা কোথায় পড়েছিল রাজমোহন? পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে এখন শুধু ঝাপ্সা অক্ষরগুলো দেখতে পায়। কবিতাটি বাঙলা অক্ষরে।

একদিন ছিল যখন রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে রমা তাকে বলেছিল, "রাসকেল!" "আমি এ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়ব। গুণ্ডা লাগাব। তারা প্রাণে মারবে না। হাত-পা ভেঙে আমার কাছে দিয়ে যাবে।" রমা বলেছিল। কত অলীক রিহার্সালই না সে দিয়েছিল রমাকে নিয়ে। অফিসে সীটে ব'সে কলম বন্ধ করতে করতে, না ক'রে, একটানে হড়হড় ক'রে খুলে ফেলেছে রমার গা থেকে শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ ও অন্তর্বাস, জড়ো ক'রে হতচকিত রমার চোখের সামনে ছড়িয়ে দিয়েছে পরিমাণমত স্পিরিট, তারপর ফস্ ক'রে জ্বেলে, জ্বলতে দিয়ে, দূর থেকে দু'টি কাঠি একসঙ্গে নিক্ষেপ করেছে। রমার জামা-কাপড়ের স্তূপে জ্বলতে জ্বলতে কাঠি পড়তে দেখেছে। তারপর ধীরে বন্ধ করেছে পেনের ক্যাপ। ট্রামের জানালার রডে মাথা এলিয়ে দিতে দিতে সহসা দু'হাতে কেবিনের পাল্লা খুলে সে ডেকেছে, "লাহিড়ি!" ঠক্ ক'রে টেবিলে মদের গ্লাস নামিয়ে রেখে লাহিড়ি উঠে এসেছে, জুতোর শব্দ তুলে, যেন পদক্ষেপ গুণে, তারা বাইরে এসেছে। তারপর লাহিড়ির দিকে তার সে কি অপরাজেয় আক্রমণ, আক্রমণ পরের পর, আছাড়ের পরমুহূর্তে আছাড়, নখে-নখ, দাঁতে

দাঁত, রক্তারক্তি, জাপ্টাজাপ্টি, ছোঁড়াছিঁড়ি—তার ধড় রাস্তায় ও মুণ্ডু ফুটপাতের ওপর রেখে পয়েণ্টেড শূ-র টো দিয়ে রাজমোহনকে থ্যাঁতলাতে দেখে তবে রাজমোহন রড থেকে টেনে তুলেছে তার ভারি মাথা। রক্তচাপবৃদ্ধি কাকে বলে সে এ ভাবেই জানতে পেরেছে।

এখন আর লাহিড়ির বিরুদ্ধে তার কিছু নেই। লাহিড়ি এখন সর্বত্র তার প্রশংসা করে বেড়ায়। "রাজমোহনের মত ব্রিলিয়াণ্ট সোল হয় না," লাহিড়ি বলে, "এত সম্ভাবনা ছিল রাজমোহনের।" "কত উন্নতি করতে পারত," লাহিড়ি আরো বলে। আজ তার ৪০ বছর বয়সে রমা অবশেষে তাকে আদর করে। তার সেই গাঁট-ওঠা মেরুদাঁড়া আর নেই, মেদে ভরে গেছে। বিছানায় অন্ধকারে রমা এখন রাজমোহনের হাত খুঁজে বেড়ায় ও রোজই পায়। চুমু-খাওয়া থামিয়ে রমা আজকাল তার সঙ্গে দু'কথা বলে, ব'লে আবার চুমু খায়। "তোমার মাছের রক্ত," প্রীতি, গাঢ়স্বরে রমা তাকে বলে।

আজ এখন অফিস থেকে অন্যান্য দিনের মত সে টানা চলে এসেছে বাড়িতে, বিশেষত গত মাসখানেক ধ'রে এই করেছে, বরং ছুটির একটু আগেই বেরিয়ে পড়ে। রমা গেছে মামার-বাড়ি জলপাইগুড়িতে, রমার স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এল।

অফিস থেকে ফিরে, স্নান ক'রে, কোলের ওপর হাতদু'টি জড়ো ক'রে সে বসে আছে। টেবিলের সামনে, টেবিল ল্যাম্পের গোল আলোর নিচে পড়ে রয়েছে টেবিলের গোলাকার, আরো দূরে আবছা অন্ধকারে তার পরিকল্পনা কোনাকুনিভাবে দেখা যায়। অর্থাৎ বুকসেলফটি।

ল্যাম্পের নিচে বই খুলে বসে থাকে না সে বহুদিন হল। ডাকে তার কোনো চিঠি আসে না আর। গত একমাস ধ'রে তো সন্ধ্যেবেলা রোজই বসে আছে, কই কেউ ডাকতে আসেনি তো। শুধু একদিন এসেছিল। সেই যেদিন ভারতবর্ষের একটি রাস্তা দিয়ে

কুয়াশার মধ্যে 'নিপাত যাক!' 'নিপাত যাক্!' ধ্বনি দিতে দিতে মিলিয়ে গিয়েছিল একটি দ্রুত মিছিল, বাড়ির সামনেই সে তখন, তাতেই অল্পসময়ের জন্যে আটকা পড়ে যায়। সেই সময় সে এসেছিল। ৪নং ফ্ল্যাটের টুবলু তাকে পরদিন বলে। নাম ব'লে যায় নি। "কিছু বলার দরকার নেই, থাকে তো সন্ধেবেলা," সে জেনে গেছে। বলে গেছে, "আমি আবার আসব।" তারপর থেকে রাজমোহন আর সন্ধেবেলা চা খেতে বেরোয় নি। তার গলায় ছিল টাই। সে নাকি ছিল লম্বাপানা। "ভদ্রলোক একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে মেসোমশাই," টুবলু তাকে বলেছিল।

এখন ঐ জ্বলে যাচ্ছে। হু-হু ক'রে জ্বলছে। ঘর ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে যাচ্ছে। নিশ্বাসের চাপে বুক ফেটে যায় দেখে রাজমোহন তাড়াতাড়ি পশ্চিমের মাঠের দিকের জানালাটি খুলে দেয়। মেঘ ডাকাডাকি হচ্ছিল সেই সন্ধে থেকেই, তারপর তুমুল বৃষ্টি, ওদিকের প্রতিবেশী জানালাগুলো এখন শেষরাতে সব বন্ধ। ওদিকে বিদ্যুৎ চমকায়। ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে চোখ বুজে ও দম বন্ধ ক'রে বোর্ডের দিকে অতিকষ্টে এগুতে থাকে রাজমোহন, আন্দাজে সুইচ টিপে সে রেগুলেটারটি ডানদিকের চরমে ঠেলে দেয়। হাওয়ায় দ্বিগুণ অগ্নি জ্ব'লে ওঠে ও জানলা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যেতে থাকে গলগল ক'রে।

বাকি আসবাবপত্র মায় ছবিটবি সবই পাশের ঘরে সরিয়ে রেখেছিল। সে একটি কোন-ঢাকা গগল্‌স পরে নেয় ও হিটপ্রুফ গ্লাভ্‌স। তারপর শিশি থেকে পরিমানমত স্পিরিট বেশ ক'রে ছড়িয়ে দেয় উপিন্দর সিং-এর তৈরি সেল্‌ফ-এর চারিদিকে, বই-গুলোতেও লাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে দেয় কাঠি, যা জ্বলতে জ্বলতে উরুসমান তার একমাত্র বুক-সেল্‌ফের ওপর গিয়ে পড়ে। প্রথমেই ভক্ করে স্পিরিটের ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এসে লাগে, তারপর রঙ-পোড়ার। প্রায় প্রতি বছরেই নিজের হাতে এককোট করে কালো জ্যাপনস পেন্ট লাগিয়ে আসছে রাজমোহন।

নিজে থেকে পুড়বে। নিচের ৯″×৯″ চৌখুপিটিতে ধরত খানদশেক বই—পেপার-ব্যাকের জন্যেই করানো—এটার ডান-দিকের অষ্টম বইটি ছিল অ্যালবার্ট ভন শামিসোর পিটার শ্লেমিল নামে ৯৮ পাতার বইটি। বইটিতে একটি সমুদ্রের বর্ণনা ছিল যার ঢেউসংখ্যা একটিমাত্র, তীরের দিকে এগিয়ে আসছে; ওখানে মার্জিনে 'হৃদয়ের শোক' কথাদু'টি লিখে রেখেছিল রাজমোহন, এখন তাতে আগুন ধরেছে। এ ছাড়া ছিল তাদের বিবাহ-উপলক্ষে পাওয়া দি ট্র্যাজিক সেন্স অফ লাইফ নামে বইটি, নিকুঞ্জ দিয়েছিল। ঠোট পাতলা ক'রে মৃদু হাসে রাজমোহন, নিকুঞ্জ ছাড়া এত রসবোধ আর কার। বইটা পড়ে উপহারদাতাকে সে দু'লাইন কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল, তার মনে পড়ে।

দেখতে দেখতে চচ্চড় শব্দে দ্বিতীয় তাকে ধরে গেল আগুন, এত তাড়াতাড়ি! মাত্র দুটো বই পুড়তে লক্ষ্য করার আগেই! এই তাকটি ছিল সবচেয়ে বড়, লম্বায় সেলফের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত, বাঙলা বই-এর মাপে এর প্রস্থের মাপ দিয়েছিল। টিলা থেকে দেখা শশীর সূর্যাস্তে আগুন ধরে গেল, লবটুলিয়ার জঙ্গলে জ্যোৎস্না রাতে আগুন, হাওয়ার রাতের অগ্নিদগ্ধ মশারি কুয়াশায় দীর্ঘ বল্লম রূপসীদের ভেতর দিয়ে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে উড়ে যাচ্ছে। গগল্সটা চোখে চেপে বসিয়ে কাছে এগিয়ে যায় রাজমোহন। ওটা সেই আর্কটিক অঞ্চলের ভ্রমণকাহিনীটা, নো পাসপোর্ট টু আর্কটিক, ফুটপাতে এক-আধুলি দিয়ে কিনেছিল। বরফ খুঁড়ে জল বের ক'রে স্নানরত সাহেব ট্রাভেলার এখন পুড়ে যাচ্ছে, ওয়েষ্টার্ন ফ্রণ্টের বাঙ্কারে কাটসিন্স্কির ব্যারেলের ওপর ক্লাসিক প্রজাপতিটার ডানায় আগুন—একই সঙ্গে আগুন লেগেছে গীতবিতানের ভেতরে ঝাউপাতাটায়, যা রমা তাকে দিয়েছিল তাদের পরিচয়ের প্রথম দিকে। ঝাউপাতা দিয়ে ভাগ-করা পাতা দুটিতে ছিল মোট ৫॥-টি গান, ডান দিকের পাতার শেষ গানের শেষ লাইনটা ছিল—'টেনে নিয়ে

যেও না সর্বনাশায়।' সে-সময় রমার সব কাজই ছিল ডেলিবারেট।

যাইহোক, দেখতে দেখতে ৩ ও ৪ তাকের ছোটবড় সব খুপরিগুলোয় একসঙ্গে ধরে গেল আগুন, এখন গোটা শেল্‌ফ জ্বলছে.... ধোঁয়ার মধ্যে রুমালে নাক চেপে জালাভরা চোখে এখন আর বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছে না রাজমোহন, রাজমোহনের শরীর বেঁকে যেতে থাকে, সে আরো ঝুঁকে পড়ে। মিল্ক এ্যাজ এ মিরাকল ড্রাগ নামে বইটা ছিল, একটা পাখির বই ছিল, কাকাতুয়া-পায়রা ছিল অনেক, গোরা ছিল। গোরা ? হ্যাঁ, গোরা। নষ্টনীড় ছিল। ভূপতি ফিরে এসে হাত চেপে ধরে বল্ল, 'আচ্ছা চলো।' চারুলতা বলিল, 'না থাক।' 'শ্রেষ্ঠ জার্মান ছোট উপন্যাস' বইটা চক্রধরপুর থেকে অদূরে হেসাড়ির ডাকবাঙলোয় কী-একটা ঝোড়ো তর্কে হেরে গিয়ে পরদিন ফেরার ট্রেনে ভবানী তাকে দিয়েছিল। মডার্ণ লাইব্রেরির আলোকবর্তিকা-হাতে লোকটি এখন আগুনের ভেতর দিয়ে ছুটছে। ভুদেববাবুর ছেলে মুকুন্দর বইটা ছিল কী ?

এ সময় তৃতীয় পায়াটি একদম পুড়ে যায়, সেলফ্‌টা বাঁ দিকে কাৎ হয়ে পড়ে, গেল-গেল, ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তে আগুনের মধ্যে সহসা রাজমোহন তার বাল্যবন্ধু বেচুকে দেখতে পায়। দেখতে পায় বল্লে ঠিক বলা হয়না, বেশ ভুল বলা হয়ে যায়। সরস্বতী পুজোর দিন সকালে হলুদ-ছোপানো ধুতি পরেছিল বেচু, অঞ্জলি দেবে, মায়ের উনুন থেকে কাপড়ে আগুন লেগে যায়। একমাত্র ছেলের চারিদিকে এভাবে মাটি ফুঁড়ে জ্বলে উঠতে দেখে আগুন, তার বিধবা মা প্রথমটা কিছুই করতে পারেননি। পরে কাশীতে দেখা হয়েছিল, "কী করব বাবা, মনে হয়েছিল আগুনের মধ্যে ব্রহ্মাকে দেখেছি," বলেছিলেন। শেষকালে উনি অবশ্য একবালতি জল ছুঁড়ে দেন। বেচু তাতেই মারা যায়।

বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। ঘর ভরে গেছে ছাইএ। উড়ন্ত

পোড়া কাগজের টুকরো বড় সুড়সুড়ি দিচ্ছে মুখেচোখে। রাজমোহন পাখাটা নিবিয়ে দেয়। বিদ্যুতের মুহুর্মুহুঃ আলো ছাইগাদার মধ্যে বারংবার প্রতিভাত ক'রে তোলে একটি বইএর কোনা। এবার উবু হয়ে ব'সে পড়ে রাজমোহন। গ্লাভ্‌স-হাতে ছাই ও কাঠের পোড়া টুকরো সরিয়ে বইটা তুলে নয়। চারটির মধ্যে অগ্নিদগ্ধ দু'টি শূ ওখানেই পেয়ে যায়, শূ-গুলি ছিল পিতলের, পায়াগুলোতে নিজের হাতে পরিয়েছিল রাজমোহন। গনগনে আঁচের কাছে ধরে সে মলাটের পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা করে। পারে না। বিদ্যুতের জন্যে অপেক্ষা করে। ক্ষণকালের মধ্যে জ্বলে ওঠে ক্রমান্বয় ও ঘনঘন বিদ্যুৎ, বিদ্যুচ্চমকের মধ্যে রাজমোহন অস্ফুটস্বরে বলে ওঠে, "এ কী!" তারপর গ্লাভ্‌সের চামড়া দিয়ে রগড়ে নিজের মুখ থেকে গ্রন্থের ছাই তুলতে তুলতে পাশের ঘরে চলে যায়। স্পিরিটের বোতল থেকে ছিটিয়ে এবার বেশ ক'রে ভিজিয়ে নেয় 'দি ট্র্যাজিক সেন্স অফ লাইফ' নামে বইটি, সহজে পোড়ে কখনো, কী বাঁধাই! তারপর দুটো কাঠি একসঙ্গে জ্বেলে ছুঁড়ে দেয়। এটা শিখেছিল ভবানীর কাছে, পুরীর সমুদ্রের ধারে এ-ভাবেই সিগারেট ধরাত ভবানী, একসঙ্গে দু'টি কাঠি জ্বালিয়ে। ভবানীও জোনাথান কেপ প্রকাশিত বইটার ছাপা ও বাঁধাইএর মাহাত্ম্য বরাবর স্বীকার করত।

রাজমোহন সব জানালাগুলি একে একে খুলে দেয়। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। ঘরটা রাতারাতিই সাফ করে ফেলতে হবে। ঘরের আর কিছু-ই পোড়েনি, আগে থেকে এমন সুবিবেচনা ক'রে সেল্‌ফটি রেখেছিল সে। শুধু একটা দেওয়ালে শিলিঙ-পর্যন্ত কাঁচা একস্রে-প্লেটের হাড়পাঁজরের মত আগুনের হল্কা....বাড়িঅলার নামে একপোঁচ কলি করিয়ে ফেলবে নাকি রাজমোহন? রমা আর ২।১ দিনের মধ্যেই এসে পড়বে।

শহীদের মা

সমরেশ বসু

শরীরের মধ্যে যেন কেঁপে উঠল। বিমলা চোখ বুজলেন। তাঁর যেন স্পষ্ট মনে হল, পেটের মধ্যে কী যেন একটা নড়ে উঠল। চোখ বুজে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, পেটের মধ্যে নড়ে ওঠাটা অনুভব করতে চাইলেন। সামনের উনোনে তরকারি চাপানো, চড়বড় করে শব্দ হচ্ছে। জল নেই, এখুনি কড়ায় লেগে পুড়ে যাবে। বিমলা তথাপি নড়তে পারলেন না। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে নিজের গর্ভে যেন কান পেতে রইলেন, আর তাঁর বুকের মধ্যে যেন নিঃশব্দে বাজতে লাগলো, 'বাদল! বাদল রয়েছিস?'...পরমুহূর্তেই তাঁর শরীরটা আর একবার কেঁপে উঠল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগলো। চোখ খুলে উনোন থেকে কড়াটা নামিয়ে দাঁড়ালেন। চোখের দৃষ্টিতে একটা ব্যাকুল অস্থিরতা। বাইরের দিকে কান পেতে কিছু যেন শুনতে চাইলেন। তারপরে দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তরকারিটা ওভাবে ফেলে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে। উনোনের কাছে নামানো কড়াটার দিকে একবার তাকালেন। কিন্তু বিমলা স্থির থাকতে পারলেন না। নষ্ট হয় হোক। কাঁচা থাকুক, ছাই হয়ে যাক। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রান্নাঘরের বাইরে এলেন।

আকাশে ঘন মেঘ। পুবে বাতাস বইছে। উঠোনের এক ধারে

টগর গাছটা বাতাসের ঝাপটায় নুয়ে পড়ছে। এক বছরের শিউলি গাছটাও মাটিতে নুয়ে পড়তে চাইছে। বাড়িটা নিঝুম। কাঠের ফ্রেম, টিনের দেওয়াল, মাথায় টিনের চাল। মনে হয় বাড়িতে কেউ নেই। তথাপি বিমলা যেন পা টিপে টিপে উঠোনে নেমে এলেন। পাশের বাড়িতে কণার মা যেন কাকে কী বলছে। বিমলা ফনি-মনসার বেড়া ডিঙিয়ে সেদিকে একবার দেখলেন। কণাদের বাড়িটা দেখা যায়। লোকজন দেখা যায় না। তিনি চোখ ফিরিয়ে আবার ঘরের দরজা খোলা বাড়িটার দিকে তাকালেন। কারোর কোনো সাড়াশব্দ নেই। বাতাসে তাঁর মাথার চুল কপালে পড়ছে। দূর থেকে দেখলে কাঁচা চুল বলে মনে হয়। কিন্তু পাক ধরেছে। চওড়া সিঁথেয় বাসি সিঁদুরের দাগ। হাতে শাঁখা নোয়া আর বিবর্ণ কয়েক গাছা সোনার চুড়ি। শেমিজের ওপরে খয়েরি পাড়ের সাদা শাড়ি। ময়লা হয়েছে, হলুদের দাগ লেগেছে। প্রৌঢ় বয়সেও, শরীর বেশ শক্ত। মুখের রেখাতেই বয়সটা যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। দেখলে মনে হয় অল্প বয়সে সুশ্রী আর সবল ছিলেন। এখন তাঁর চওড়া শরীর যেন শক্ত আর কঠিন।

বিমলা কয়েক মুহূর্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে সামনের দিকে না গিয়ে রান্নাঘরের পিছনে গেলেন। ফণিমনসার বেড়া ঘেঁসে বাড়ির পিছন দিয়ে এগিয়ে চললেন। ঘরগুলোর পিছন দিকের সব জানালাই বন্ধ। ঘর যেখানে শেষ, কোণে একটা জবা ফুলের গাছ। বিমলা দাঁড়ালেন। সামনে রাস্তা, উত্তর দক্ষিণে লম্বা। কলোনির রাস্তা, পাকা না, ঘেঁস ছাইয়ের রাস্তা। বিমলা উত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। উত্তর দিকের রাস্তা যেখানে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে সেই দিকে তাকালেন। যেখানে মোড়ের এক পাশে কয়েকটা ইট এক জায়গায় এখনো জড়ো হয়ে পড়ে আছে সেইখানটা দেখলেন। ওখানে শহীদ বেদী হয়েছিল। কয়েক মাসের মধ্যে ভাঙতে ভাঙতে গোটা কয়েক ইঁটে এসে

ঠেকেছে। কেউ তুলে নিয়ে গেলেই আর কোনো চিহ্ন থাকবে না। কারা বেদীটা ভাঙলো, ইঁটগুলো কোথায় গেল, কেউ জানে না। বিমলা দেখেছেন, প্রথম প্রথম পাড়ার একটা কুকুর বেদীটার গা ঘেঁসে শুয়ে থাকত। এখন থাকে না। গোটা কয়েক ইঁট ছাড়া এখন আর কিছু নেই।

বিমলা আপন মনে মাথা নাড়লেন। তাঁর ঠোঁট নড়লো। না, বাদল ওখানে নেই। বাদলকে শ্মশানে দাহ করা হয়েছিল। মাস তিনেক আগে, বেদীটা যখন তৈরী হল তখন ওরা বিমলাকে ডাকতে এসেছিল। বাদলের মা বিমলা, শহীদের মা। তাই ওরা ডাকতে এসেছিল, বাদলের বন্ধুরা, পার্টির ছেলেরা। শুধু বিমলাকেই ওরা ডাকতে এসেছিল। এ বাড়ির আর কাউকে না। বাদলের বাবাকে না, বাদলের দুই দাদাকেও না। বাদলের বাবা হরপ্রসাদ অন্য পার্টির লোক। দুই দাদা, কৃপাল আর দয়াল, দুজনেই দুটো আলাদা আলাদা পার্টির মেম্বার। চারজন চার পার্টির লোক। বাদলের দলের ছেলেরা কেবল বিমলাকেই ডাকতে এসেছিল। শহীদের মাকে।

বিমলা গিয়েছিলেন। ওইখানে, ওই একটু দূরে, পশ্চিমের মোড়ে, রাস্তারধারে এখন যেখানে কয়েকটা ইট জড়ো হয়ে পড়ে আছে। শহীদ বেদীর শেষ চিহ্ন। কেন গিয়েছিলেন বিমলা জানেন না। বাদলের পার্টির ছেলেরা এসে বলেছিল, 'মাসীমা আপনি একবার চলুন।' বিমলা গিয়েছিলেন যেন ঘোর লাগা আচ্ছন্নের মত। তার দুদিন আগে আঠারো বছরের বাদলকে ওইখানে কারা পিটিয়ে মেরেছিল। বিমলার চোখের সামনে এখনো স্পষ্ট। ক্ষতবিক্ষত বাদল। মুখে মাথায় শরীরের নানান জায়গায় রক্ত জমাট। নিথর বাদলকে এ বাড়ির উঠোনে ওরা নিয়ে এসেছিল। বাদল সব থেকে ছোট ছেলে। বিমলার শেষ সন্তান, না। তারপরেও দুটি হয়েছিল, বাঁচেনি। বাদলের পরে আর কেউ ছিল না।

নিহত বাদলকে দেখে বিমলা একবার চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন। উঠোনে পড়ে বাদলকে একবার জড়িয়ে ধরেছিলেন। আপন মনেই কেঁদে উঠে বলেছিলেন, 'কে তোকে এমন করে মারল। ওরে বাদল'····উঠোন জুড়ে মানুষের মেলা। কিছুক্ষণ পরে চালিতে করে ফুল ছড়িয়ে মালা জড়িয়ে ওরা বাদলকে নিয়ে গিয়েছিল। হরি বল্ ধ্বনি দেয় নি। শ্লোগান দিয়েছিল। 'কমরেড বাদল জিন্দাবাদ! খুন কা বদলা খুন'···কিন্তু বিমলা আর ভাল করে কাঁদতে পারেন নি। ডাক ছেড়ে কান্না যাকে বলে, তেমন করে কাঁদতে পারেন নি। সময়ে অসময়ে, কাজে অকাজে, হঠাৎ চোখে জল এসে পড়েছে। জল মুছেছেন।

দু দিন পরে ওই বেদীটা তৈরী হয়েছিল। বাদল যেদিন খুন হয়, সেদিন কলোনির স্কুলের মাঠে একটা সভা হচ্ছিল। অন্য কোন দলের সভা, বাদলদের না। সেখান থেকেই কী একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠেছিল। সঠিক কথা কেউ কিছুই বলতে পারে নি। সন্ধের ঘোরে বাদলকে নাকি কারা তাড়া করেছিল। বাদল বাড়ির দিকে দৌড়েছিল। কিন্তু মোড় পেরিয়ে আসতে পারে নি। কেউ বলে বাদল একলা ফিরছিল। ওর খুনীরা আগে থেকেই মোড়ে অপেক্ষা করছিল। আরো অনেক রকম কথা। কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা, বিমলা বুঝতে পারেন না। বাদলের চিৎকারে লোকজন ছুটে গিয়েছিল। যখন গিয়েছিল, তখন সব শেষ। রক্তাক্ত নিহত বাদল ছাড়া, সন্ধ্যের ঘোরে সেখানে আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় নি। পুলিশ এসেছিল। বাদলের পার্টির লোকেরা নাকি কার কার নাম বলেছিল। তাদের কাউকেই কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। হত্যাকারী বলে যাদের নাম করা হয়েছিল, তাদের নামে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তারা এখন সকলেই জামিনে খালাস পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেস চলছে। কেস চলছে অথচ যেন ব্যাপারটা কিছুই না।

বাদল খুন হবার দু দিন পরে শহীদ বেদী তৈরী হয়েছিল। এই দু দিনের মধ্যেও ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়েছে। একটা দোকানঘর পুড়ে ছাই হয়েছিল। কেন, তা বিমলা জানেন না। বিমলা কেন শহীদবেদীর কাছে গিয়েছিলেন তাও জানেন না। গিয়ে একবার দাঁড়িয়েছিলেন। পনের ষোলটা ইট ধাপে ধাপে সাজিয়ে চুনসুরকি দিয়ে গাঁথা হয়েছিল। চুন দিয়ে লেপে সাদা বেদীর গায়ে বাদলের নাম লেখা হয়েছিল। বিমলাকে ঘিরে বাদলের পার্টির ছেলেরা সেই একই শ্লোগান দিয়েছিল, 'কমরেড বাদল জিন্দাবাদ। খুন কা বদলা খুন'....ইত্যাদি। কে একটি ছেলে যেন বাদলের নাম করে কী বক্তৃতা করেছিল। সব কথা বিমলার কানে যায় নি। তিনি আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়েছিলেন। আবার আচ্ছন্নের মতই বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধতে বসেছিলেন। বাড়িতে আর কেউ নেই। হরপ্রসাদ, কৃপাল, দয়াল খাবে, রান্না না করলে চলবে কেন। যেমন আচ্ছন্নের মত গিয়েছিলেন, তেমনিভাবেই এসে রান্নার কাজে লেগেছিলেন। কিন্তু কারোর সঙ্গে কথা বলেন নি। কৃপাল দয়ালের সঙ্গেও না। হরপ্রসাদ নিজে এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। যেন খানিকটা আপন মনেই বলেছিলেন, 'কত দিন বলেছি ওই দলটার সঙ্গে মিশিস না। কথা শুনলে তো।'

বিমলা কোনো জবাব দেন নি। হরপ্রসাদ তবু দাঁড়িয়েছিলেন। একটু থেমে, একটা নিশ্বাস ফেলে আবার বলেছিলেন, 'এখনকার এ সব পার্টি, খুনখারাপি ছাড়া কিছু জানে না। কিন্তু যার গেল, তার গেল, কেউ দেখতে আসবে না। বাদলকে তো আর ফিরে পাব না।'

হরপ্রসাদ চুপ করেছিলেন। বিমলা কোনো জবাব দেন নি। উনোনের দিকে ঝুঁকে বসেছিলেন। হরপ্রসাদ যেন একটা নিশ্বাস ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, 'যাই হোক, মনকে শক্ত কর। এ ছাড়া আর কী করবার আছে। আমার দেরি হয়ে গেছে অফিসে চলে যাচ্ছি। খাবার একদম ইচ্ছা নেই।'

হরপ্রসাদ চলে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর কোন কথা হয় নি। তবে এই তিন মাসে মাঝেমধ্যেই ওই কথাটা বলেছেন, 'মনকে শক্ত কর। বাদলকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না।'

বিমলা সে কথার কোন জবাব দেন নি। সংসারের কথা বলেছেন। দৈনন্দিন জীবনে, কী দরকার, কী আনতে নিতে হবে, এই সব কথা। কিন্তু বাদলের বিষয়ে কোনো কথা বলেন নি। কৃপাল দয়াল কোনো কথাই বিমলাকে বলে নি। কৃপাল চাকরি করে। দয়াল বেকার। ওরা ভিন্ন ভিন্ন দলের লোক। বাড়িতে ওরা নিজেদের মধ্যে কম কথা বলে। গামছা তেল সাবান চান করার কথা বলে, সিনেমা থিয়েটারের কথাও বলে। দলের কথা একেবারে না। খিদে পেলে বিমলার কাছে শুধু খেতে চায়। দোকান বাজার করে দেয়। কী আনতে হবে না হবে, জিজ্ঞেস করে। বাদলের বিষয়ে কোনো কথা হয় না। যেন ওদের ভাই মরে নি। অন্য পার্টির একটা ছেলে মরেছে। হয়তো নিজেদের পার্টির লোকের সঙ্গে কথা হয়। বাড়িতে কোনো কথা নেই।

বিমলা জবা গাছের গা ঘেঁযে ভাঙা বেদীর দিকে দেখছেন। বাদল ওখানে নেই। বাদলকে শ্মশানে দাহ করা হয়েছিল। কিন্তু বাদল আজ বিমলার সারা শরীরে জেগে রয়েছে। আজ উনিশে শ্রাবণ। আজ সেই দিন। এখন এগারোটা বাজে। আঠারো বছর আগে এই দিনে, এ সময়ে বাদল পৃথিবীর মুখ দেখবার জন্য বিমলার পেটে অশান্ত হয়ে উঠছে।

বাড়িতে তখন কেউ নেই। বিমলা একলা। পূর্ণ গর্ভ, যে কোন সময়েই বাদল ভূমিষ্ঠ হতে পারে। এ সময়েই ব্যথা উঠেছিল। ডাক্তার কবিরাজের দরকার ছিল না। বিমলা নিঃশঙ্ক। তিনি সবই বুঝতে পারছিলেন। অভিজ্ঞতা তাঁর শরীরের প্রতিটি অনুভূতির মধ্যে। ব্যথা উঠতেই বুঝতে পেরেছিলেন সেটা নিষ্ফল ব্যথা না।

সময় আসন্ন। আঠারো বছর আগে এই দিনে, এই সময়ে, উপরঝান্তি বৃষ্টি পড়ছিল। একেবারে একলা থাকা উচিত না। বিমলা কোনো রকমে পাশের বাড়িতে কণার মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। ব্যথায় রুদ্ধ চুপি চুপি স্বরে বলেছিলেন, 'দিদি আর সময় নেই।'

কণার মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি সব কাজ ফেলে বিমলার সঙ্গে চলে এসেছিল। কণা তখন ছ' সাত বছরের মেয়ে। তাকে পাঠিয়েছিলেন মেঘুর মা বিধবা বুড়িকে ডাকতে। আজকালকার মত ঢাক ঢোল পিটিয়ে বিমলাদের প্রসব হত না। মেঘুরমা বুড়ি এসেছিল। বিমলাকে দেখেছিল। বলেছিল 'হ্যাঁ আসল ব্যথা। আর বেশি দেরি নেই।'

কণার মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর খালি করে দিয়েছিল। সেই ঘরেই বাদল হয়েছিল। তখন এ বাড়ির চেহারা অন্যরকমের ছিল। টিনের দেওয়াল ছিল না। পাকা মেঝে ছিল না। ছেঁচা বেড়ার দেওয়াল। মাথায় তখনো টিনের চাল, কাঁচা মাটির মেঝে। বিমলা রান্না ঘরে মাদুরের ওপর শুয়ে বসে ব্যথার তীব্রতা সহ্য করছিলেন। কণার মা কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তারও যেন ব্যথা উঠেছিল। বিমলা নিশ্বাস বন্ধ করে ব্যথা খাচ্ছিলেন। দাঁতে দাঁতে চেপে স্থির থাকবার চেষ্টা করছিলেন। তার মধ্যেও ভেবেছিলেন, কী আসছে। ছেলে না মেয়ে। হরপ্রসাদের সাধ ছিল মেয়ে হয় যেন। হরপ্রসাদের সাধ, বিমলারও সাধ। দুই ছেলের পরে একটি মেয়ে। কিন্তু তাঁর শেষ গোঙানির সঙ্গে, যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সে ছেলে। মেঘুর মায়ের হাত, বিমলার পেটে চেপেছিল। তখনো ফুল পড়ে নি, আর একটি ব্যথার অপেক্ষা! তার মধ্যেই, বিমলা লহমায় দেখে নিয়েছিলেন। রক্তে আর লালায় মাখানো একটি ছেলে। তখনো গলায় কান্না ফোটে নি। ছোট খাটো এক আধটা গোঙানি মাত্র। ফুল পড়ার পরে, প্রথম গম্ভীর স্বরে কেঁদে উঠেছিল, 'ওঁয়া ওঁয়া।'

মেঘুর মা নাড়ি কাটতে কাটতে বলেছিল, কত বড়। যেন পেট থেকেই এক বছরের ছেলে বেরুলো। দেখে মনে হচ্ছে, মাতৃমুখী।'

মাতৃমুখী। বিমলা আবার তাকিয়ে দেখেছিলেন। বুঝতে পারেন নি। মেঘুর মায়ের কোলের দিকে তাকিয়েছিলেন আর হঠাৎ-ই নিজের কোলটা বড় ফাঁকা মনে হয়েছিল। মেয়ে-না-হোক, নাড়ী ছেঁড়া ধন। কোলে নিতে ইচ্ছা করেছিল। সে কথা বলতে পারেন নি। মনে মনে বলেছিলেন, 'মাতৃমুখী ছেলে সুখী হয়।'
বাইরে তখনো মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। কণার মা বিমলাকে সাব্যস্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। দুধ গরম করে খেতে দিয়েছিল। মেঘুর মা নতুন শিশুকে গরম জল দিয়ে ধুয়ে মুছিয়ে, কাঁথায় মুড়ে বিমলার কোলে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল 'বুঝেছি রে বাপু। জলের তোড়ে এলি, বাপের যেন এরকম তোড়ে টাকা আসে। কী বাদুলে ছেলে বাবা, জগত ডোবানো বিষ্টি মাথায় করে এল।'

জগৎ সংসার ভাসানো বৃষ্টিই বটে। উঠোনটা জলে থৈ থৈ করছিল। তখন রান্না ঘরের অবস্থা-ই বা কী। এখন তো অনেক পাকা পোক্ত ব্যবস্থা। তখন মাথার ওপরে ক্যানেস্তারার গোঁজামিলের চাল। ঘরের এখানে সেখানে টপ টপ করে জল পড়ে। বিমলা একটা কোন বেছে নিয়ে, ছেলেকে বুকের কাছে ঢেকে শুয়েছিলেন। কণার মা চলে গিয়েছিল। তারতো সংসারের কাজ। মেঘুর মা ছিল। তার ওটাই কাজ। নবজাতককে বুকের কাছে নিয়েও, কৃপাল দয়ালের কথা বিমলার মনে পড়েছিল। ওরা তখন স্কুলে গিয়েছিল। বিমলার দুশ্চিন্তা, যা দুরন্ত তাঁর ছেলেরা। বৃষ্টি মাথায় করে স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়েছে কী না কে জানে। বৃষ্টিতে ভেজার ইচ্ছে হলে, মাষ্টারমশাইরা কি আর ধরে রাখতে পারবে। হরপ্রসাদের কথাও মনে পড়েছিল। অফিসে যাবার ইচ্ছা ছিল না। বিমলাই জোর

করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হরপ্রসাদ বাড়িতে থেকে কী করবে। খানিকটা ছটফট করা ছাড়া করার কিছুই নেই। তার চেয়ে অফিসের কাজে থাকলে ভাল থাকবে। এদিককার ব্যবস্থা যা করবার বিমলাই করে রেখেছিল। কণার মাকে খবর দেওয়া। মেঘুর মাকে ডেকে নিয়ে আসা। এমন কিছু হাতী ঘোড়া ব্যাপার তো নয়। পোয়াতি মেয়েমানুষ ছেলে বিয়োবে, তার জন্য পাড়া দূরের কথা, বাড়ি মাথায় করারও কিছু নেই। ভালভাবেই সব হয়ে গিয়েছিল। কাক পক্ষীতেও টের পায় নি। ঝমঝম বৃষ্টির শব্দে আশেপাশের কেউ নতুন ছেলের কান্নাও শুনতে পায়নি।

বিমলা নবজাতককে স্তন চেনাবার চেষ্টায় মুখের কাছে ছুঁইয়ে দিচ্ছিলেন। প্রথমটা একটু ধরিয়ে দিতে হয়। শিশুর মুখের দিকে চেয়ে ভেবেছিলেন, এটি আবার কেমন হবে, কে জানে। সকলের বেলাতেই এই কথাটি মনে হয়েছে। কৃপাল দয়ালের বেলাতেও। সব মায়ের কি এমনি মনে হয়। কে জানে। কৃপাল দয়ালের পরে আরও ছুটি হয়েছিল। তারা বেঁচে নেই। এটি কী করবে, কে জানে। ভাবতে ভাবতে, বুকের কাছে আরও চেপে ধরেছিলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। মেঘুর মা বলেছে, মাতৃমুখী। বলেছে খুব দুষ্টু হবে এই ছেলে। মাতৃমুখী ছেলে কেবল সুখী হয় না দুষ্টুও হয়। কী দুষ্টমী করবে? বিমলাকে জ্বালাতন করবে?

বিমলা মনে মনে হেসেছিলেন। কোন ছেলেটা না জ্বালিয়েছে। কৃপাল দয়াল যে রকম দুরন্ত, এও সেইরকম হবে। একই গাছের ফল তো। তা হোক, ছেলেপিলে তো দুরন্ত হবেই। তার জন্য বকুনি খাবে, মার খাবে, আবার ভুলেও যাবে। কৃপাল দয়াল যে-রকম করে। ওদের দৌরাত্ম্যে এক এক সময় অস্থির হয়ে পড়েন। তখন না মেরে উপায় থাকে না। এও দুষ্টুমি করলে মার খাবে।

নবজাতক কেঁদে উঠেছিল। বিমলা মনে মনে হেসেছিলেন,

বলেছিলেন, 'এখন তো মারছি না, কাঁদছিস কেন। বড় হ, তখন দেখব।'

বলতে বলতে বুকের কাছে তুলে স্তন গুঁজে দিয়েছিলেন। সদ্যোজাত শিশু তা নিতে পারেনি। তখন দুধেতে পলতে ভিজিয়ে মুখে দিয়েছিলেন। চুষে চুষে খেয়েছিল। বিমলা কোনো কথাই ভোলেন নি। এই তো যেন সেদিনের কথা। প্রত্যেকটা কথাই স্পষ্ট মনে আছে। কৃপাল দয়ালের কথাও মনে আছে। ওরা জন্মেছিল পদ্মার ওপারে, নিজেদের ভিটেয়। বাদল এই বাড়িতে জন্মেছিল।

বৃষ্টি একটু ধরতেই, কাক ভেজা হয়ে, কৃপাল আর দয়াল বাড়ি এসেছিল। আঁতুড় মানতে চায় নি, আগেই ভাইকে দেখতে এসেছিল। দয়াল তো বায়না ধরেছিল, সে ভাইকে কোলে নেবে। মেঘুর মা ধমক দিয়েছিল। বিমলা সস্নেহে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে নিরস্ত করেছিলেন। বলেছিলেন 'কাল চান করবার আগে ভাইকে কোলে নিস।'

সন্ধ্যেবেলা হরপ্রসাদ বাড়িতে এসে, আগেই আঁতুড়ের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গলা খাঁকারি দিয়েছিল। দরজাটা বন্ধ ছিল। বিমলা বুঝতে পেরে মেঘুর মাকে বলেছিলেন, 'কৃপার বাবা এসেছে, দরজাটা খুলে দাও।'

মেঘুর মা দরজা খুলে দিয়েছিল। হরপ্রসাদ বিমলাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কেমন আছ?'

বিমলা সে কথায় কোনো জবাব দেননি। হ্যারিকেনের আলোর সামনে ছেলেকে তুলে ধরেছিলেন। হরপ্রসাদ গম্ভীরভাবে শব্দ করেছিল, 'হুম্!' তারপরে হঠাৎ হেসে বলেছিল, 'রূপবান ছেলে হয়েছে মনে হচ্ছে। এ ব্যাটা বাপের মত হয়নি।'

বিমলা ওসব কথা ভোলেন না। সব কথা মনে থাকে, আছেও। হরপ্রসাদ কেন ও কথা বলেছিল, তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। একবার হরপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বাপের খুশি মুখ

দেখলে বোঝা যায়। হরপ্রসাদ খুশিই হয়েছিল। বিমলা একটু গর্ব বোধ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, 'এই মুখ দেখে, হরপ্রসাদ এখন আর মেয়ের কথা মনে রাখেনি।'

মেঘুর মা বলেছিল, 'রূপবান তো হবেই, মাতৃমুখী যে।'

তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। হরপ্রসাদ রান্না ঘরের দরজায় ছাতা মাথায় দিয়েই দাঁড়িয়েছিল। নামটা তখনই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, 'ব্যাটা জবর বাদুলে একেবারে বাদলা।'

ইতিমধ্যে বীণা এসে পড়েছিল। কলোনীরই বিধবা মেয়ে। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। বিমলার প্রসব হলে, সে রান্না-বান্না করবে। বীণা বড় ঘরের বারান্দায় রান্না চাপিয়েছিল। হরপ্রসাদ কৃপাল আর দয়ালকে নিয়ে গল্পে মেতেছিল। সেদিন আর ওদের পড়তে বসতে বলা হয় নি। বিমলা সবই শুনতে পাচ্ছিলেন! এদিকে মেঘুর মা নানানথানা বকবক করছিল। বিমলা বুকে সন্তান নিয়ে, কেমন একটা নিবিড় স্বস্তি বোধ করছিলেন।

আজ সেইদিন। আঠারো বছর আগের সেই দিন, এখন বেলা এগারোটা। চুপ করে বসে, চোখ বুজলে, বিমলা চমকে চমকে উঠছেন। পেটের মধ্যে যেন কিছু নড়ে চড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল! ঘরের কোণে, জবা গাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন বিমলা। ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে তাকিয়ে চোখ বুজলেন। হ্যাঁ, আবার, আবার মনে হচ্ছে, পেটের মধ্যে ভ্রূণ নড়ছে। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে বুকের কাছে হাত দুটো জড়ো করলেন। এ আবার কী, এরকম মনে হচ্ছে কেন। সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা তাঁর অনেককাল গত হয়েছে। আজ কে এমন করে তার গর্ভের মধ্যে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। বাদল কি তাঁর শরীরের মধ্যে মিশে আছে। তিনি মনে মনে ডাকলেন 'বাদল বাদল।'

'মা। ও মা।'

কৃপালের গলা। কৃপাল ডাকছে। বিমলা সাড়া দিলেন না, নড়লেন না। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখ শক্ত হয়ে উঠল। সমস্ত শরীরটাই শক্ত হয়ে উঠল। দৃষ্টি ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে। ছেলেদের ডাকে কোনদিন সাড়া দিতে ভোলেন না। আজ বিমলার মুখে সাড়া নেই। আজ তিনি সাড়া দেবেন না।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, আস্তে আস্তে তাঁর মনে পড়ল, কৃপাল দয়াল ভাইকে নিয়ে ছেলেবেলায় কেমন খেলা করতো। কৃপাল দয়াল পিঠোপিঠি ছিল। বাদলের বয়স কম ছিল। মাঝখানে দুজন মারা গিয়েছিল। দয়ালের প্রায় সাত বছরের ছোট বাদল। বাদলকে ওরা কোলে করে বেড়িয়েছে। মায়ের কাজের সময় দেখাশোনা করেছে। ছোট ভাইটিকে দুজনেই ভালবাসতো। কাড়াকাড়ি করে খেলতো। ছোট ভাইকে কিছু না দিয়ে দুজনে মুখে তুলতো না। পিঠোপিঠি হলে তা হত না। কৃপাল দয়ালের তো রোজ ঝগড়া মারামারি লেগেইছিল। ওরা দুজনে ছিল সমানে। ওদের মারামারি থামাতে বিমলাকে লাঠি তুলতে হত। হরপ্রসাদও শাসন করতো। কিন্তু বাদলকে নিয়ে দুজনেরই কাড়াকাড়ি। সব কথাই মনে আছে বিমলার। বাদল যখন কথা বলতে শিখেছিল, তখন কৃপাল দয়াল জিজ্ঞেস করত, বাদল কাকে বেশি ভালবাসে। কার কাছে থাকতে চায়। বাদল দুজনের কাছেই থাকতে চাইতো। লোভী শিশু, সে বুঝতে পারতো, কাউকেই সে হারাতে চায় না। দুই দাদারই মন জুগিয়ে কথা বলত। বিমলা আড়ালে মুখ টিপে হাসতেন, মনে মনে বলতেন, 'এক ফোঁটা ছেলের চালাকি দেখ।'

হরপ্রসাদও ছোট ছেলেটিকে ভালবাসতো। কৃপাল দয়াল যত

না আদর কাড়তে পেরেছে, কোলে চাপতে পেরেছে, বাদল সব কিছুই বেশি পেয়েছে।

কিন্তু সে সবই ছেলেবেলার কথা। তখন সংসারের চেহারা ছিল অন্য রকম। হরপ্রসাদ চাকরি করতো, আর প্রকাশ্যেই রাজনীতি করতো। অবসর সময়ে নিজের দল নিয়ে মেতে থাকতো। বিমলার তাতে কোনোদিন কিছু যায় আসেনি। পুরুষ মানুষ কত কী নিয়ে থাকে। মেয়েদের সে সব ভাবতে গেলে চলে না। বিমলা বরং মনে মনে খুশিই ছিলেন। হরপ্রসাদ দশজনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সভা সমিতি করছে। তবু নেশা ভাঙ করে বাজে আড্ডায় তো সময় নষ্ট করে না। টাকাও নষ্ট করে না। সবাই হরপ্রসাদদা বলে ডেকে নিয়ে যায়। পাড়ার একজন গণ্যমান্য লোক। বাইরে বাইরের মত, সংসারে সংসারের মত। স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে গরীব মধ্যবিত্তদের জমজমাট পরিবার।

আস্তে আস্তে কৃপাল দয়াল বড় হয়ে উঠতে লাগলো। ওদের পিছনে বাদলও যত বড় হয়ে উঠতে লাগলো সবাই যেন কেমন বদলে যেতে লাগলো। বাদল দাদাদের সঙ্গ আর পাচ্ছিল না। ওরা তখন বাইরের জগত নিয়ে ব্যস্ত। ওদের কোথায় কী দল, বন্ধু, সে সব নিয়েই ব্যস্ত। বাড়িতে ওদের দেখা পাওয়া ভার। বাদলও ওর জগত খুঁজে নিয়েছিল। ওরও বন্ধু ছিল। বিমলা এসব দেখেছেন, বিশেষ করে কখনো কিছু ভাবেন নি। বরং মনে হয়েছে, এ রকমই হয়। সকলেরই হয়। বড় হচ্ছে তো সব। সকলেই যে যার আলাদা পথে ফিরছে।

কেবল হরপ্রসাদ বিরক্ত হচ্ছিল। কখনো রাগ, কখনো ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছিল। বিশেষ করে কৃপাল আর দয়ালের ওপরে। বিমলা হরপ্রসাদের কাছেই শুনতেন, কৃপাল দয়াল কলেজে ঢুকে নাকি রাজনীতি করছে। ছাত্ররা সবাই করে। কৃপাল দয়ালের কী দোষ বিমলা ভেবে পেতেন না। একটা কথা বুঝতে পারতেন,

হরপ্রসাদ যে রাজনীতি করে কৃপাল দয়াল তা করে না। বিমলা বলতেন, 'কলেজে ওরা কী করছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ।'

হরপ্রসাদ রেগে জবাব দিতেন, 'ওসব রাজনীতির নামে গুণ্ডামি। আমার পয়সায় কলেজে পড়ে ওসব চলবে না। তোমার ছেলেদের এ কথা জানিয়ে দিও।'

হরপ্রসাদের কথার ধরনে বিমলা মনে মনে রুষ্ট হতেন। আবার ভাবতেন, বাবা যে রকম বলে. ছেলেদের সেরকম চলাই উচিত। তাহলে আর সংসারে কোনো গোলমাল থাকে না। কৃপাল দয়ালকে তিনি বলেছেন, 'কলেজে যাস্ পড়তে, সেখানে আবার ওসব কী। তোদের বাবা পছন্দ করে না।'

ওদের এক জবাব, 'ওসব তুমি বুঝবে না মা।'

একমাত্র বাদলকে নিয়ে তখনো কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। হর-প্রসাদের কোনো অভিযোগ ছিল না। মায়ের সঙ্গেই বাদলের ভাব বেশি। সংসারের কাজে কর্মে, বাদলকেই পেতেন। বকে ধমকেই করাতে হত, তবু করত। কিন্তু দিনে দিনে সংসারের চেহারাটা বদলে যাচ্ছিল।

কৃপালের সঙ্গেই প্রথম হরপ্রসাদের লাগলো। বাইরের বিবাদ ঘরে এসে ঢুকেছিল। কেবল তর্কাতর্কিতেই সব শেষ হত না। হর-প্রসাদ ক্ষেপে উঠত। ক্ষেপে উঠে যা তা বলতো। কৃপাল মাথা নোয়াতো না। সে হরপ্রসাদের দিকে জলন্ত চোখে চেয়ে থাকতো। বিমলা এসে কৃপালকে সরিয়ে দিতেন, 'সরে যা.এখান থেকে। বাপের মুখে মুখে কথা বলতে লজ্জা করে না।'

বিমলা হরপ্রসাদের ওপর খুশি হতেন না। কৃপাল তো ওর ছেলে, বাইরের শত্রু না। কিন্তু কথা শুনলে সেরকমই মনে হত। কেবল কৃপালের সঙ্গে না দয়ালের সঙ্গেও হরপ্রসাদের একই ব্যাপার ঘটতো। বিমলা মনে করতেন, কৃপাল দয়াল একই দল করে।

বিমলার সে ভুল ভাঙতেও দেরি হয়নি। যখন দেখেছিলেন দুজনের মধ্যে তর্ক ঝগড়া। নিতান্ত বাড়ির মধ্যে আর বিমলা সামনে থাকতেন বলে ওরা মারামারিটা করতে পারতো না। এত দলাদলি কিসের, বিমলা বুঝতে পারতেন না। সবাই মিলে একটা দল করলেই তো সব মিটে যায়। কিন্তু বাড়িতে তখন তিনটে দল। হরপ্রসাদ কৃপাল দয়াল। আর এক দল বিমলা আর বাদল। তবে বাদল একেবারে নিরপেক্ষ ছিল না। ছোড়দা দয়ালের দিকে ওর টান বেশি। বলতো, 'ছোড়দা ঠিক বলে।'

বিমলা জিজ্ঞেস করতেন, 'কেন ?'

বাদল বলতো, 'আমাদের স্কুলের সব ওপর ক্লাসের ছেলেরা ছোড়দাকে মানে। ছোড়দা গেটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলে সব ছেলেরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসে।'

'তুই বুঝি ছোড়দার মত হবি !'

সে বিষয়ে বাদল কিছু বলত না। ওর জবাব ছিল, 'তা আমি কি করে জানব।'

বিমলা বলতেন, 'তুই ওসবের মধ্যে যাসনি। দেখছিস না বাড়ীতে কী রকম অশান্তি।'

যত দিন যাচ্ছিল, অশান্তির চেহারাটা বদলে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ কৃপাল দয়াল, কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলতো না। বিমলা রান্না-বান্না করেন, ওরা এসে খায়। রাত্রে শোয়। কৃপাল দয়াল রোজ রাত্রে বাড়িতেও থাকতো না। পড়াশোনা হচ্ছিল না। কৃপাল একটা চাকরি যোগাড় করে নিয়েছিল। দয়ালেরও সেই অবস্থা। পড়া হবে না। কিন্তু কেবল পার্টি করলে চলবে না। ওরও একটা চাকরি চাই।

ইতিমধ্যে বাদল বড় হয়ে উঠেছিল। ক্লাস টেনে পড়বার সময় ওর টাইফয়েড হয়েছিল। বিমলার ভিতরটা ভয়ে গুটিয়ে গিয়েছিল। নানা অশুভ চিন্তা তার মাথায় এসেছিল। এতখানি

বড় বয়সে কোনো সন্তান তাকে হারাতে হয়নি। এমন ভারী রোগও কারোর হয়নি। তখন দেখা গিয়েছিল কৃপাল ডাক্তার ডেকে এনেছিল। দয়াল বসে বসে বাদলের মাথায় বরফ দিয়েছে। রক্ত বিষ্ঠা পরীক্ষা করবার জন্য নিয়ে গিয়েছে। হরপ্রসাদ উদ্বিগ্ন মুখে বাদলের বিছানার সামনে বসে থেকেছে।

তখন তো বাদল কোন পার্টি করে না। করলে কী চেহারা হত কে জানে।

বিমলার চোখের সামনে ভেসে উঠলো শ্মশানযাত্রার ছবি। এ বাড়ির উঠোন থেকেই ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত বাদলকে শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিল। মৃতদেহ ঘিরেছিল বাদলের বন্ধুরাই, ওর পার্টির লোকেরা। কৃপাল দয়াল সেখানে এসে দাঁড়ায়নি। বোধহয় দাঁড়াতে পারেনি। হরপ্রসাদ একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। তাকে কেউ একটা কথা বলেনি। সেও বলেনি। বাদলকে ওর বন্ধুরাই কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা নয়, ভাইয়েরা নয়, পার্টির ছেলেদের কাঁধে বাদলের মৃতদেহ শ্মশানে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। দাদারা বাড়িতে ছিল না।

টাইফয়েডের সময় বাদল যদি পার্টি করতো, তাহলে কা হত কে জানে। শ্মশানযাত্রার মতই হয় তো, বাবা দাদারা দূরে সরে থাকতো। পার্টির কাছে বাবা ছেলে ভাই বলে কিছু নেই। পার্টির পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। একে কেমন পার্টি করা বলে, বিমলা বোঝেন না। বিমলা শুধু সংসারটা মাথায় করে রেখেছেন।

কিন্তু পার্টিই তা হলে সব। বিমলার চোখে যেন আগুনের আঁচ লাগে। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টি ফিরে আসে শহীদ বেদী থেকে। তিনি বাড়ীর দিকে ফিরে তাকান। ঘাড় ফিরিয়ে, পিছনে তাকিয়ে গোটা বাড়িটাকে যেন একবার দেখে নেবার চেষ্টা করেন।

'কোথায় গেলে, অ্যাঁ? শুনছ!'

হরপ্রসাদের গলা। বিমলাকে ডাকছে। বিমলা সাড়া দিলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার তাকালেন ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে। তাঁর মনে পড়ল, আজ যেন কিসের ছুটি। কৃপাল হরপ্রসাদ কেউ-ই কাজে যায়নি। কিন্তু বিমলা সাড়া দেবেন না। আজ আর এ সময়ে তিনি সাড়া দিতে পারছেন না। তাঁর ভিতরে কী যেন ঘটছে। আঠারো বছর আগে, এই দিনে, এই সময়ে যা ঘটেছিল তাঁর সারা শরীরে যেন সেই ভাব। ওই বেদীতে না শ্মশানে না, বাদল যেন তাঁর ভিতরে রয়েছে। বাদল পৃথিবীতে আসতে চাইছে। বাদল যখন টাইফয়েড থেকে সেরে উঠেছিল, তখন ছেলেটা বড় রুগ্ন হয়ে গিয়েছিল। মনে হত, ওকে শিশুর মত কোলে নিয়ে যায়। প্রায় একটা বছর পড়া নষ্ট হয়েছিল। তা হোক তবু প্রাণে বেঁচেছিল বিমলার সেইটাই সান্ত্বনা। কৃপাল দয়ালের অসুখ হলেও সেই রকমই হত। হরপ্রসাদের অল্প স্বল্প অসুখ করলেও বিমলা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। লোকটা যাই করে বেড়াক, শরীরের দিক থেকে খুব শক্ত না। তাছাড়া হরপ্রসাদই তো একমাত্র কাণ্ডারি। স্বামীকে তিনি কখনো কোনো কারণে অযত্ন করেননি।

বাদল রুগ্নতা কাটিয়ে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠেছিল। আগের মত স্বাস্থ্য না, তার চেয়েও যেন সুন্দর হয়ে উঠেছিল। ও বরাবরই একটু কথা কম বলতো। বিমলার মত। বিমলা কথা কম বলেন। বেশি বলবার অবকাশ এ সংসারে তাঁকে দেয়নি। সারাটা সংসার তাঁর মাথায়। স্বামী পুত্রদের খাওয়া-দাওয়া দেখা শোনা। বাসন মাজা আর ঘর পরিষ্কার করা ছাড়া, সবই তাঁর নিজের হাতে।

বাদল কথা কম বলতো। বিমলা মনে করতেন, বাদল কৃপাল দয়ালের পথ ধরবে না। বাড়িতে তিনটি পার্টির লোক। কারোর সঙ্গে কারোর সদ্ভাব নেই, কথাবার্তা বন্ধ। বাদল সব দেখেছে শুনেছে। দেখে শুনে ও আর ও পথে যাবে না।

বিমলা ভুল ভেবেছিলেন। কলেজে ঢোকবার আগেই বিমলার কানে এল বাদল আর একটা পার্টিতে ঢুকেছে। বিমলা বলেছিলেন, 'তুইও ওসব পার্টি করতে যাচ্ছিস।'

বাদলের কথা কম। সে মায়ের কথার জবাব দেয়নি। কিন্তু হরপ্রসাদ ছাড়েনি। কৃপাল দয়ালের সঙ্গে যে রকম ঝগড়া করেছে, তেমনি করেই বাদলকে বকেছে, ধমকেছে। বলেছে, 'তুই গিয়ে একটা খুনী পার্টির সঙ্গে জুটেছিস।'

বিমলা অবাক হয়ে শুনেছিল 'বাদল ওর বাবাকে বলছে, 'আমাদের পার্টি খুনী পার্টি না।'

হরপ্রসাদ চিৎকার করে বলেছে, 'আলবৎ খুনী পার্টি। কতগুলো গুণ্ডা বদমাইস লোচ্চা ছাড়া ও পার্টিতে কোন ছেলে নেই। তুই আমাকে শেখাতে আসিস না।'

বাদল বলেছিল, 'আমি কাউকেই কিছু শেখাতে যাচ্ছি না।'

বিমলার মনে হয়েছিল, বাদলকে তিনি যেন চিনতে পারছেন না। ও শান্ত আর গম্ভীর ভাবে ওর বাবার কথার জবাব দিচ্ছিল। কৃপাল দয়ালের মত গলা চড়িয়ে, উত্তেজিত হয়ে কথা বলেনি। বিমলা অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, বাদল কবে থেকে ওরকম কথা বলতে শিখলো। ও যেন কত বড় হয়ে গিয়েছে, কত কী বোঝে। অবাক হওয়ার সঙ্গে, একটু একটু রাগও হয়েছিল। বাদল যদি ছেলেমানুষের মত চিৎকার চেঁচামেচি করতো, তা হলেই যেন বিমলা খুশি হতেন। অথচ, আবার বাদল ওরকম করে কথা বলেছিল বলে, একটা কেমন গর্ববোধও করেছিলেন।

কিন্তু হরপ্রসাদ দু রকম কথা জানতো না। ঠিক যেমনভাবে কৃপাল দয়ালকে বলেছিল, তেমনি ভাবেই বাদলকে বলেছিল, 'ওসব কোনো কথা শুনতে চাই না। এ বাড়িতে থাকতে হলে তোকে ওই পার্টি ছাড়তে হবে।'

হরপ্রসাদের এ ধরনের কথা, বিমলার কখনো ভাল লাগে না।

মানুষটা কথায় কথায় বাড়িতে থাকার খোঁটা দেয় কেন। বাদল ওর বাবার সে কথার কোনো জবাব দেয়নি। সামনে থেকে সরে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ নিজের মনেই গজগজ করেছিল, 'যারা দেশ গড়তে জানে না, কেবল ধ্বংস করতে চায়, তাদের আমি আমার বাড়িতে চাই না। তারা যে যার নিজের রাস্তা দেখে নিক গিয়ে...।' এমনি অনেক কথা বলেছিল। বিমলাও হরপ্রসাদের সামনে থেকে সরে গিয়েছিলেন। লোকটা কেবল বকতে ধমকাতেই জানে। কখনো দেখা গেল না, মাথা ঠাণ্ডা করে ছেলেদের কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। যেমন কৃপাল দয়ালের সঙ্গে করেছে, বাদলের সঙ্গেও সেই রকম করে কথা বলেছিল।

বিমলের বুক ভরা অশান্তি আর উদ্বেগ। শেষ পর্যন্ত বাদলের ওপরেই তাঁর রাগ হয়েছিল। সংসারে এত কিছু থাকতে, পার্টি ছাড়া আর কি কিছু করার নেই। বাদলটাও শেষ পর্যন্ত সেই একই পথে চলে গেল। তিনি বাদলকে বলেছিলেন। 'তুই লেখাপড়া করবি, খাবি দাবি, খেলা করবি। তুই কেন আবার পার্টি করতে গেলি?'

বাদল শান্তভাবেই বলেছিল, 'আমি তো কারোর কোনো ক্ষতি করছি না।'

বিমলা রেগে বলেছিলেন, 'ওসব ক্ষতি টতি জানি না। একটা সংসারের মধ্যে, তোরা সব এক একটা পার্টি নিয়ে থাকবি, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করবি, এসব আর আমি সহ্য করতে পারছি না। তুই ওসব পার্টি টার্টি ছাড়।'

বাদল গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'আমি বাড়িতে কারোর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতে চাই না। পার্টি আমি ছাড়তে পারব না।'

বিমলা বলেছিলেন, 'তা ছাড়বি কেন। তাহলে যে আমার সুখ হয়। বুঝেছি রে বুঝেছি, আমি না মরলে তোরা বাপ ভাইয়েরা কেউ পার্টি ছাড়বি না। এ আমি কোথায় আছি। এটা কি একটা সংসার। কতগুলো পার্টি ছাড়া এ বাড়িতে কিছু নেই।'

বিমলার গলা বন্ধ হয়ে এসেছিল। চোখে জল এসে পড়েছিল। আবার বলেছিলেন, 'এবার আমাকেও একটা পার্টিতে গিয়ে ঢুকতে হবে।'

মায়ের কথা শুনে বাদল বোধহয় একটু বিচলিত হয়েছিল। বলেছিল, 'তুমি এরকম করছ কেন। বলছি তো, আমি বাবা দাদাদের কারোর সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি না।'

কিন্তু বাদলের সে-কথা টেকেনি। কখনো কৃপাল, কখনো দয়াল, কখনো বা হরপ্রসাদের সঙ্গে, তর্কাতর্কি বিবাদ লেগেই ছিল। বাইরের অশান্তি বাড়িতে দানা বেঁধে উঠেছিল। বাইরের যত গোলমাল, বাড়িতে এসে তার বোঝাপড়া চলছিল। সকলেই আলাদা আলাদা করে বাদলের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিল। বিমলা সেই সব কথা থেকেই বুঝতে পারতেন, বাদল রীতিমত পার্টির কাজ করছে। লেখাপড়া ওর মাথায় ছিল না।

প্রথম কৃপালই একদিন বিমলাকে বলেছিল, 'বাদল খুব বেড়ে উঠেছে। ওকে সাবধান করে দিও। কোনদিন একটা কী ঘটে যাবে, তখন আর কিছু করার থাকবে না।'

বিমলা বলেছিলেন, 'আমাকে বলতে এসেছিস কেন। নিজের ভাইকে নিজেরা বোঝাতে পারিস না।'

'ও বোঝাবার বাইরে চলে গেছে।'

বিমলা তিক্ত করেই জবাব দিয়েছিলেন, 'আর তোরা বুঝি ভেতরে আছিস। তুই নিজে পার্টি ছাড়তে পারিস না?'

কৃপাল বলেছিল, 'আমার যা বলবার বলে দিলাম। বাদল আগুন নিয়ে খেলা করছে। রোজ মাস্তানি আর মারামারি করে বেড়াচ্ছে!'

সকলেরই সকলের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ। বিমলার সামনে এসে কৃপালই যে কেবল বাদলের বিরুদ্ধে শাসিয়েছে তা না। দয়ালও একইভাবে শাসিয়েছে। বিমলার সব থেকে অবাক লেগেছিল, হরপ্রসাদও যখন এক রকম ভাবেই শাসিয়েছে। বলেছে, 'তোমার

ছোট ছেলেকে বলে দিও, এখনো সময় আছে। ও যেন সাবধান হয়ে যায়। ওর বড় পাখনা গজিয়েছে। ও পাখনা পুড়ে যাবে।'

বিমলার বুকের মধ্যে সেদিন একবার কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু হরপ্রসাদের ওপর রাগও হয়েছিল। বলেছিলেন, 'নিজের ছেলেকে নিজে বোঝাতে পার না। তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও। পার্টি ছাড়তে পার না। তারপরে ছেলেকে বলতে পার না? সবাই এসে আমার কাছে বলছ?'

হরপ্রসাদ বলেছিল, 'তুমি ওসব বুঝবে না! আমার পার্টি ছাড়ার কিছু নেই। আমি ওদের মত গুণ্ডা পার্টি করছি না। কিন্তু বাদল যেভাবে বাড়িয়ে তুলেছে, ও একটা কিছু না ঘটিয়ে ছাড়বে না।'

বিমলা তিক্ত রাগে বলেছিলেন, 'আমাকে ওসব কথা বলে লাভ নেই। আমি তোমাদের সংসারে একটা দাসী বাঁদি আছি। তোমাদের খেদমত খাটছি। আর তোমারা লড়াই করছ। এবার আমাকে তোমরা রেহাই দাও।'

বিমলা হরপ্রসাদের কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন। শুনেছিলেন, তারপরেও হরপ্রসাদ আপনমনে বকবক করছিলেন, 'বাদলের মরণ ধরেছে। পার্টির নেতাদের উসকানিতে, ও নিজেকে কী একটা ভাবতে আরম্ভ করেছে....।'

বিমলার বুকের মধ্যে আবার কেঁপে উঠেছিল। বাবা হরপ্রসাদ কেমন করে বলেছিল, ছেলেটার মরণ ধরেছে। কেবল বাদলের বেলায় না। হরপ্রসাদ সকলের বেলাতেই ও কথা বলেছে। কৃপাল দয়ালের কথাতেও বলেছে, ওদের মরণ ধরেছে। হরপ্রসাদ কি ছেলেদের বাবা নয়। পিতৃত্বের থেকেও পার্টি কি বড়? ওদের কি ভ্রাতৃত্ব বলতে কিছু নেই। পার্টি কি তার ওপরে।

এই সংসারের মাঝখানে বসে, এ কথাটা কোনদিন তিনি বুঝতে পারেননি। কেবল ভেবেছেন, তাঁর ঘরে কেন এত অশান্তি। বাপছেলেরা মিলে, একটা সুখের সংসার কি ওরা গড়তে পারতো না।

তার বদলে ওরা, এক একজন এক একজনের বিরুদ্ধে কেবল মরণ ধরাটাই দেখতে পেয়েছে।

বিমলা বাদলকে বলেছিলেন, 'তোর বাবা দাদারা সবাই তোর নামে নালিশ করছে। তুই কি একটা বিপদ আপদ না ঘটিয়ে ছাড়বি না ?

বাদল বলেছে, 'বিপদ আপদ আবার কী। ওরা চায়, ওরা পার্টি করবে, আমি চুপচাপ ব'সে থাকব। তা আমি থাকব কেন ? ওদের শাসানিকে আমি কাঁচকলা ভয় পাই। বেশি ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করতে এলে, আমরাও ছেড়ে কথা বলব না।'

বিমলা তবু ধমকে বলেছেন, 'তুই কেন ওদের সঙ্গে লাগতে যাস্ ?'

বাদল বলেছিল, 'আমি কেন লাগতে যাব। ওরাই আমাদের সঙ্গে লাগতে আসে।'

'কেন তুই বাবা দাদাদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারিস না ?'

'বাবা দাদারা বুঝি মিলে মিশে আছে ? পার্টির ব্যাপারে কারোর সঙ্গে কারোর মিল মিশ হবে না।' একটু চুপ করে থেকে, আবার বলেছে, 'পার্টির সঙ্গে আমি বেইমানি করতে পারব না। তা বাবা আর দাদারা আমাকে যতই শাসাক। সবাই তো নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, আমার বেলাতেই খালি শাসানি। আমি কারোর পরোয়া করি না।'

বিমলা তারপরেও মোক্ষম কথাটি বলতে ছাড়েননি, 'বাপের অমতে এসব করছিস। এর পরে যদি তোর বাবা তোকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে ?'

বাদল অনায়াসে জবাব দিয়েছে, 'বের করে দেয়, চলে যাব। তা বলে বাবাকে, বাবার পার্টিকে সমর্থন করতে পারব না।'

বিমলা যেন শাঁখের করাতের তলায় পড়েছিলেন। কোনোদিকে তাঁর শান্তি ছিল না। স্বামী পুত্রদের কারোকে তিনি বোঝাতে পারেননি। সংসারের মধ্যে চারটে পার্টির লড়াই চলছিল। এক সঙ্গে

বসে বাবা ছেলেদের খাওয়া উঠে গিয়েছিল। যদি বা কোনদিন সবাইকে এক সঙ্গে খেতে দিতেন, কেউ কারোর সঙ্গে একটি কথা বলতো না। কলের পুতুলের মত, সবাই নিঃশব্দে খেয়ে উঠে যেত।

'মা। মা কোথায় গেলে?'

এখন দয়াল ডাকছে। এর আগে কৃপাল ডেকেছে। হরপ্রসাদও ডাকাডাকি করছে। বিমলা কোনো সাড়া দেননি। এবারও সাড়া দিলেন না। ওদের সকলের ডাকে চিরদিন সাড়া দিয়ে এসেছেন। আজ তিনি ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না। এইখানে দাঁড়িয়ে, ওই মোড়ের অবহেলিত ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে তাকিয়ে থাকবেন। ওইখানেই বাদলকে খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছিল।

আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ। শনশন পুবেল বাতাসের সঙ্গে, এবার ইলশেগুড়ি ছাঁটের মত বৃষ্টি নেমে এল। জবা গাছটা ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে বিমলার গায়ে মুখে পড়তে লাগল। তিনি নড়লেন না। তিনি আর ওই রান্না ঘরটায় গিয়ে ঢুকতে পারছেন না। আঠারো বছর আগে বাদলের ওই আঁতুড় ঘরে গিয়ে ঢুকলেই, তাঁর সমস্ত শরীরের মধ্যে কেমন করছে। বিমলা স্থির থাকতে পারছেন না। তাঁর পেটের মধ্যে যেন কেবলই কী নড়ে চড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল কি এখনো তাঁর গর্ভে!

বিমলা চোখ বুজে ঠোঁটে ঠোঁট টিপলেন। ব্যথা উঠছে নাকি তাঁর পেটে। তাঁর চোখের সামনে বাদলের সেই চেহারাটাই আবার ভেসে উঠল। ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত মৃত বাদল। সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে, সকলের শাসানির কথা তাঁর মনে পড়েছিল। এই তিন মাস ধরে, বারে বারে মনে মনে জিজ্ঞেস করেছেন, কারা মেরেছে বাদলকে। কৃপালের দল? দয়ালের দল, না হরপ্রসাদের দল? সবাই অস্বীকার করেছে, তাদের দল বাদলকে মারেনি। পুলিস যাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে, তারাও অস্বীকার করেছে, বাদলকে তারা মারেনি। অথচ সবাই শাসিয়েছে, সাবধান করে দিয়েছে। কৃপাল

দয়াল হরপ্রসাদের পার্টি ছাড়াও, আরও পার্টি আছে। কিন্তু স্বীকার করেনি, বাদলকে কারা মেরেছে। বিমলাও জানেন না, কাদের হাতে বাদলের রক্ত লেগে আছে।

যতই অস্বীকার করুক, কোনো না কোনো পার্টির হাতেই বাদলের রক্ত লেগে আছে। সেটা কোন পার্টি। কৃপাল দয়াল হরপ্রসাদের কথাই আগে মনে আসে। ওরা সকলেই বলেছে, বাদলের মরণ ধরেছে। অথচ, তারা বিমলার স্বামী পুত্র। বাদল কি হরপ্রসাদের ছেলে না। কৃপাল দয়ালের ভাই ছিল না? কেবল কি একটা পার্টির ছেলে। ওদের বিরুদ্ধে পার্টির ছেলে একটা? বাদল কি এই সংসারে একমাত্র বিমলারই ছেলে। তা-ই যদি হয়, তবে বিমলা আজ ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না।

বিমলা শুনতে পাচ্ছেন, ওরা সবাই তাকে ডাকাডাকি করছে। কৃপাল ডাকছে, দয়াল ডাকছে, হরপ্রসাদও ডাকছে। ওরা নিজের কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। আলাদা ডেকে চলেছে।

'মা, ও মা।'

'মা কোথায় গেলে?

'কই গো শুনছো, কোথায় গেলে?'

বিমলা টের পাচ্ছেন, উঠোনে ঘরে রান্না ঘরে সবাই তাঁকে ডাকাডাকি করছে। বৃষ্টির ছাদে ছুটোছুটি করছে। শুনতে পাচ্ছেন দয়াল রান্না ঘরের কাছ থেকে কণার মাকে চিৎকার করে ডাকছে, 'মাসীমা ও মাসীমা।'

কণার মায়ের জবাব শোনা গেল, 'কী বলছিস রে দয়াল।'

'মা কি আপনাদের বাড়িতে আছে?

'না তো সকাল থেকে একবারও আসে নি তো। কোথায় গেল তোর মা।'

'কি জানি, দেখতে পাচ্ছি না। রান্না ঘরের দরজা খোলা। কুকুর ঢুকে কড়ার তরকারি খেয়ে গেছে। রান্না বান্না কিছু হয়নি।

কণার মায়ের উদ্বিগ্ন গলা শোনা গেল' 'সে কি রে। তোর মায়ের একরকম কখনো হয় না, ছ্যাখ খুঁজে কোথায় গেল। আমিও দেখছি।'

'কোথাও যাননি বিমলা। বাড়িতেই আছেন। ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে দেখছেন। যারা বেদী তৈরি করেছিল তারাই বা আজ কোথায়। একটা শহীদ বেদী করেছিল! তিন মাসের মধ্যেই সেটা ভেঙে পড়েছে। তাদেরই বা কী হারিয়েছে। তারা সেই যে শহীদ বেদীতে বিমলাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তারপরে আর আসেনি। তারা যেমন পার্টি করছিল, তেমনি করছে। এ বাড়ির বাবা ছেলেরাও করছে।

বিমলারই শুধু হারিয়েছে। দশ মাস বাদলকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তাঁর নাড়ি ছিঁড়ে বাদল এই পৃথিবীতে এসেছিল। আঠারো বছর আগে, এতক্ষণে বাদল পৃথিবীতে এসেছে। এতক্ষণে মেঘুর মা বাদলকে ধুয়ে মুছে, তাঁর বুকের কাছে তুলে দিয়েছে। গম্ভীর স্বরে ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদছে। বিমলা তাকে স্তন চেনার চেষ্টা করছেন!

বিমলার গায়ের মধ্যে কেঁপে উঠল। বাদলকে তিনি যেন বুকের মধ্যে অনুভব করছেন। বাদল কোথাও নেই, শ্মশানে না, শহীদ বেদীতে না। তাঁর বুকেই আছে।

'বড় বৌ'।

হরপ্রসাদ ছাতা মাথায় দিয়ে এসে দাঁড়াল। বিমলার শরীর শক্ত হয়ে উঠল। ঠোঁট টিপে রইলেন। হরপ্রসাদ তার ভাইদের মধ্যে সকলের বড়। পূর্ববঙ্গে, একান্নবর্তী পরিবারে, বিমলাকে বড় বৌ বলেই ডাকা হত। হরপ্রসাদ কখনো সখনো তাঁকে ওই নামে ডাকে। বিমলা কোন জবাব দিলেন না।

হরপ্রসাদ বলল, 'আমরা তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?'

সে কথা হরপ্রসাদকে বলবার দরকার নেই। আজ বাদলের জন্মদিন, হরপ্রসাদের সে কথা মনে নেই। ছেলেদেরও কারোর মনে থাকে না। বিমলা ভুলতে পারেন না, কবে কোন ছেলেকে তিনি প্রসব করেছেন। মুখে কিছু বলেন না কেবল তিন ছেলের জন্মদিনে, ওদের একটু পায়েস রান্না করে খাইয়ে দেন। এতকাল দিয়ে এসেছেন। গত বছরও এই দিনে, বাদলকে পায়েস রান্না করে খাইয়েছিলেন। বাদলের জন্য আর তাঁকে পায়েস রান্না করতে হবে না।

হরপ্রসাদের গলায় অসহায় বিস্ময়, কারণ সে বিমলার কিছুই বুঝতে পারছে না। বলেই চলেছে, 'রান্না বান্না কিছু করনি। আধ কাঁচা তরকারি কুকুরে খেয়ে গেছে। কী ব্যাপার তোমার?'

হরপ্রসাদ ব্যাপার কিছুই বুঝবে না। বিমলা কিছুই বলতে চান না। তাঁর চোখের সামনে শিশু বাদল খেলা করে বেড়াচ্ছে। দুরন্ত দুষ্টু ছেলে ছুটে বেড়াচ্ছে। গায়ে হাতে পায়ে কাদা মাখা। তারপরে বাদল বড় হচ্ছে। কিশোর বাদল স্কুলে যাচ্ছে। মায়ের কাছে দুটো পয়সার জন্য হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। বাদল ছাড়া বিমলার কাছে এখন আর কিছু নেই। বাদল বাদল বাদল। সকলের কাছে ও ছিল একটা পার্টির ছেলে। সন্তান শুধু বিমলার।

হরপ্রসাদের গলার শব্দে কৃপাল দয়ালও এসে দাঁড়াল। ওরা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। ওরা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করতে পারছে না। বিমলাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থ হয়ে গিয়েছে।

কৃপাল বলল, 'মা তুমি এখানে কী করছ?'

দয়াল জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

সবাই অবাক। সবাই বিমলাকে বুঝতে চাইছে। কিন্তু ওদের বোঝার কিছু নেই। এরা তাঁর স্বামী পুত্র। এদের ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। কিন্তু আজ তিনি ওদের সঙ্গে নেই। আজ

ওরা সারাদিন পার্টি করতে চলে যাক। বিমলা আজ বাদলকে নিয়ে থাকবেন। বাদল এখন তাঁর বুকে।

হরপ্রসাদ বলল, 'ঘরে চল বড় বৌ। এখানে দাঁড়িয়ে ভিজো না।'

বিমলার দৃষ্টি মোড়ের ভাঙা বেদীর দিকে। স্পষ্ট করে বললেন, 'যাব না।'

তিন পার্টির লোক নিজেদের মধ্যে অবাক হয়ে চোখাচোখি করল। কৃপাল বলল, 'রান্না বান্না করোনি, আমরা খাব কী?'

বিমলা নিচু পরিষ্কার গলায় বললেন, 'আজ আমি খেতে দিতে পারব না।'

তিনটে পার্টির লোক অবাক। বিমলা তাদের কাছে, পার্টির থেকেও যেন জটিল হয়ে উঠেছে। দয়াল বলে উঠল, 'আমরা তবে কী করব এখন?'

বিমলা বললেন, 'তোরা আজ তোদের পার্টির কাজে যা। আমাকে ডাকিস না।'

অন্তহীন বিস্ময়ে তিনজনেই চুপ। বিমলা ওদের সামনে থেকে সরে গিয়ে, ফণিমনসার বেড়া ঘেঁসে দাঁড়ালেন। তিন জনেই দেখল। তিন জনের চোখেই অপরিচয়ের দৃষ্টি। যেন স্বামী চিনতে পারছে না স্ত্রীকে। ছেলেরা মাকে। অথচ কোনো কথা বলতেও যেন আর তাদের সাহস হচ্ছে না। এই প্রথম, তারা শুধু অবাক না, বিমলাকে যেন তাদের কেমন ভয় করছে।

তিনজনেই আরও একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল। বাতাসের ঝাপটায় আর বৃষ্টির ছাটে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তিনজনেই একটা অসহায় অস্বস্তি আর বিস্ময় নিয়ে একে একে চলে গেল।

বিমলা তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃষ্টির ছাঁটে ধুয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বুকের কাছে এখন কিছু ঠেলে উঠছে, গলার কাছে উঠে আসছে। তাঁর চোখে এখন জল আসছে, বৃষ্টির জলে গাল ধুয়ে যাচ্ছে। তিনি বুকের কাছে হাত রেখে, মনে মনে ডাকলেন, 'বাদল, বাদল, তুই আমার কাছেই রয়েছিস। আমার কাছে থাক।'…

যখন যেমন

সমরেশ মজুমদার

আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেল ফটিকের। এই তিনতলা ইট বের করা বাড়িটা এখনও থরথর করে কাঁপছে। ফটিক পা টানটান করে শুয়ে আরও দুটো আওয়াজ শুনল। আজ পুরো তিনটে দিন এই ঘরে ফটিক একদম একা। পৃথিবীতে কোথায় কি হচ্ছে ফটিক জানতে চায়নি এই তিনদিন। অবশ্য এই প্রথম, তিনদিনে এই প্রথম ফটিক বোমার শব্দ শুনতে পেল। ফটিক মুখগুলো মনে করতে চেষ্টা করল। ওর দলের কেউ নয় নিশ্চয়ই। কারণ ওকে কিছুদিন গা ঢাকা দিতে হবে এরকম একটা কথা হয়ে আছে। তাহলে কে হতে পারে? পিনাকি? কচি অথবা লক্কা? পরপর মুখগুলো চোখের ওপর দেখল ফটিক। সেইসব মুখগুলো।

এখন কটা বাজে? এ ঘরে ঘড়ি নেই। ফটিকেরও ওসব ভাল লাগে না। যত্ত রঙবাজি। হারুদাতো এসব ব্যাপারে একদম ল্যাংটো। সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে ও লোকটাকে। মাইরী, একই রকম থেকে গেল! সেই বাবরি চুল, সরু পাজামা আর মোটা কাপড়ের সার্ট পরে লোকটা পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর ফোঁস ফোঁস করে নস্যি টানে আর ভাঙা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গায়, 'ওঠো-গো-ভারত-লক্ষ্মী-ই-ই।' এই ঘরটা ঐ হারুটারই। দুপুর

নাগাদ একবার আসে, ফেরে রাত গভীরে। কোথায় কোন দোকানে খাতা লেখে হারুদা কোনদিন খোঁজ রাখেনি ফটিক। লোকটা আশ্চর্য নিস্পৃহ।

তিনদিন আগে যখন ফটিক দরজায় এসে দাঁড়াল হারু ঘোষ হেসেছিল, 'কি রে?'

'এখানে থাকব কদিন।' ফটিক হারু ঘোষকে চোখ বুঁচকে জরিপ করছিল!

'থাক।'

ব্যস এই পর্যন্ত। কেন আছে, কি জন্যে আছে তা জিজ্ঞাসা করেনি। গত রাত্রে হারুঘোষকে বলেছিল ফটিক, 'তুমি দাদা একদিন ঠিক হাপিস হয়ে যাবে।'

দোকান থেকে কিনে আনা ভাত তরকারী কলাইকরা থালায় ঢালতে ঢালতে হারু ঘোষ বলেছিল, 'কেন?'

'তুমি শালা টিকটিকি।'

'টিকটিকি?' হারু হাঁ করে তাকাল।

'তোমার ছেলেমেয়ে বৌ নেই কেন? ঐ সব দেশ প্রেমের গান ছাড়া একটা হিন্দী গান গাওনা কেন? মাইরী ছেলেবেলায় ঐ সব দেশপ্রেমের গান শুনলে গায়ে কাঁটা দিত, এখন হাসি পায়। সময়টা এখন খুব খারাপ দাদা, খুব খারাপ। একটু সামলে চল।' ছোট্ট ছয় ইঞ্চি ছোরাটা দিয়ে পায়ের লোম চাঁছতে চাঁছতে কথাটা বলেছিল ও। হারু ঘোষ হেসে বলল, 'তাহলে আমার কাছে আছিস কেন?'

'আছি, আমার খুশি।'

পুরো তিনটে দিন কাঁহাতক শুয়ে থাকা যায়। অথচ আবার হারু ঘোষকেও জিজ্ঞাসা করা যায় না, লোকটা হাপিস হয়ে গেল কিনা।

তিনদিন আগে ঠিক সন্ধ্যে নাগাদ ওরা ফিরছিল লেকের ধার দিয়ে। ফটিক নিমাই আর রবি। নিমাই আর রবির নাম খাতায়

উঠেছে অনেকদিন। ও সি পিকে ডি তো ওদের পেলে রোস্ট করে ফেলবে। নিমাই অবশ্য বলে ফটিকের নামও উঠে গেছে পি, কে ডির খাতায়। কিন্তু ফটিক তা বিশ্বাস করে না। কারণ এখন অবধি বড় রকমের কোন এ্যাকশনে হাত ছ্যায়নি ও। ভীষণ বিশ্রী লাগছিল ফটিকের। ওদের তিনজনের পকেটই গড়ের মাঠ। তার ওপর আজ সকালেই বাবার সঙ্গে হিচ্ হয়ে গেছে জোর। শালা হররবকৎ বেকার বেকার করে। 'কেউ যদি আমাকে চাকরি না দেয় তো আমি কি করব?' এসব কথা প্রথম প্রথম বলতো ফটিকচাঁদ। এখন আর বলে না। রোজগারের কোন ব্যবস্থা নেই। কোন' শালা চাকরি দেবে না। গোর্কি বলেছে অধিকার কেউ হাতে তুলে ছ্যায় না—হেঁ হেঁ, আদায় করে নিতে হয়। তাই তো শালা—মরদ কা বাৎ। এখন মাইরি দেয়ালে দেয়ালে দারুণ দারুণ কথা পড়তে পারা যায়। বই ফই পড়ার হ্যাপা পোয়াতে হয় না।

আর ঠিক তখনই লোকটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেই সঙ্গে সন্ধে অন্ধকারেও পালিত সাহেবকে আসতে দেখল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব রক্ত পেট্রোল হয়ে দপ করে জ্বলে উঠল। ঐ লোকটা, রাইটার্স বিল্ডিং-এর পালিত সাহেব, সাপের শরীর আঁকা ছড়ি নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। যে লোকটা কমসে কম ছয় মাস ফটিককে ঘুরিয়েছে পিয়নের চাকরি দেবে বলে। তারপর হেসে বলেছে, 'তোমার বাবাকে বল, এসব লাইনে চাকরি পেতে হলে কিছু মালকড়ি ছাড়া দরকার।'

নিমাই আর রবিও দেখতে পেয়েছিল লোকটাকে। ওরা ফটিককে দেখল। ফটিকের চোখ চকচক করছে। নিমাই চাপা গলায় বলল, 'এই, পালিত তিনশো টাকা নিয়ে নাকি লঙ্কার ভাইকে চাকরি দিয়েছে।'

'শালাকে ঝাড়ব।' ফটিক কোমরে হাত দিল। ওর শরীর কাঁপছিল।

'ঝাড়।'

দুটো লাইটপোস্টের মাঝামাঝি জায়গাটা। অন্ধকার এখানটায় খানিক আলো কেড়ে নিয়েছে। ওরা আশেপাশে দেখে নিল। এদিকটায় লোকজন কম। পালিত সাহেব আসছে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে। এখন শালা ঘুষের কথা ভাবছে? ফটিক রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়াল। নিমাই আর রবি পজিশন নিয়ে নিল। পালিত সাহেব ফটিকের সমান্তরালে আসা মাত্রই ফটিক সাঁ করে পাশে ছুটে এসে ছয় ইঞ্চি ফলা ছুরিটা পালিত সাহেবের তলপেটে ঢুকিয়ে দিল। ওর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। নিমাই চীৎকার করে উঠল, 'ওপরে টান, ওপরে টান।' পালিত সাহেব গোঁ গোঁ করে দু'হাত দিয়ে ছুরিটা ধরার চেষ্টা করছে। লোকটার চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। শালা কি চিনতে পারছে ফটিক চাঁদকে! ফটিক ছুরির ফলাটা বেঁকিয়ে ওপরের দিকে টেনে দিল। তারপর ছুরিটা টেনে বের করে নিয়ে দৌড়তে লাগল! নিমাই আর রবির পেছন পেছন ও লেক পেরিয়ে, ট্রেন লাইন ছাড়িয়ে বাদার মাঠের কাছে এসে দাঁড়াল। দাঁড়াতেই নিমাই ওকে জড়িয়ে ধরে টকাস করে একটা চুমু খেল, 'সাবাস্ গুরু সাবাস্। ফাইন হাত মাইরি তোর।'

আর তারপর থেকে এই তিন তিনটে দিন ফটিক এই ঘরে এই বিছানায় মড়ার মত পড়ে আছে। রবিই বলেছিল গা ঢাকা দিতে হবে। যদিও কোন লোকজন ছিল না কাছে তবু বলা যায় না কেউ শালা দেখেছে কি না। পালিত সাহেব কি হাপিস্ হয়ে গেছে এতক্ষণে! যদি না যায়, যদি শালা হাসপাতালে ষ্টেটমেণ্ট দেয় পুলিশের কাছে—দুস্ শালা, ছুরি ওপরে টানলে কেউ বাঁচে নাকি?

ভীষণ আলসেমি লাগছে! কাদিন যাক্। জুৎ করে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করল ফটিক, কদিন যাক, তারপর পিনাকি লক্কার সঙ্গে বোঝাপড়া আছে। ভাই-এর চাকরি বের করছি। এমন সময়

দরজার বাইরে শব্দ শুনল ফটিক। শব্দটা শুনেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ও। কিছু নেই হাতের কাছে। কে এসেছে? হারু ঘোষ তো এসময় আসে না? তাহলে কি কোন খোঁচড়। নাকি ও সি নিজে? ইস্, একটাও যদি পেটো থাকত সঙ্গে! এখন কি করা যায়! হারু ঘোষ দরজায় তালা দিয়ে যায়। ফটিকই বলেছিল তালা দিয়ে যেতে। তালাটা খুলছে কেউ। ছুরিটা বের করল ও। কোন লাভ নেই। বরং এটা থাকলেই খারাপ। বলবে মাল সমেত ধরেছি। ছুরিটাকে কি করা যায়। ঘরের কোণায় কুঁজোর ঢাকা সরিয়ে ভিতরে ফেলে দিল ছুরিটাকে ফটিক। দরজাটা খুলে গেল। ফটিক দেখল হারু ঘোষ দাঁড়িয়ে, মুখচোখ বিবর্ণ। ফ্যালফ্যাল করে দেখছে। হারু ঘোষের পেছনে রবি। না কই, পুলিশ নেই পুলিশ নেই কোথাও। ঘাম দিয়ে জ্বর সারল যেন। ফটিক হাসল, 'আরে রবে, আয় আয়।'

হারু ঘোষ থপ থপ করে কয়েক পা এল ঘরের মধ্যে। দরজায় দাঁড়িয়ে রবি। মাটির দিকে মুখ। হারু ঘোষ একটু কাসল। ফটিক অবাক হল ব্যাপার দেখে, 'কি ব্যাপার, তোরা সব চুপচাপ।'

রবি হাত কচলাল, 'না মানে, ফটিক, তুই চ। মানে তোর এখন বাড়ি যাওয়া দরকার।'

'বাড়ি কেন?' ফটিক অবাক, 'কে, বাবা পাঠিয়েছে?'

'না, মানে, মেশোমশাই-এর, ফটিক একবার শেষ দেখবি না?'

'শেষ দেখব?' ফটিক চিৎকার করল। তারপর এগিয়ে এল রবির কাছে, 'কি হয়েছে, র‍্যালা করছিস কেন, বল!'

রবি আড়চোখে ফটিকের ডানহাত দেখে নিল, 'মেশোমশাইকে মার্ডার করা হয়েছে। বোম্ চার্জ। এইমাত্র হাসপাতাল থেকে বডি এসেছে বাড়িতে।'

'বাবা—বাবাকে বোম্ মেরেছে! কখন—কবে?' কেমন যেন শূন্য, সাদা সব কিছু দেখতে লাগল ফটিক।

'কাল সকালে।' 'গুরু, আমার বিশ্বাস লক্কার পার্টি। তুমি চল গুরু। মেশোমশাই-এর বডি দেখে মাসীমা ফ্লাট হয়ে আছে।'

'পুলিশ নেই কাছে?'

'না।'

'চল।'

ওরা নিচে নেমে এল। ফটিক কোন কথা বলছিল না। রবির খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। ফটিক খুব সতর্ক হয়ে হাঁটছিল। চাপা গলায় বলল, 'পালিতের খবর কি রে?'

রবি খুকখুক করে হাসল, 'ছাই হয়ে গেছে। জানিস, পুলিশ এ ব্যাপারে কচিকে ধরে নিয়ে গেছে।'

ফটিক দেখল, সমস্ত দোকানপাট বন্ধ এ রাস্তায়। এমনকি সিগারেট বিড়িও বিক্রী হচ্ছে না। তারপরেই পোষ্টার পড়ল চোখে। বড় বড় করে লেখা, ফটিকের বাবার নাম। 'প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণে নিহত শহীদ দুখীরাম মণ্ডলের মৃত্যুতে আজ বন্‌ধ্‌।' ব্যাপারটা কি—এই রকম চোখে তাকাল রবির দিকে ফটিক। ওর মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। রবি হাসল, 'গতকাল মাইরী পালিতের জন্যে বন্‌ধ্‌ হয়ে গেছে। আজ তোর বাবার জন্যে।'

যাচ্চলে! মনে মনে বলল ফটিক। বাবাটা থাকলে হাঁ হয়ে যেত। কিন্তু বাবা মরলই বা কেন? বাবা কি ঘুঁষ নিত। দুৎ, নেবার মত চাকরিই করত না বাবা। লক্কা কি বদলা নিল? পালিতকে হাপিস করার বদলা। ফটিককে না পেয়ে বাবার ওপর ঝাড়ল?

'কবে হয়েছে ব্যাপারটা?' ফটিক হঠাৎ বুকের ভিতর একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। ওর মনে হচ্ছিল কিছু একটা হয়ে গেছে ওর, ভীষণ খারাপ কিছু একটা।

'কাল ভোরে।' রবি সিগারেট ধরাল।

'আমাকে খবর দিসনি কেন?'

'জানতাম না তুই কোথায় আছিস।'

'আজ জানলি কি করে?'

'বাঃ হারু ঘোষ বলল, রবি চল আমার সঙ্গে।'

'হারু ঘোষ বলল?' ফটিক অবাক।

'হ্যাঁ। হারু ঘোষই তো লাস নিয়ে এসেছে হাসপাতাল থেকে।'

থমকে দাঁড়াল ফটিক। হারু ঘোষ জানতো, ফটিকের বাপ মরেছে জানতো, নিজে গেছে অথচ শালা একবারও বলেনি ওকে। একই ঘরে শুয়েছে রাত্রে, এমনকি কাল রাত্রেও শালা ধনধান্যে গেয়েছে। এবার তুমি হাপিস হবে হারু ঘোষ। কোমরে হাত দিল ফটিক। ছুরিটা নেই। আসার সময় হারু ঘোষের কুঁজো থেকে ছুরিটা তোলা হয়নি।

বাড়ির কাছে একটা ছোট্ট জটলা দেখতে পেল ফটিকচাঁদ। বাপ টেঁসেছে, ব্যাস এর বেশি এতক্ষণ মনে হয়নি। সেভাবেই রাস্তায় আসতে আসতে এতক্ষণ পুরো একটা সিগারেট টেনেছে ও রবির কাছ থেকে নিয়ে। কিন্তু এখন নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ওর খুব অস্বস্তি হল। ও জটলা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল। একচালা বাড়ি। সামনে উঠোন, উঠোন পেরিয়ে টিনের দরজা; দরজার ওপারে রাস্তা। উঠোনে ভিড়টা বরফ হয়ে আছে যেন। কোন শালা নড়ছে না। সব যেন মাকালীর বের করা জিভ গিলে বসে আছে। উঠোনের মধ্যে দড়ির খাটিয়ায় বাবাকে শুয়ে থাকতে দেখল। ফটিক একবার চোখ কুঁচকে দেখল লাসটাকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা। চুলগুলো দেখা যাচ্ছে। শালা ঠিকঠিক ওর বাপতো! কাপড়টা সরিয়ে একবার দেখলে কেমন হয়! নাকি ভড়কি। ফটিককে ধরার একটা গেঁড়াকল। ফটিক কয়েক পা এগিয়ে খাটিয়ার পাশে ঝুঁকে দাঁড়াল। আশে-পাশের লোকগুলো হঠাৎ যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। 'ফটিক—হ্যাঁ, দুখীবাবুর বড় ছেলে' এসব কথা ফটিকের কানে এল। ফটিক হঠাৎই

বাঁ হাত বাড়িয়ে এক টানে সাদা কাপড়টা মুখ থেকে সরিয়ে ফেলল। একটা অস্ফুট চিৎকার উঠল জনতার মধ্যে, ফটিক হাঁ করে পাথরের মত কিছুক্ষণ চেয়ে রইল লাসটার মুখের দিকে। এই ওর বাপ? দুখারাম মণ্ডল? নাক নেই, মুখের মাংসগুলো ঝুলছে, সমস্ত মুখ পুড়ে কালো। তাকানো যায় না। ফটিকের মাথা ঘুরতে লাগল। ও মাথা তুলে একটু দাঁড়াতে চাইল। তারপর কয়েক পা হেঁটে থপ করে বারান্দার কোণে বসে পড়ল। ফটিক এরকম বীভৎস মুখ কোনদিন ছাখেনি। ও চোখ বন্ধ করেও যেন দুখীরামের পোড়া মুখ দেখতে পাচ্ছিল। পাশ থেকে রবির গলা শুনল ফটিক, 'শালারা একদম মুখে বোম ঝেড়েছে।'

'বদলা নেব, আমি বদলা নেব।' ফটিক বিড়বিড় করল। তারপর আবার মুখ তুলল ফটিক। এর মধ্যে আবার কে যেন কাপড়টা টেনেটুনে দিয়েছে। বেশ ভদ্রলোকের মত দেখাচ্ছে এখন। আর অবাক কাণ্ড, ভিড়টাও কেমন পাতলা হয়ে যাচ্ছে। শালারা যেন সব মুখ দেখতে এসেছিল। কনেবৌএর মুখ, বাচ্চার মুখ আর লাসের মুখ—সব শালার মুখ দেখার নোলা।

এতক্ষণে মাকে মনে পড়ল ফটিকের। মাকে দেখতে পাচ্ছে না সে। ওর ভাই বিমল ক্লাস এইটে পড়ে, চুপচাপ বাপের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। ছোটগুলো এপাশ ওপাশ ছড়িয়ে। এমন সময় হারু ঘোষকে দেখতে পেল ফটিক। কোমরে গামছা। কখন এসেছে টের পায়নি ও।

'এবার যাওয়া দরকার ফটিক।' হারু ঘোষ বলল।

ফটিক কিছু বলল না। রবি উঠে দাঁড়াল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'আপনারা এবার যান, আমরা বেরুবো এখনই।' ভিড়টা ক্রমশ বেরিয়ে গেল উঠোন থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দৌড়ে নিমাই ভিতরে ঢুকল। ওর মুখ উত্তেজনায় কাঁপছে। 'ফটিক, সব্বনাশ হয়ে গেছে মাইরী,' তোতলাচ্ছে নিমাই।

ফটিক তাকাল।

'পি. কে. ডি আসছে ভ্যান নিয়ে। তোর বাড়ি সার্চ করবে।'

'সার্চ করবে?' তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ফটিক 'কে খবর দিল?'

'জানি না। তবে লঙ্কা কিছু বলতে পারে।' নিমাই হাঁপাচ্ছিল। ফটিক কি করবে বুঝতে পারছিল না। তারপর সটান ভিতরে ঢুকে গেল। ঢুকতেই ঘরে মাকে দেখতে পেল ও। মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। দাঁতে দাঁতে আঁটা। ফটিক দ্রুত পা চালিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। বাঁ দিকের কোণে তাকের ওপর থেকে ভাঙা মাটির হাঁড়িটা নামাল। তারপর সাবধানে উঠোনে নিয়ে এল। এখন উঠোনে ওরা চারজন ছাড়া কেউ নেই। বাচ্চাগুলো হাঁ করে দেখছে ও বারান্দা থেকে। ফটিক টান মেরে দুখীরামের ওপর থেকে সাদা কাপড় সরিয়ে ফেলল। তারপর হাঁড়ির পেট থেকে একটা একটা করে দশটা পেটো বের করে দুখীরামের বগলের তলায়, দুপায়ের ভিতরে সাজিয়ে দিল। তারপর আবার কাপড়টা টেনে দিয়ে বলল, 'নে এবার বাঁধ।'

সঙ্গে সঙ্গে রবি আর নিমাই বসে গেল দুখীরামের লাসের কাপড় খাটিয়ার সঙ্গে বাঁধতে। হাঁড়িটাকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলল ফটিক বাইরে। হারু ঘোষ হাঁ করে দেখল ব্যাপারটা। তারপর হাসল, 'জব্বর মাথা তো তোর ফটিক।' ফটিক ঘুরে দাঁড়াল হারু ঘোষের দিকে 'খবরদার, একটু যদি বমি করেছ তো বাপের মত মুখ করে দেব, খেয়াল থাকে যেন।'

ওদের লাশ বাঁধা হয়ে গেলে রবি বেরিয়ে পড়ল কয়েকজনকে খবর দিয়ে আনতে। এমন সময় ঘরের ভিতর একটা গোঙানী উঠল। ফটিক দেখল ওর মা বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে। চুল খোলা কাপড় লোটানো, প্রায় দৌড়ে আসছে গোঙাতে গোঙাতে বাপের দিকে। ফটিক গিয়ে নিজে জড়িয়ে ধরল, 'না যেওনা, চল ঘরে চল।' মায়ের গায়ে এত শক্তি কি করে এল কে জানে। ফটিক ধরে রাখতে

পারছিল না। কিন্তু মাকে এখন ছেড়ে দেওয়া যায় না, গিয়ে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে দুখীরামের ওপরে, তাহলে আর দেখতে হবে না। মাকেও শোয়াতে হবে খাটিয়ায়। ফটিক হয়ত ধরে রাখতে পারত না কিন্তু হঠাৎ মা গোঁ গোঁ করে উঠল আর তারপরেই দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে! যাক বাবা, বাঁচা গেল, এখন থাক কিছুক্ষণ অজ্ঞান। হারু ঘোষ গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেবার পর ওরা যখন লাশ নিয়ে বেরুল বাড়ি থেকে ঠিক তখনই পি, কে, ডির ভ্যানটা এসে দাঁড়াল দরজায়। ফটিক দেখল গাড়ি থেকে খান চারেক রাইফেল নামল লাফিয়ে আর খোলা রিভলভাল হাতে স্বয়ং পি, কে, ডি।

'এ্যাই, দাঁড়াও।' পি, কে, ডি হাঁকল।

ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। খাটিয়ার সামনের দুই পা ধরেছিল হারু ঘোষ আর নিমাই পেছনে রবি আর ফটিক। আশেপাশে আর কয়েকজন।

রিভলবার দোলাতে দোলাতে পি, কে, ডি ওদের সামনে এসে দাঁড়াল, 'বাঃ, সব কটা চাঁদুই যে আছ দেখছি। কি, বাপকে পোড়াতে যাচ্ছ নাকি, এ্যাঁ! তিনদিন ছিলে কোথায়?'

ফটিক আরও জোরে বাপের পা মাথার কাছে ধরে রাখল, কোন কথা বলল না।

ওরা দাঁড়িয়ে থাকল। পি, কে, ডির লোকগুলো বাড়িতে ঢুকে গেল। ওদের চিৎকার, জিনিস ভাঙার শব্দ ফটিক শুনতে গেল। ও দাঁতে দাঁত ঘষে একটা রাগকে সামাল দিচ্ছিল। একটু পরেই লোক গুলো বেরিয়ে এল। ওরা পি, কে, ডির সঙ্গে ফিসফিস করে কি যেন বলতেই পি, কে, ডি ফিরে গিয়ে ভ্যানে উঠল। এতক্ষণে ওদের মধ্যে একটা প্রাণ চলকে উঠল। হারুদা চীৎকার করল, 'বল হরি' ওরা সবাই জানান দিল, 'হরি বোল।' ওরা লাশ নিয়ে এগোতে লাগল। পি, কে, ডির ভ্যান ওদের পাশ কাটাতেই ফটিক পাড়া কাঁপিয়ে চিৎকার করল, 'বল হরি' সমান তালে ওরা বলল, 'হরি বোল।'

ক্যাওড়াতলার দিকে যাচ্ছিল ওরা। এখান থেকে অনেকটা পথ। ওরা প্রায় দৌড়োচ্ছিল। এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। প্রচণ্ড শব্দে হরিধ্বনি দিচ্ছে ওরা। ফটিক দেখল হরিধ্বনি দিতে দিতে নিমাই হাসছে। রবিকেও হাসতে দেখল ও। আশেপাশের বাড়ির দরজা বন্ধ। জানালার খড়খড়ি তুলে কেউ কেউ দেখছে। ওরা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছিল আর পাড়া কাঁপিয়ে হরিধ্বনি দিচ্ছিল। ঠিক সমান তালে ছোটা হচ্ছিল না বলে বাবাকে মাথার ওপর নাচতে দেখল ফটিকচাঁদ। শালার পাটা খাটিয়া থেকে বের হয়ে ফটিকের মাথার ওপর এসে পড়ছে বারবার। ফটিক চলতে চলতে পা দুটাকে ভিতরে সরিয়ে দিল। দেখো বাবা, আবার মালগুলো চটকে দিও না। তাহলে তোমার সঙ্গে আমরাও যাব। পি, কে, ডি আচ্ছা ঘোল খেল। মাইরী বাবা, তুমি আমাকে দারুণ বাঁচালে। ফটিক মুখটা ছুঁচোর মত করল। ওদের হাসতে দেখে প্রথমটায় বিরক্তি লেগেছিল ওর, কিন্তু কিছু বলল না।

রবি বলল, 'এই ছাখ তোর বাপের পাটা কেমন নাচছে, তড়াক তড়াক।'

কথাটা এমনভাবে বলল যে ফটিক হেসে ফেলল, 'বাবা মাইরী দারুণ ফুটবল খেলত।' ও কাঁধটা আর একটু সরিয়ে আনল খাটিয়া থেকে। পাটা আবার বেরিয়ে আসছে। বেঁচে থেকে বাপ বলত 'তোর মুখে লাথি মারবো', এখন টেঁসে গিয়ে শালা কাজেই তা করছে। বোমগুলো না পড়ে যায়।

হঠাৎ নিমাই থমকে দাঁড়াল। রজনী ভট্টাচার্য লেনের মুখে ওরা দাঁড়িয়ে। নিমাই বলল, 'দাঁড়া।' সঙ্গে সঙ্গে ফটিকরা দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা দেখল, রজনী ভট্টচার্য লেন ফাঁকা। মোড়ে দাঁড়িয়ে পিনাকি আর তিনটে যোগাড়ে। নিমাই চাপা গলায় বলল, 'ফটিক তুই নিচে চলে আয়।'

ফটিক বলল 'কেন?'

নিমাই হিস্‌হিস্‌ করে বলল, 'ওরা তোকে ঝাড়বে! তুই তোর বাপের পিঠের নিচে চলে আয়। জলদি।' আর একজন এসে ফটিকের জায়গাটা নিতেই ফটিক মাথা নিচু করে মৃতদেহের তলায় চলে এল। ওর চারধারে চার বাহক থামের মত দাঁড়িয়ে, মাথার ওপরে বাবার লাসটা ফাইন ছাদ। কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, দাঁড়ালেই বাবার পাছায় মাথা ঠেকছে।

ওরা ঐভাবে কয়েক পা হাঁটল। ফটিক গলার রগ ফুলিয়ে বিকট গলায় চিৎকার করল, 'কোন শালা যদি আমার বাপের গায়ে হাত দেবে তো ভীষণ খারাপ হয়ে যাবে। আমার বাবার বদলা আমি পরে নেব, এখন আমরা শ্মশানে যাচ্ছি।'

ওপাশ থেকে ওরা যেন এদৃশ্য দেখে একটু থমকে গেল প্রথমটায়, তারপর পিনাকির গলা শোনা গেল, 'এক বাপের ছেলে হোস তো বেরিয়ে আয় শালা, বাপবেটার চিতার আলাদা খরচা হবে না।'

রবি বলল, 'ফটিক, তোর বাপের পেট থেকে মাল বের করব?'

সামনে থেকে নিমাই জানাল, 'না।'

ওরা ঐ ভাবেই চলতে লাগল। পিনাকিরা আর কোন আওয়াজ দিল না! ওরা রজনী ভটচাযের গলিটা পেরিয়ে গেল। বাবার শরীরের তলায় হাঁটতে হাঁটতে পিনাকির উদ্দেশ্যে একটা খিস্তি করল ফটিক। তারপর বাবার গায়ে একটা হাত নিচ থেকে ছোঁয়াল, 'তুমি মাইরী টপ্‌ বাবা—আর একবার আমাকে বাঁচালে।'

খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে ওরা হরিধ্বনি দিচ্ছিল। হঠাৎ নিমাই চীৎকার শুরু করল, 'যাচ্ছে কে?' সঙ্গে সঙ্গে ওরা ধুয়ো তুলল, 'ফটিকের বাপ। যাচ্ছে কে—ফটিকের বাপ।' ফটিক, 'এ্যাই কি হচ্ছে কি, কি হচ্ছে কি' বলে মাথা তুলতেই বাপের পায়ে মাথা ঠেকলো। হঠাৎ ওর কপাল ছুঁয়ে চোখের পাশ ঘেঁষে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। ফটিক অবাক হয়ে গেল, জল এল কোত্থেকে? 'এই জল পড়ছে কেন ওপর থেকে?' ও চেঁচাল।

নিমাই অবাক।

'হ্যাঁ মাইরী, আমার মুখে পড়ল।'

রবি হাসল হি হি করে, 'তোর বাপ তোর মুখে ইয়ে করেছে রে কটকে।' ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল ফটিকচাঁদ। ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কি হল? আঙ্গুল দিয়ে জলটা অনুভব করল সে। তুমি আমার মুখে—বাবাগো! ফটিক কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ল। আমি তোমার অধম সন্তান বাবাগো! ফটিকের বুকের ভিতরটায় কি একটা ডুব মারছিল। ওরা মৃতদেহ নিয়ে অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে। তালেতালে দুখীরামের শরীরটা নাচছে খাটিয়ার ওপরে। দূর শালা! লাশ কি কখনও পেচ্ছাপ করে নাকি! মরে গেলে সবই চোট হয়ে যায়। মজাকি! ফটিক খুব খুশি হয়ে সামনের দিকে তাকাল। ওরা যেভাবে প্রায় ছুটতে ছুটতে মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে তাতে যে কোন মুহূর্তেই বিপদ ঘটতে পারে, এক একটা পেটোর যা দাম।

ফটিক চিৎকার করে ওদের থামতে বলল। তারপর দৌড়ে প্রায় ওদের ধরে ফেলল। ঠিক তখনই দুখীরামের একটা পা খাট থেকে নিচে ঝুলে পড়ছে দেখতে পেল ফটিক। ফটিক চেঁচিয়ে কিছু বলার আগেই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেল। ওর মনে হল ওর শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ওকে ছেড়ে ছেড়ে যাচ্ছে। একটা দারুণ যন্ত্রনায় নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করতে করতে ফটিক জীবনের শেষ শব্দ উচ্চারণ করল, 'বা-বা-গো।'

এই প্রথম, কবেকার হারানো শৈশবের পর এই প্রথম ফটিকচাঁদ অবোধ শিশুর মত দুখীরামকে ডেকে ফেলল। একদম ছেলেমানুষের মত।

আঙ্কিক নিয়মে

সমীর রক্ষিত

দ্রুতহাতে দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে দূর থেকে বাবার ওপর নজর রাখছিল অজয়। বাইরের ঘরে টেবিলের ওপর গতকাল দিল্লী থেকে আসা ফরম্‌টা টান টান করে পেতে, তার ওপরে পেনটা চাপা দিয়ে রেখে এসেছে সে—যদি বাবা একবার দাঁড়িয়ে দেখে যায়। নাহ্‌—অজয় দেখল বাবা যথারীতি বাজারের থলে হাতে নিয়ে টেবিলের পাশ কাটিয়ে দরজা পেরিয়ে চলে গেল। মাথাটা সামান্য কাত করে একবার দেখল বলেও মনে হল না।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুখ ধুয়ে, ব্রাশ ঝাড়তে ঝাড়তে ছুটে এল অজয়, দরজা পেরিয়ে সিঁড়ির মুখে পৌঁছে দেখল বাবা সিঁড়ি দিয়ে প্রায় দোতলার কাছাকাছি নেমে গেছে। পাঁচতলা বাড়ির সিঁড়িটা প্রায় অন্ধকার, বাবার কালো মাথাটা দেখা যাচ্ছে না, শুধু আবছা ধুতি পাঞ্জাবী নেমে যাচ্ছে। অজয় একবার ভাবল দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর নামতে ইচ্ছা হল না, ফিরে এল নিজের টেবিলে।

ফিরে এসে বরং একটু হাল্কাই লাগল তার মনটা। এই মুহূর্তে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারত। টাকা পয়সার প্রতি বাবার মমতা চিরকালই একটু বেশী। অপত্যস্নেহের চেয়েও তা কখনো কখনো অনেক

বেশী জোয়ালো। আগে অন্তত যা না করলে নয়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা নেহাৎ কর্তব্য বলেই বাবা করেছেন, শক্ত মুঠি আলগা হয়েছে কখনো। হাতে তুলে দিয়েছে দুপাঁচটাকা। বিশেষ করে কাগজে চাকরীর বিজ্ঞাপন চোখে পড়লেই ছুটে আসত—'নাও একটা এ্যাপ্লাই করে দাও'—বলে নিজের মনেই যেন হিসেব করে দেখত। তারপর বলত-'এতে তো খরচ টরচও হয়, মুখফুটে বলবে তো?' এরপরে পার্সের পেটের ভেতর থেকে দু একটা নোট বের করে হাতে দিত। কিন্তু সেসব দিন যেন পুরনো হয়ে গেছে। বাবা আর এসবের মধ্যে নেই, গত দুতিন বছরে যেন তার সব দেখা শেষ হয়ে গেছে, সমস্ত কোমল আশা পাথরের মত নিরেট শক্ত হয়ে গেছে। কাজেই ইদানীং টাকা চাইতে গেলে—'টাকা?' —বলে এমন একটা মুখভঙ্গি করে, অজয়ের মনে হয় তার নাকের ডগায় যেন একটা তাতাল ইস্ত্রি উদ্যত হয়ে আছে।

বাবাকেই বা একলা দোষ দিয়ে কী হবে? চেয়ারে কুঁজো হয়ে বসে ইউ পি এস্ সির ফরমটা উল্টে যেতে যেতে তার মগজে যেন পিন ফুটতে লাগল। গোটা কয়েক সার্টিফিকেট চাই, জনা দুতিন জাঁদরেল লোকের নাম চাই—তারা নাকি রেফারী, এ ছাড়া চরিত্র, শিক্ষা সব কিছুর অনুপরমাণু বিবরণ দিতে হবে। উপরন্তু প্রথম পাতাতেই একটা ছক কাটা আছে—সেখানে সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজ টাটকা ফোটোগ্রাফ দিতে হবে। 'শালা'—সম্ভবত নিজেকেই শোনাল অজয়—দুনিয়ার সবাই কী চোর জোচ্চোর নাকি? সবারই একটা ফটোগ্রাফ দিতে হবে? আসলে সবারই টু-পাইস খসিয়ে নেবার মতলব—নিজের মনেই বিড় বিড় করল অজয়।

ছোট বোন লীনা গম্ভীরভাবে চা দিতে এসে আরো গম্ভীরভাবে তাকে দেখল। তার দু-পিস পাঁউরুটি আর চা রেখে সে ঠোঁট উল্টে চলে যাচ্ছিল, ভুরুর তলায় চোখের মনি উঠিয়ে অজয় তাকে ডাকল—'শোন্।' তারপর সাদাগলায় জিজ্ঞেস করল—'সব সময় মুখটা ওরকম

ভেগু ভেগু করে থাকিস কেন বলতো ?' 'ভেগু ভেগু আবার কী ?'—লীনার তীক্ষ্ণ প্রশ্ন। 'ওই যেরকম তাকিয়ে থাকিস—মাংসের চপের মত মুখ করে।' 'তবে কী সব সময় নেচে নেচে বেড়াব নাকি ?' লীনার স্পষ্টোক্তি।

'যাক গে'—অতঃপর আত্মসম্মান রক্ষার্থে অজয় গম্ভীর হবার চেষ্টা করে—'বাবা বাজার থেকে কখন ফিরবে রে ?' সাধারণত বাজার থেকে ফেরার আগেই অজয় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। কাজেই অজয়ের মুখে আজ হঠাৎ বাবার কথা শুনে অবাক হল লীনা—সে চোখ কোঁচকাল, 'কেন ?' হঠাৎ রেগে গিয়ে হাত নেড়ে অজয় তিক্ত গলায় বলে ওঠে—'সব ব্যাপারে খালি বুড়োদের মত কেন আর কেন।'

লীনা উগ্র পায়ে চলে যায়। লীনা একবার স্কুল ফাইন্যাল ফেল করেছে, আবার দেবে, ওর মুখে কখনো হাসিটাসি দেখা যায় না।

ডাস্টবিন থেকে নোংরা তোলার ভঙ্গিতে চিমটি কেটে ফরমটার আরেকটা পাতা ওল্টাল অজয়। আট টাকার পোস্টাল অর্ডার চাই। একেবারে ভাগ্নের আব্দার। সবাই যেন টাকার ডিমে বসে তা দিয়ে যাচ্ছে। অত সাধের নবভারতের মহান সব কারিগর তৈরী করে চাকরি দিতে পারছে না, উল্টে ব্যবসা হচ্ছে। কত হাজার অ্যাপ্লিকেশন পড়বে তিনটে অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ারের জন্য ? লাখের কাছাকাছি তো বেকার। অবশ্য কেতা, চাল সব ঠিক আছে, যারা ইন্টারভিউ পাবে, তাদের দিল্লী যাতায়াতের রেলের সেকেণ্ডক্লাস ভাড়া মিলবে। কিন্তু তেমন ভাগ্যবানই বা কজন ? পেপার-টেপারে এ নিয়ে লেখা উচিত—অজয় ভাবল। অবশ্য লিখলেও বা কী লাভ। উত্তরে তাড়া তাড়া চিঠি আসবে—কিছু ডিফেণ্ড করে কিছু বিপক্ষে—কত কূট তর্কাতর্কি—কত জ্ঞান চলবে—শেষমেষ কোন্‌টা ন্যায় আর কোন্‌টা অন্যায়—সব এমনভাবে গুলিয়ে যাবে যে কাঁদানে গ্যাসের মত চোখ থেকে টেনে জল বের করে ছাড়বে।

অতএব চেপে যাও কিছু বলতে গেলেই কেওস, প্রব্লেম। অথচ আজকালের মধ্যেই অ্যাপ্লিকেশনটা পাঠানো দরকার, চার পাঁচ দিন পরেই লাস্ট ডেট। কাজেই গোটা বিশেক টাকা আজই দরকার। যে দু চারজন চাকুরে বন্ধুবান্ধব রয়েছে, তারাও আজকাল যেন ছায়া দেখে আঁতকে উঠছে, ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত সবার গাড়ি একই লাইন ধরবে, 'ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ, বুঝলে? কোনদিন যে লক আউট ডিক্লেয়ারড হবে সে একমাত্র যীশুই জানে।'

'ধ্যেত্তেরি'—খাঁচ করে পাঁউরুটিতে কামড় বসাল অজয় দম বন্ধ করে। কাঁচা পাঁউরুটির গন্ধ সে কিছুতেই সইতে পারে না, রুগী রুগী হাসপাতাল হাসপাতাল লাগে। তাড়াতাড়ি এক ঢোঁক চা গিলল সে। 'কাকেই বা জোর করে কী বলা যায়?' নিজের মনেই খতিয়ে দেখল অজয়। ছোটবেলায় কিছু অপছন্দ হলে চীৎকার চেঁচামেচি করত সে, শেষ পর্যন্ত মা কিম্বা দিদি, কেউ না কেউ বুঝিয়ে সুঝিয়ে মিটিয়ে দিত কিন্তু এখন এই চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়েসে কী পাউরুটি নিয়ে দাপাদাপি করা যায়, না উচিত? মা বেঁচে থাকলে—হঠাৎ মাঝেমধ্যে অভিমান নামে গোটাকয়েক ডেঞ্জ পিঁপড়ে বুকের ভেতরে কুচকুচ করে কামড়ে দেয়, জ্বালা করে। 'ধ্যুৎ যত্তসব বোগাস সেন্টিমেণ্ট।'—ক্ষুব্ধ গলায় ফিসফিস করতে করতে কোঁৎ করে সবটা চা একেবারে গিলে ফেলে অজয়।

এরপরে ফরমটা টান করে পেতে কলমটা বাগিয়ে নেয় অজয়। প্রথমেই বড় হরফে নিজের নামটা লেখে, খুব মনোযোগ দিয়ে এবং যত্ন করেই লেখে। ছোট বেলায় কিছু লেখা শুরু করবার আগে মা সরস্বতীর নাম করে নিত কিন্তু এখন সে পাট নেই, অথচ বুকের ধুকপুকটা ঠিক আছে, কারণ এই লেখার ওপরই তো ভবিষ্যতটা বাজি রাখা হচ্ছে।

এরপরের ঘরেই বাবার নাম, তারপর বাবার পেশা। নামটা লিখে পেশার ঘরে গিয়ে ইতস্ততঃ করল অজয়। ঠোঁটটা তার বাঁকা

হাসিতে ছুঁচলো হল,—ওরা কী চাকরী প্রার্থীর উত্তরাধিকারও যাচাই করে নিতে চায় নাকি? তবে তো 'সরকারী চাকুরী'—শুধু এই কথাটার সঙ্গে আরো দুয়েক ছত্র যোগ করে দেয়া উচিত, কীরকম উপরি মান সম্মান বাবার। সেলট্যাক্স অফিসে চাকরি, একটা সেকশনের বড়বাবু না কী যেন, অতএব বাঘা বাঘা সব ক্লায়েন্টকে আসতে দেখেছে সে বাবার কাছে। কেউ ট্যাক্সি কেউ নিজস্ব গাড়ি নিয়ে আসে। কেউ কেউ রাতবিরেতে বাবাকে বাড়িও পৌঁছে দিয়ে যায় গাড়ি করে।

বাবা অবশ্য কেশব সেন স্ট্রিটের এই দু রুমের ভাড়া বাড়িতে বসে তাদের সঙ্গে কোন সরকারী কথা বলে না, চারিদিকে অনেক আজেবাজে লোক, তাই চলে যায় দূরে একেবারে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের ভেতরে—কোন চায়ের দোকানে। তারপর ফিরে এসেই সোজা ঢুকে যায় ভেতরের ঘরে, কোনের দিকে পুরনো আমলের রঙচটা মজবুত ষ্টীল ট্রাঙ্কের ডালাটা খোলে, তারপর—রহস্যময় অন্ধকারে খুব সন্তর্পণে খুব যত্নে কোমর থেকে কিছু বের করে রেখে দেয়। কোন মা যেমন করে তার ঘুমন্ত সন্তানকে শুইয়ে দেয় তেমনি স্নেহার্দ্র ভঙ্গি। তারপর গদরেজ তালাটা বন্ধ করার পরেও বার বার টেনে টেনে পরখ করে, সত্যি বন্ধ হয়েছে তো!

অজয় জেনেশুনেই—ঠিক এর কিছুক্ষণ বাদেই দুয়েকদিন টাকা চাইতে গেছে। 'টাকা? টাকা আমি কোথায় পাব?' নির্বিকার নির্লিপ্ত, সংসার-নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর মত অভিব্যক্তি। অবশ্য সে শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপরই মুখের চেহারা আস্তে আস্তে আমুল পাল্টে যায় বাবার—'তোমরা তো আমার কথা কেউ ভাবলে না। ধারে-দেনায় আমি তলিয়ে যাচ্ছি।' একথাগুলো সম্ভবত ঘরের দেয়ালেরও মুখস্ত হয়ে গেছে।

এসব কথার কোন উত্তর দেয় না অজয়, বরং চুপচাপ কেটে পড়ে বাড়ি থেকে। কিন্তু এই 'ধার-দেনা' কথাটার মধ্যে তার পড়া

শুনার খরচের একটা স্পষ্ট তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত আছে—এটা মনে হলেই ঘরের কোণে চোখ চলে যায় অজয়ের গদরেজ তালাটার দিকে। 'আর কতদিন চলবে এরকম করে? আমি তো দু চোখে পথ দেখছি না'—বাবার এ কথার উত্তরে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অজয়। তারপর হঠাৎ ট্রাঙ্কটা দেখিয়ে বলতে ইচ্ছা করে—'কী আছে ওতে? একবার যদি'—যদিও কিছুই বলে না অজয়—কিন্তু কথাটা তার ভেতরে ভেতরে চাড় দেয়—বিশেষ করে ভোরবেলায়।

রোজ খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে বাবা আসন পেতে বসে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে। তারপর জপতপ হয়ে গেলে উঁচু গলায়—'অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়', কিম্বা 'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি—দ্বিষো জহি'—ইত্যাদি সব পাঠ করে সংস্কৃত থেকে। তখন আবেগে কম্পিত তার কণ্ঠস্বর ভোরের শীতল বাতাস মন্থর করে দেয়। তখনো ঘরে আবছা অন্ধকার থাকে, সামনে প্রদীপ জ্বলে—ধূপকাঠি। তখনই ঘুম ভেঙে যায় অজয়ের। সে সংস্কৃত তেমন ভাল বোঝে না, কিন্তু সারারাত নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে কিম্ভূত কিমাকার সব স্বপ্ন বুকের ভেতরে দাপাদাপি করে যায় বলে ভোরবেলায় ক্লান্ত লাগে আর তখন জড়িত চেতনায় কত কী ভাবতে ভাবতে বাবার গলা শুনে মনটা কেমন যেন হয়ে যায়, তখন একবার বাবার কাছে যেতে ইচ্ছা করে অজয়ের, আস্তে করে উঠে গিয়ে বাবার পাশে স্থির-শান্ত হয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা করে, তারপর বলতে সাধ হয়—'কী পড়ছ এসব বাবা? কী প্রার্থনা করছ?'

সত্যি সত্যি কোনদিন এসব কথা বললে, হয়তো বাবার কাছ থেকে একটা উত্তরও পাওয়া যাবে; যেমন ছোটবেলায় বাবার মুখে শুনত, এখনো শোনে মাঝে মধ্যে,—'খাঁটি ব্রাহ্মণ সন্তান আমরা বুঝেছ?—আর্যদের বংশধর।'

আর্যদের বংশধর! সেই যাঁরা হিন্দুকুশ সুলেমান পর্বতমালা

পায়ে হেঁটে পার হয়ে এসেছিল, দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ প্রশান্ত ললাট, ঈশ্বরের কতিপয় জ্যোতির্ময় পবিত্র সন্তান। পায়ে কাঠের পাদুকা —হাতে কমণ্ডলু, মুখে সামগান, তাঁরাই তাদের পূর্বপুরুষ—ছেলে-বেলায় এসব কথা ভেবে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। কিছুদিন আগে বাবার অফিসে বাবাকে নিয়ে যেন কী সব ঝামেলা হয়েছিল, কী সব যেন হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তখন কয়েকদিন বাবার পূজার সময়, পাঠের সময়, প্রার্থনার সময় দীর্ঘতর হয়েছিল : কণ্ঠস্বর আরো জোরালো।

'এসব কথা কী বাবার পেশার ঘরে লেখা উচিত?'—নিজেকেই যেন একটা চিমটি কেটে জিজ্ঞেস করে অজয়। বাবাকে কী এসব কথা বলা যায়? মনের ভেতরে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা এসব কথা যদি একদিন লাফিয়ে ওঠে জিভের ডগায়? 'না'—নিজের মনেই বিচার করে দেখে অজয়—এসব কথা কোন ছেলের বা মেয়ের পক্ষে তার বাবাকে বলা উচিত নয়। কারণ বাবারা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং তাঁদেরও আত্মসম্মানবোধ আছে। বস্তুত জন্ম দিয়ে তারা শুধুই শাসন করবার অধিকার অর্জন করে। এসব ভেবেই বাবার মুখোমুখি প্রায় হয় না সে। কোনদিন বাবা ঐ দরজা দিয়ে ঢুকলে সে ওদরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

বস্তুত ইদানীং সে আগের তুলনায় অনেক কম কথা বলে। যা বলে সে শুধু নিজের সঙ্গে, সে বলে আর ভেতরের আরেক অজয় শোনে এবং উত্তর দেয়। ফলে ভেতরে ভেতরে সে যেন দুভাগ হয়ে গেছে। এত করেও মাঝে মধ্যে মেজাজটা একেবারে বয়েলিং পয়েন্টে চলে যায় তার। কারণ বাবা সুযোগ করে নেবেই এবং শোনাবে : 'সল্ট লেকের জমির বাকী টাকাটা দিতে হবে, এদিকে মেয়েটার বিয়েও আর না দিলে নয়, এতসব কী আমার একার পক্ষে সম্ভব?' কারো পক্ষেই স্বর্গের সোনার সিঁড়ি তৈরী করা সম্ভব না—বলতে ইচ্ছা করে অজয়ের কিন্তু সে নিরুত্তর থাকে।

'লোকে ছেলে মানুষ করে দু পয়সা সাহায্যের জন্য, কিন্তু আমার কপালই এমন টাকাই ধ্বংস হল এক কাঁড়ি—একটা পয়সার মুখ দেখলাম না এখনও।'—বাবা এখানেও থামে না—'উল্টে এখনো হাত পেতেই রয়েছে। মরা ব্যাঙের পেশীও বিদ্যুত প্রবাহে কেঁপে ওঠে, অজয় জ্যান্ত একটা মানুষ, তার সর্বাঙ্গের পেশী তন্ত্রী ঝলসে ওঠে। আর তখনই শরীরের কুকুরকুণ্ডলী ছাড়িয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে মুখোমুখি দাঁড়াতে ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে সব কিছু দুহাতে লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

কিন্তু কিছুতেই এই কুকুরকুণ্ডলীটা ছাড়ানো হয় না—কেমন যেন আলস্য লাগে, সব কিছু অর্থহীন মনে হয়। সকাল সাতটা আটটা অবধি ঘুমিয়ে, কিম্বা ঘুম থেকে জেগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজেকে অতি প্রাচীন এক জরদ্গব জন্তুর মত মনে হয়। কখন যে থপথপ করে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে পড়া যাবে। তারপর কফি হাউসে গিয়ে উজবুকের ভঙ্গিতে হাতের শূন্য তালুতে সোনালী রঙের মরা ভোমরার মত সময়কে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকা। তখন হঠাৎ মাঝেমাঝে নির্বোধের মত মনে হয়—এখন এই মুহূর্তে হয়তো পৃথিবীর কোন প্রান্তে দ্রুততম ট্রেন ছুটছে, দীর্ঘ রানওয়ে কাঁপিয়ে হয়তো একটা জেট প্লেন উড়ল কোন এয়ারপোর্ট থেকে কিম্বা হয়তো এই মুহূর্তে কোথাও নাপাম বোমা পড়ল।

আশ্চর্য ফ্যাকাশে স্কাইলাইট কফি হাউসের। 'কিবে শালা, ঘুমুচ্ছিস নাকি?' কোন বন্ধুবান্ধব—প্রণব কিম্বা তরুণ হঠাৎ এসে পিঠ থাবড়ায়—'লে, কফি খাওয়া দেখি!' 'কফি খাওয়াব আমি!'—হাই তোলে অজয়—'চাকরি বাকরি হলে খাওয়াব।' 'তবে তো সারা জীবন অপেক্ষা করতে হবে।'—প্রণব যদি এ কথা বলে, তরুণ বলবে —'চাকরি বাকরীর আর তো কোন আশাই পাচ্ছি নারে।' ছাড় তোদের প্যান-প্যানানি—' একমাত্র সমর এলেই হাওয়া গরম হয়ে ওঠে, ও কলেজ থেকেই 'রাগী ছোকরা' নামে পরিচিত। ও টেবল

চাপড়ে বলে—'চাকরি ওরা দিতে বাধ্য হবে, টাকা খরচা করে কী এমনি পড়েছি নাকি।' 'তা তোর অ্যাসোসিয়েশনের কী হল, বেকার এঞ্জিনীয়ার সমিতি ?' প্রণব কটাক্ষ করে। সমর বক্তৃতা দেয়—'জোর হচ্ছে! এটা একটা অল ইণ্ডিয়া অরগানিজেশন হতে যাচ্ছে।' 'ও করে কিছু হবে ?'—অজয় সন্দেহের গলায় বলে। 'তোদের মত সব ভদ্দরলোকের ছেলে থাকলে আর কী হবে ? তোরা সব বাড়ি বসে অ্যাপ্লাই করে যাবি, হলে হল, না হলে কাঁদুনি গাইবি, ক্রুড্ করবি—কিন্তু কাজের কাজ কিছু করবি না—যত্তসব ইম্‌বেসাইল্ নপুংসক'—সমর রীতিমত রেগে যায়—'আগামী সপ্তাহে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন আছে—যাবি ?' অজয় গাঁইগুঁই করে, এ সব যে তার ভাল লাগে না, একথাটা সমরকে বলতেও খারাপ লাগে। সমর মুখ খিঁচিয়ে ওঠে, 'তা যাবে কেন, কিন্তু এ কথাও জেনে রেখো, মিত্তির সাহেবকে যতই তেল দাও, চাকরি হচ্ছে না।'

ওখানে যে হবার নয়—এটা অজয়ও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। মিত্তির সাহেবদের মিত্র অ্যাণ্ড পালুসকর কোম্পানীতে তিন বছর আগে ট্রেইনী হিসেবে ছিল অজয়, ছ'মাসের জন্য। এখনও মাঝে মাঝে গিয়ে ধর্না দেয় মিত্তির সাহেবের কাছে।—ওদের ও প্লেসের অফিস ঘরে অ্যায়ারকুলারের মৃদু ঘিস্ ঘিস্ শব্দ ঝুলন্ত সিলিং থেকে চোরা আলো ছড়িয়ে থাকে, ড্রইং বোর্ড থেকে মুখ তুলেই হেসে কোঁচকানো ভুরু টান করে দেয় মিত্তির সাহেব, 'আ ইউ ! তোমাকে তো বলেইচি, ভাই, আমাদের দরকার হলেই তোমার অ্যাড্রেসে জানিয়ে দেব। বাট্ জাস্ট নাউ'—কাঁচাপাকা চুলে পেন্সিল ঢুকিয়ে দেয় মিত্তির, 'ইম্‌পসিবল্, আমাদের এমপ্লয়ীদেরই কাজ দিতে পারছি না, আমরা ডিরেক্টররা পুরো অ্যালাউন্স নিতে পারছি না।'

অথচ অজয় নিজে চার লাখ টাকা প্রজেক্টের পুরো স্ট্রাকচারাল ক্যালকুলেশন করে ড্রইং করিয়ে দিয়ে গেছে, রাজগীরের মন্দিরের। অবশ্য তার ওপরে চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার বোস তদারকি করত। ওখানে

এখন কনস্ট্রাকশন চলছে। অজয় বলে, 'আমাকে সুইটে পাঠিয়ে দিন না।' 'ও নো, ওখানে আমাদের এক্স্‌পিরিয়েন্‌সড্‌ এঞ্জিনিয়ার মিঃ ধর রয়েছে।'—এমন চালিয়াতি করে হাসে মিত্তির রাগটা তেমন চাগিয়ে ওঠে না। 'ইচ্ছে করলে আপনারা আরেকজনও রাখতে পারেন।' অজয় বিনয় দিয়ে বশ করতে চায়। 'নো ইয়ংম্যান দ্যাট্‌স্‌ আপটু দি ক্লায়েন্ট—সেটা পুরোই ক্লায়েন্টের মর্জির ওপর।' মিত্তির গম্ভীর হয়—'ও কে।' অর্থাৎ এবারে কেটে পড়।

এমন অমায়িক গাড়লের মত না হেসে যদি কর্কশভাবে কথা বলত মিত্তির, তাহলে বোধ হয় একটা ঝগড়াঝাঁটি বাঁধানো যেত, একটা হাতাহাতি। সেটাও হয় না। শুধু লিফটে নীচে নামতে নামতে যখন তলপেট শূন্য লাগে তখন লিফট্‌ম্যানটাকেই একটা লাথি মারতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাও হয় না। কাজেই নিজের ওপরই রাগ হয়ে যায়। কাকে কী বলা যাবে? —ঠোঁট কামড়ে নিজের ওপরেই ঘেন্না ধরে যায়, রাত করে বাড়ি ফিরেই বিছানা।

বড় জোর সকালে উঠে লীনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা যায়। লীনাকে একটা জোর ধমক দেওয়া যায়, 'কী শাপের মন্ত্র পড়ছিস বিড়বিড় করে, জোরে পড়তে পারিস না।' 'আমার যেমন খুশি পড়ব তাতে তোর কী?' লীনার এক মুহূর্তও সময় লাগে না উত্তর দিতে। 'সব তো ভুল পড়ছিস।'—অজয় গম্ভীর হয়ে বলে। 'ওঃ শুদ্ধ পড়লেই স্বর্গে যাব না?' লীনা মাথা ঝাঁকিয়ে চুল ঠিক করে।

মুখ থেকে কথা নয় যেন মিসাইল ছুটে আসে। এত রুক্ষ নীরস ঝাঁঝালো ভঙ্গি লীনার—মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে। এটাই কী ওর স্বভাব, না এ রকম করেই ওর স্বভাব তৈরী হচ্ছে? ব্যোম্‌ হয়ে বসে থাকে অজয়। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে কিংবা অনেক দিন পরে, যখন এসব নিয়ে ভাবে অজয়—তখন লীনাকে ভালই লাগে অজয়ের—মনে

হয় বেশ স্পষ্ট করে মুখের ওপর সত্যি কথা বলতে শিখেছে আজকাল-কার ছেলেমেয়েরা—একটুও ভয় পায় না।

অথচ সেও তো আজকালকারই ছেলে। জলজ্যান্ত চব্বিশ পঁচিশ বছরের যুবক, হাত আছে, পা আছে, মগজ আছে। কিন্তু সে চীৎকার করতে পারে না, কারোর কলার চেপে ধরতে পারে না। আসলে এসব যে কোনদিন করতে হবে এটা ভাবাই হয়নি। ভাল করে পড়াশুনা করলে ভাল রেজাল্ট—ভাল রেজাল্ট হলে ভাল একটা চাকরিবাকরি পাওয়া যায়—এ রকমই ছোটবেলা থেকে শুনতে শুনতে সেটাই সত্যি বলে মনে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু এখন পুরো ব্যাপারটাই ভাঁওতা মনে হচ্ছে, কোনটাই যুক্তিতে দাঁড়ায় না, অঙ্কে মেলে না। অজয় হিসাব নিকাশ করে নদীর ওপরে একটা ড্যামের ড্রইং তৈরী করে দিতে পারে একটা স্কাইস্ক্রাপারের ভিত কতটা কী রকম হবে বলে দিতে পারে, কিন্তু সে বুঝতে পারে না ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটা ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি নিয়েও কেন মিস্ত্রিকে তেল দিতে হবে, কেন স্কুল টিচার না হলে একটা টিউশনি পাওয়া যাবে না, কেন ক্রিকেট টেষ্টের সময় তাদেরকে তেলেভাজার দোকান দিতে হবে। প্রণব তরুণেরা যখন তেলেভাজার দোকান করবে ঠিক করলো তখনো সমর চেঁচামেচি করেছিল, 'তোরা লোকের করুণা ভিক্ষা করছিস? তোদের একটা সেল্‌ফ রেসপেক্ট নেই—টাকা দিয়ে পড়াশোনা করছিস এই জন্যে?'

'সেল্‌ফ রেসপেক্ট! আত্মমর্যাদা! তুই বেঁচে থাক সমর; আর চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে রক্ত বের কর,—অজয় সমরকে বলেছিল—'এতেও মান মর্যাদা বাড়বে তো।' সমর গুম হয়ে শুনেছিল তারপর হঠাৎ সহজ শান্তভাবে অজয়ের পিঠেহাত বুলিয়েছিল, 'দেখি তো তোদের মেরুদণ্ড ফণ্ড আছে তো ঠিক ঠিক।' সমস্ত শরীরটা সির্ সির্ করে উঠেছিল অজয়ের।

নিজের বাঁ হাত দিয়ে সমরের হাতটা সরিয়ে দিয়েছিল অজয়।

ঠিক তখনই অথবা পরে কোন এক সময়ে, স্কুলের ভূগোলের মাষ্টার মশাইয়ের কথাটা মনে পড়েছিল অজয়ের। অসম্ভব রাগী আর কড়া, বাজপাখি বলত সবাই। হায়ার সেকেণ্ডারীতে স্কলারশিপ পাওয়ার খবর বেরবার পর হঠাৎ রাস্তায় একদিন তাকে ধরেছিল আর যা কোনদিন কেউ দেখেনি—হেসে অজয়কে কাছে ডেকে বলেছিল 'আয় তোকে আশীর্বাদ করি।' পিঠে হাত বুলিয়েছিল। আর তখন কী রকম গদ গদ হয়ে গিয়েছিল অজয়, ঢিপ করে একটি প্রণামও করেছিল সে। এখন ভাবলে নিজেকে স্রেফ নিজের হাতে জুতোতে ইচ্ছা করে।

দিন দিন নিজের শরীরটার ওপরই আক্রোশ বাড়ছে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় শরীরের সব যন্ত্রপাতি ঠিক ঠিক মত চলছে তো আর আয়নায় নিজের মুখটি খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে অজয়—নিজের চোখ নাক চিবুক নাকি আরো ভেতরে শিরা ধমনী। হাঁ করে আয়নার সামনে দাঁড়ায় মাঝে মাঝে ভেতরটা দেখে আলজিভ্ অবধি আর হাতের আঙুলে শ্বা-দন্তের ধার পরীক্ষা করে। শরীরটা ছমছম করে নিশ্বাস প্রশ্বাস জালে আটকে পড়া জ্যান্ত মাছের মত ছটফট করে, ঠোঁট ছুঁচলো করে অজয় অস্ফুটে বলে ওঠে 'হ্যালো এঞ্জিনীয়ার।'

অথচ এই ডিগ্রিটার জন্য কত কাণ্ড, কত কথা কাটাকাটি, কত মান অভিমান। মার জেদের ফলেই তার এঞ্জিনীয়ারিং পড়া, নয়তো বাবার হিসেব যথারীতি অন্যরকম ছিল গোড়াতেই: 'ওসব ঝঞ্ঝাটে গিয়ে কী কাজ, বাড়ির কাছেই প্রেসিডেন্সি কলেজ ওখানেই পড়ুক ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে। হোস্টেল ফোস্টেলের ঝামেলা নেই।' 'আশ্চর্য লোক তুমি, কটা ছেলে এ সুযোগ পায়? ও পেয়েছে।' —মা অবাক হয়ে বলেছিল। 'পেলেই তো হল না অগ্রপশ্চাৎ অনেক কিছু বিবেচনা করবার আছে।'—বাবা যেন একটা জটিল অঙ্ক কষছিল। 'তোমার বিবেচনা তো ওই টাকা, টাকার ব্যাপার না থাকলেই তুমি রাজি হয়ে যেতে।' মায়ের গলায় তখন আর

কোমলতা ছিল না। 'তোমরা তো ভাব, পয়সা খরচ করলেই ছেলে মানুষ হয়ে যায়—এখানে পড়লে ঘরের খেয়ে পড়তে পারবে।' —বাবা নিজের অঙ্কের ফল ঘোষণা করেছিল। 'তোমার টাকা তুমি বাক্সে রেখে দাও, আমি ছেলেকে গয়না বিক্রি করে পড়াব।'—যেমন সব মায়ের হয়, মাও সেই মুহূর্তে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। 'পড়াও—আমিও দেখি'—বাবার স্পষ্ট বক্রোক্তি।

গাটা ঘিন ঘিন করে ওঠে, অজয় কলমটা ফরমটার ওপরে ফেলে দেয়। বিরক্তিতে হাতের দশটা আঙুল মটকে শব্দ করে; তারপর প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢোকায়। একটা গিলে হয়ে যাওয়া চার-মিনার বের করে উঁচু গলায় হাঁক দেয়—'লীনা'। কোন সাড়া শব্দ নেই। ভেতরের ঘরে ঢুকে যায় অজয়, আগুন দরকার, রান্নাঘর থেকে দিদির খুন্তি নাড়ার শব্দ পাওয়া যায়। ইতস্তত ক'রে সে, এখনো ঠিক দিদির সামনে—সে স্মোক করে না। এসময়ে হঠাৎ ঘরের কোণে চোখ চলে যায় অজয়ের। ভোরে জ্বালা প্রদীপটার বুকের গর্তের মধ্যে ছোট্ট বিন্দু হয়ে নীল রঙের আগুন জ্বলছিল সলতের মাথায়। অজয় এগিয়ে গিয়ে সলতে উস্কে দেয় তারপর সিগারেটটা ধরিয়ে নেয়।

সলতের আগুনটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে এবং প্রদীপটা রাখতে গিয়ে, মায়ের শীতল কঠিন বেঁকে যাওয়া ঠোঁটটার কথা মনে পড়ে অজয়ের। স্মৃতি বড় কুটিল ষড়যন্ত্রী।

সে যখন ফোর্থ ইয়ারে তখনই মায়ের স্ট্রোক হয়েছিল, শরীরের ডানদিকটা পুরো অবশ—প্যারালিসিস্ হয়ে গিয়েছিল। ডানদিকের চোয়াল নাক ঠোঁট চিবুক বেঁকে গিয়েছিল, তরল খাবার কিংবা ওষুধ গড়িয়ে কষ বেয়ে পড়ে যেত। চোখটা প্রায় বুঁজে গিয়েছিল, —সমস্ত মুখটা করুণ অথচ ভয়ার্ত কিংবা অসাড় মনে হয়। মানুষ মৃত্যু-সচেতন হয়ে উঠলে সম্ভবত এ রকম মুখ হয়।

অবশেষে সেই দিন—সেই আগুন। যে আগুনের দৃশ্যটা

অজয়ের মনের একটা অংশ কুটিল স্মৃতির স্তূপে আড়াল করে রেখেছে। শ্মশানের ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা। মায়ের মুখটা একটু হাঁ হয়ে গিয়েছিল। অজয়কে মুখাগ্নি করতে হয়েছিল—ত্রস্ত হাতে প্রায় চোখ বুঁজে দ্রুত আগুনটা মায়ের স্থির কঠিন বেঁকে যাওয়া শীতল ঠোঁটে চেপে ধরেছিল অজয়। কমুহূর্ত তারপরই হাওয়া ছুটে এসেছিল—দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল অজয় আগুন হা হা করে উঠছে ঊর্ধ্বমুখে।

কানের দু পাশ ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে অজয়ের। চোখ ফিরিয়ে দেয়াল ঘড়িতে সময় দেখে সাড়ে আটটা বেজে গেছে, বাইরের ঘরে চলে আসে অজয়, দমভর সিগারেটের ধোঁয়া টানে, তারপর বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। আর তখনই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে অজয়।

ভ্রু কুঁচকে বিরক্ত মুখে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে তার পাশ কাটিয়ে বাবা চলে যাচ্ছিল। সিগারেটটা ফেলে দিল অজয়। তারপর না ঘুরেই বলল, 'দিল্লীতে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে।' চলে যেতে যেতে যেন খচ করে চটিতে শব্দ করে থেমে গেল বাবা—'হিল্লী দিল্লী তো অনেক হল, আর কেন? এবারে ওসব পাট তুলে দাও।' দম আটকে শুনলে অজয়, তারপর চেপে চেপে বলল, 'গোটা কুড়ি টাকা চাই—পোস্টাল অর্ডার—ফোটোগ্রাফ'—তৎক্ষণাৎ বাবার গলা—'ওসব বড় মানুষী চাল ছাড়'—'চালের ব্যাপার না, চার পাঁচদিন বাদেই লাষ্ট ডেট, আজই টাকার দরকার।'—অজয় দৃঢ় গলায় বলল। 'টাকার দরকার।'—যেন দাঁতে দাঁত ঘষে বলল বাবা—'লজ্জাও নেই নাকি?' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল অজয়—দেখল বাবার মুখটা যেন তিনগুন বড় হয়ে গেছে—কথাকলি নাচের রাজার মত দু চোখ ক্রুদ্ধ করে গোলাকার হয়ে গেছে, দুই ভুরু সারা কপাল ছেয়ে ফেলেছে। —'যে টাকা গেছে তোমার পেছনে সেটা ব্যাঙ্কে রাখলে এতদিনে তার সুদ আসত।' 'সুদ আসত।' যেন কথাটা উচ্চারণ করল অজয়, তারপর হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, 'টাকা চাই—কোন কথা নয়।' হাতটা মুঠো পাকাল

অজয়। 'টাকা চাই উপার্জন করে নাও'—বলে আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ভেতরে ঢুকে গেল বাবা।

হঠাৎ ক্রুদ্ধ হাতে টেবিলের ওপরের ফরমটা এক ঝটকায় এক পাশে ফেলে দিল অজয়। তার সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে কানের দু পিঠ ঝাঁ ঝাঁ করছে আর হঠাৎ সেই মুহূর্তে গদরেজ তালাটা তার চোখে ভেসে উঠল। মুহূর্তে ঘরের কোনের অন্ধকারে পুরনো ট্রাঙ্কটার কথা চড়াৎ করে মাথার মধ্যে এসে সজোরে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে, কিছু ভাববার আগেই তার সমস্ত শরীর শিরা পেশী উদ্যত হয়ে উঠল, একটা হিংস্র রক্তস্রোত শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বল্লমের মত সাঁ করে উঠে গেল। অজয় দ্রুতবেগে ভেতরের ঘরের দিকে ছুটে গেল।

ঘরে ঢুকেই ট্রাঙ্কের ওপর থেকে একটা সুটকেশ ফেলে দিল অজয়। তারপর গদরেজ তালাটা ধরে বার দুয়েক টানল সজোরে। ঘটাং ঘটাং শব্দ উঠল। চাবি চাই—কম্পিত হাতে এবার অজয় তক্তপোষের ওপর থেকে তোষকটা টান মারল। না চাবি নেই। এতে তার মাথার রক্ত যেন আরো তেতে উঠল। হঠাৎ এসময় বাবা দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল, তার সারা শরীর যেন নিথর। তারপর আকস্মিকভাবেই চীৎকার করে উঠল বজ্রকণ্ঠে 'কী হচ্ছে?' 'চাবি কোথায়?' —পালটা চীৎকার করল অজয়। 'ইয়ার্কি পেয়েছ উল্লুক, বেরিয়ে যাও বলছি।'—বলে বাবা থর থর করে কাঁপতে লাগল।

সত্যি সত্যি দুলাফে অজয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বটে। কিন্তু দু মুহূর্ত, তারপরই সে আবার ঘরে ঢুকল কয়লা ভাঙার লোহার ডাণ্ডাটা হাতে নিয়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় তার বাবা দেখল তালার ওপর পেশলহাতে ডাণ্ডা দিয়ে ঘা মারছে অজয় উন্মত্তের মত। শেষ চেষ্টার মত চীৎকার করে উঠল তার বাবা—'থাম থাম বলছি।'

কিন্তু সেই মুহূর্তে অজস্র হিংস্রজন্তুর চীৎকারের মত একসঙ্গে বেলা নটার সাইরেন বেজে উঠল নানা দিকে, আর একটা ভয়ঙ্কর উচ্ছৃঙ্খল শব্দে ভিৎসুদ্ধ বাড়িটা থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

নেই আর আছে

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

"Here in death's dream kingdom
The Golden vision reappears
I see the eyes but not the tears—"

ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গেল শরদিন্দুর। শীত ঋতুর মত বিকেল বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে এসেছে। বাতাসও ভিজে ভিজে। যদিও শীতের এখনো কিছু দেরি। সবে কার্তিকের শেষ। দক্ষিণ কলকাতার শহরতলির বড় বড় গাছে শেষ বেলায় পুঞ্জ পুঞ্জ কুয়াশা লেগে আছে।

ট্রাম থেকে নেমে কেমন হকচকিয়ে গেল শরদিন্দু। তার বাড়ি ফেরার যে শান্ত রাস্তাটা কবরখানার গা ঘেঁষে এদিক-ওদিক বেঁকে গেছে, আজ তা বড় সরগরম।

সকালে কিছু ছিল না, এখন শরদিন্দুর মনে হল, এই রাস্তায় যেন মেলা বসে গেছে। দু'ধারে ছোট বড় চায়ের স্টল। ফুলের ঝুড়ি নিয়ে বসেছে অনেক লোক। কেউ কেউ বিক্রি করছে মোমবাতি, ফুলঝুলি আর অনেক রকম মালা।

খদ্দের আকর্ষণ করার জন্যে এক সঙ্গেই সব মানুষের ভাঙা গলার চিৎকার শরদিন্দুকে কোন মেলা কিম্বা প্রদর্শনীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ভিড় তো ছিলই। আজ এই রাস্তায় হুড়মুড় করে ঢুকে

পড়ছিল গাড়ি ট্যাক্সি সাইকেল রিকৃশা এবং দেশী বিদেশী নানা বয়সের নারী ও পুরুষ।

রাস্তার মুখে বিমূঢ় হয়ে দু'-এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল শরদিন্দু। পরে ভাবল, কোন 'গাঁয় মানে না আপনি মোড়ল' জাতীয় কেউ বোধ হয় আসবে এ পাড়ায়—লাট-বেলাট কিম্বা কোন পার্টির মাতব্বর বক্তৃতা-টক্তৃতা দেবে হয়তো—কে জানে! এসব জানবার কোন কৌতুহল ছিল না তার।

হঠাৎ শরদিন্দু বিব্রত বোধ করল। সে ভুল জায়গায় এসে পড়েনি তো। মনের যেমন অবস্থা—এত অন্যমনস্ক সে থাকে আজকাল সব সময় যে দিগম্বরী তলার দিকে না এসে হেঁটে হেঁটে সোজা ক্যাওড়া-তলার শ্মশান ঘাটে চলে যাওয়া তার পক্ষে বিচিত্র নয়।

তবে আজ সে ঠিক জায়গায় ট্রাম থেকে নেমেছে। কাঁধ ঈষৎ ঝাঁকিয়ে হাবা একটা মানুষের মত আর একবার শরদিন্দু চার পাশ তাকিয়ে দেখল। আর সব এক রকমই আছে। সবই তার খুব চেনা। পিছনে টার্ফ ক্লাবের উঁচু লম্বা পাঁচিল। বাঁ দিকে সরকারী হাসপাতাল, পরিত্যক্ত রাজবাড়ির মত একটা ফিল্ম ষ্টুডিও। ডান দিকে ডাক্তার পোদ্দারের হসপিটল কর্নার আর তেওয়ারিজীর পেট্রল পাম্প। এসব ছাড়া খোলা ড্রেনের উৎকট গন্ধ তো আছেই।

"দুত্তোর!" রুক্ষ একটা শব্দ উচ্চারণ করে মনে মনে শরদিন্দু নিজেকেই বকাবকি করল। একটা ইডিয়ট—একটা রাস্কেল হয়ে যাচ্ছে সে। একটা গবেট, একটা শুয়ার, একটা—নিজের সম্পর্কে হঠাৎ এই রকম আর কোন বিশেষণ খুঁজে না পেয়ে শরদিন্দু তার চেনা রাস্তা ধরে চলতে গিয়ে সতর্ক হল। তাড়াহুড়ো করা যাবে না। ভিড় গাড়ি-ঘোড়া দোকানপাট রাস্তা জুড়ে আছে। এসব বাঁচিয়ে তাকে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে এগোতে হবে।

একটু এগিয়েই এই রাস্তার একেবারে শেষ মাথায় কবরখানার খুব উঁচু আর বাঁকানো গেটটা চোখে পড়ল শরদিন্দুর। এবং এতক্ষণে

আজকের এই হুড়োহুড়ির কারণটাও পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। সে একটা গবেটই হয়ে যাচ্ছে বটে।

একটু আস্তে হাঁটতে হাঁটতে শরদিন্দু ভাবল, ব্যাপারটা তার আগেই বোঝা উচিত ছিল। অগ্রহায়ণের ঠিক আগে আগে এই বিশেষ দিনে এই রকম ঘটা করে প্রত্যেক বছর ক্রীশ্চানরা কবরখানায় ঢোকে। মৃত আত্মীয়-আত্মীয়ার কবরে ফুল রাখে, মোমবাতি জ্বেলে দেয় এবং তাদের মনে করে প্রার্থনা-টার্থনাও করে হয়তো।

আলো আর নেই। হালকা অন্ধকার অল্প অল্প করে ঘন হয়ে উঠছে। মিষ্টি একটা গন্ধ খেলে বেড়াচ্ছে। রাস্তায় এক পাশ থেকে কিছু দূরে কবরখানার ভিতরটা দেখতে পেল শরদিন্দু। এবং দেখতে দেখতে বিস্ময় মুগ্ধ এক দর্শকের মত তার মনে হল সে যেন সত্যজিৎ রায়ের ছবির অপূর্ব কোন দৃশ্য দেখছে।

শরদিন্দু দেখল, সারি সারি মোমবাতি জ্বলে উঠেছে। আলোর শিখা হাওয়ায় হেলছে, দুলছে। কুয়াশার ওপর পড়েছে সোনালী একটা আভা। বড় বড় গাছ এবং উঁচু উঁচু ঘাসের ফাঁকে এতদূর থেকে প্রার্থনারত জীবন্ত মানুষগুলোকেও মনে হচ্ছে গ্রহান্তরের পুতুলের মত।

রাস্তার ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল শরদিন্দু। পাশেই বাচ্চাদের ছোট পার্কের মত খানিকটা ঘেরা জায়গা। কয়েকটা বেঞ্চ, একটা ভাঙা স্লিপ—শরদিন্দু মুখ ফিরিয়ে দেখল। এবং নিজেকে তার বড় পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল বলে সে তার বাড়ির দিকে গেল না, নিচু রেলিঙ টপকে পার্কের ভিতর এসে ভিজে ভিজে একটা বেঞ্চে বসে পড়ল।

আজকাল হঠাৎ এক-এক সময় যেখানে-সেখানে এই রকম বসে পড়বার একটা জায়গার অভাব অনুভব করে শরদিন্দু। ট্রামে অল্প সময় দাঁড়িয়ে থাকার পরই তার মনে হয়, হাত-পা—সব অবশ হয়ে আসছে। ক্লান্ত চোখে সে তাকায়। এদিক-ওদিকে বসবার একটু

জায়গার আশায়। এমন কি দু-এক-জন মানুষের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে সে বোঝবার চেষ্টা করে তারা কাছাকাছি নামবে কি না।

আবার কোথাও অনেকক্ষণ বসে থাকার পরেও শরদিন্দু ভিতরে ভিতরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাথার মধ্যে প্রবল একটা চাপ—বুকে যন্ত্রণাকর এক অনুভূতি তাকে একটু বেশী সময়ের জন্যে কোথাও শুয়ে বসে থাকতে দেয় না। হাত-পা গুটিয়ে স্থির হয়ে থাকবার চেষ্টা করলেও ভয়ঙ্কর একটা দৈন্য, ব্যর্থতা ও হতাশা এবং উদ্ধত এক আক্রোশ আহত অশ্বের মত চার পায়ে লাথি মেরে মেরে তাকে বুঝিয়ে দেয় যে এ জীবন বড় দুর্বহ—এ জীবন শূন্য অসার।

শরদিন্দু এখন বড় স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছে যে এ জীবন তাকে আর কিছুই দেবে না। এবং আশ্চর্য, পার্থিব কোন কিছুর ওপর তার আকর্ষণও আর নেই। যদিও মৃত্যুর কথা সে ভাবতে পারে না, তবুও এই মরজগতে চলাফেরা করতে তার বেশ কষ্ট হয়। এক-এক সময় শরদিন্দুর মনে হয় সে এখন আর সম্ভবত মানুষ নয়, সে হয়তো একটা প্রেত কিম্বা একটা শব। গুরুভার বহন করে করে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট। শরদিন্দু বেঁচে থাকার যন্ত্রণা বড় বেশী অনুভব করে।

বাচ্চাদের পার্কের অপরিচ্ছন্ন এক বেঞ্চে বসে সে পায়ের ওপর পা তুলল। তার পিছনেই অপ্রশস্ত একটা নালা, নোংরা জলের শব্দ হচ্ছিল। বস্তীর কয়েকটা ছেলেমেয়ে ভাঙা স্লিপে গড়াগড়ি যেতে যেতে বড় চেঁচামেচি করছিল। শরদিন্দুর ঠিক সামনে, ওপারে কচুরিপানা ঠাসা একটা পুকুর। তার পাশেই বালি আর ইঁটের স্তূপ। কাছাকাছি নতুন বাড়িটাড়ি উঠছে হয়তো—অন্ধকারে সে কিছু বুঝতে পারল না।

অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলেও তার ভিতরে ভিতরে শেষ কার্তিকের ভিজে জ্যোৎস্না মিশে গিয়েছিল। শরদিন্দু মাথা তুলে দেখল চাঁদ-টাঁদ কিছু নেই। আকাশ একেবারে সাদা, কবরখানার মতই নির্জন। কিন্তু মোমবাতির মত কাঁপা-কাঁপা তারা একটাও নেই।

কবরখানার দিকে আর একবার তাকিয়ে শরদিন্দুর মনে হল একটা আলোর ক্ষেত্র তার খুব কাছেই হঠাৎ যেন ভেসে উঠেছে। এখনও কিছু কিছু মানুষ ওদিকে যাচ্ছিল, অনেকে বেরিয়েও আসছিল। মৃত আত্মীয় আত্মীয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছে বলে তারা বেশ প্রফুল্ল, যেন বড় চরিতার্থ হয়ে একটা উত্তেজনার ঘোরে খুব জোরে জোরে হাঁটছে।

কিন্তু বাইরের ধোঁয়ায়, কিছু ভিতরের ঈর্ষায় চোখ ছোট হল শরদিন্দুর। মুখও কঠিন হল। তার গোটা দেহটাই যেন বড় খসখসে, বড় রুক্ষ হয়ে উঠল। তৃপ্ত, প্রফুল্ল মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে সে ভাববার চেষ্টা করল, যারা মৃত, যারা আর নেই এখন এই রকম ঘটা করে তাদের ডাকাডাকি করলে আসলে কী লাভ হবে আমার? আমার মুখেও কি তৃপ্তির এমন একটা আভা খেলবে, হাসি ফুটবে? আমিও কি আবার এইসব জ্যান্ত মানুষের মত বেঁচে থাকার নেশায় মশগুল হতে পারব?

শরদিন্দুর মুখ থেকে অতর্কিতে বিরক্তির একটা শব্দ বেরিয়ে এল। সে বড় স্পষ্ট করে অনুভব করল তার মনে বিদ্বেষ ছাড়া যেন আর কোন অনুভূতিই নেই। তার পরিবারের কাউকে স্মরণ করা তারপক্ষে বড় কঠিন।

কাঠের অপরিস্কার বেঞ্চের ওপর কাঠ হয়ে বসে থাকল শরদিন্দু। তার চোখ কচুরিপানায় ঠাসা ঝাপসা পুকুরের দিকে স্থির হয়েছিল। তার গায়ে হাতে পায়ে—সব জায়গায়, ক্লান্তি সেঁটেছিল। খিদে ছিল শরদিন্দুর, খাবার ইচ্ছে ছিল না। তার গলায় তৃষ্ণা ঠেলে উঠছিল। একটু দূরেই চায়ের ছোট ছোট স্টল। শরদিন্দু সেদিকে তাকিয়ে থাকল করুণ চোখে একটা ভিখিরির মত। সে বুঝল তার এখন অতটা হেঁটে যাবার ক্ষমতা নেই।

এদিকটা একেবারে ফাঁকা বলে শীতের ছোঁয়ায় বাতাস অবাধে ধারালো হয়ে উঠছিল। আলোর বালব্ ঘিরে সবুজ পোকারা জড়ো

হচ্ছিল। বাতাসে ওষুধের গন্ধ—শরদিন্দুর কাছাকাছি হাসপাতালটার কথা মনে পড়ে গেল। এবং একটা কঠিন যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে সে অনুভব করল তারও মনে আলোর একটা ক্ষেত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

শরদিন্দুর মুখ প্রফুল্ল হল না, মন প্রফুল্ল হল না—বেঁচে থাকার কোন ইচ্ছেও জাগল না। তবুও তার মনের ভিতরে যে আলোর ক্ষেত্র ছিল তা দপদপ করতে থাকল। শরদিন্দু বিকৃত স্বরে অতিষ্ঠ একটা মানুষের মত উঠতে চাইল কোথায়—কোথায় তারা!

রাস্তাটা আবার ঠাণ্ডা হয়ে আসছে মেলা ভেঙে যাচ্ছে। এদিকের সব আলো হঠাৎ একসঙ্গে নিভে গেল। পোকা পড়তে লাগল শরদিন্দুর চোখে, মুখে, মাথায়। সে হাত-পা নাড়ল, ছটফট করল। পরে এইসব উপদ্রব আর গ্রাহ্য করল না।

তন্দ্রার মত একটা ঘোরে লম্বা লম্বা নিশ্বাস পড়ছিল শরদিন্দুর। সে বেশ অবাক হয়ে ভাবছিল তার মন যেন এই মুহূর্তে অন্যরকম হয়ে গেছে। যে মন রাস্তার কুকুরের মত কোথাও স্থির হয়ে আর বসে না—এদিক-ওদিক শুধু ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়—এখন আলোর ক্ষেত্রের সামনে তা একেবারে স্থির—শরদিন্দুর বড় বাধ্য।

এত পরে একটা সিগ্রেট ধরাল শরদিন্দু। অন্ধকার। জ্যোৎস্নাও বড় ফিকে। দূরে অসংখ্য মোববাতি এখনও মিটমিট করছে। সেদিকে আর তাকাল না শরদিন্দু। তার দেশলাই মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, সে তাও তুলল না। সিগ্রেটের আগুনের দিকটা মুখের কাছে তুলে খুব মনোযোগ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে শরদিন্দু দেখল, ছাই আর আগুন বড় অন্তরঙ্গ হয়ে মিশে আছে। এবং তা দেখতে দেখতে মধুর এক ভাবনার ভিতরে সে তলিয়ে যাচ্ছিল।

শরদিন্দুর মনে হচ্ছিল ট্যাক্সিটা বড় আস্তে চলছে। বিরক্ত হয়ে এক একবার সে সামনে ঝুঁকে পড়ছিল—ভাবছিল ড্রাইভারকে বলবে, সর্দারজি জলদি—বহুৎ জলদি। সদ্য কেনা একটা হারমোনিয়াম ছিল তার পাশেই নতুন পালিশের গন্ধ উঠছিল।

হারমোনিয়মের ওপর যেন বড় স্নেহভরে একটা হাত রেখেছিল শরদিন্দু।

অফিস থেকে রোজ সোজা বাড়ি পৌঁছয়, আজ কিছু কেনাকাটা ছিল বলে সে পৌঁছল অনেক পরে।

গ্রীষ্মের প্রথম অন্ধকার ঝিরঝির করছে। শরদিন্দু দেখল একটা আইসক্রীমওলা একদিকে হলদে গাড়ি রেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে।

ঘামে গলা ভিজে উঠছে শরদিন্দুর। ছেলেমানুষের মত একটা উত্তেজনায় সে হাঁপাচ্ছিল। কাঁপা-কাঁপা হাতে কোনরকমে ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে মাটিতে পা দেওয়ার আগেই শরদিন্দু চিৎকার করে ডাকল, "রাধারাণী, স্বপন—" এবং শুনল তার ছেলে ও মেয়ের উল্লাসের স্বর, "বাবা! ওমা, বাবা এসেছে।"

দোতলা থেকে হুড়মুড় করে নিচে নেমে এল রাধারাণী আর স্বপন। শরদিন্দুকে দেখে প্রথমে ওরা থমকে গেল। সে তখন ভারী হারমোনিয়াম সাবধানে ধরে আস্তে আস্তে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে আসছিল।

"ও বাবা, এটা কী?"

রাধারাণী খুশী-খুশী মুখে স্বপনকে মৃদু তিরস্কারের মত বলল, "জানিস না বোকা, ওটা আমার হারমোনিয়াম।"

"আমিও বাজাব। দিদি, আমায় বাজাতে দিবি না?"

"তুই জানিস বাজাতে? ভাগ, ছুঁতেও দেব না তোকে।"

দোতলায় শরদিন্দুর ফ্লাটের দরজা খোলাই ছিল। মমতাও এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। রাধারাণীর কথা শুনে সে ঈষৎ ঝাঁজের সঙ্গে বলল, "ছোট ভাই-এর সঙ্গে ওরকম খিটখিট করতে কতবার বারণ করেছি রাধা!"

মমতার দিকে তাকিয়ে হাসল শরদিন্দু, "রাধারাণীর জন্যে কিনেই ফেললাম আজ—"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি—" শরদিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে বসবার ঘরে এল মমতা, আলোয় সুইচ টিপে বলল, "একসঙ্গে দাম দিলে?"

"না, আস্তে আস্তে দেব—" হারমোনিয়ামটা গোল একটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে পকেট থেকে রুমাল টেনে নিয়ে শরদিন্দু গলা ও কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, "মুখ কালো হয়ে গেল যে? দেখ দেখ মমতা, ছেলেমেয়েরা কী খুশী হয়েছে!"

"তা-ও দেখছি। কিন্তু এটা আর কয়েক মাস পরে কিনলে হত না? এত অবুঝ হলে চলে।"

"কিনব-কিনব করে তো এক বছর কেটে গেল—" শরদিন্দু মমতার রাগ-রাগ মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে খুশী করবার চেষ্টায় হালকা স্বরে বলল, "রাধার ধৈর্য নেই, আর দেরি করলে বাপের ওপর ও ভীষণ ক্ষেপে যেত।"

"সেই ভয়ে মরলে তুমি!" মমতা বোধ হয় এবার হাসল, "নিজের যা সবচেয়ে বেশী দরকার—এক জোড়া জুতো কিনতে তোমার আর টাকা থাকে না—"

"ও, জুতো! হবে'খন। এ মাসেই কিনে ফেলব ঠিক।"

মমতা আর দাঁড়িয়ে থাকল না, শরদিন্দুর চায়ের ব্যবস্থা করতে গেল। মা-বাবার কথায় মন ছিল না রাধারানীর, সে রীড টিপেটিপে প্রথমে হারমোনিয়াম পরীক্ষা করে দেখল, পরে আপনমনেই রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটা সুর বাজাল। স্বপন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। হারমোনিয়ামটা দিদির সামনে ছুঁতে সাহস পেল না। ভাবল, দিদি উঠে গেলে সেও বাজাবে।

শরদিন্দু তাকে লক্ষ্য করল। মুখ বড় করুণ হয়ে এসেছে স্বপনের। শরদিন্দু তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, "তোর কী চাই বল? কাল ঠিক এনে দেব।"

"দিদির মত হারমোনিয়াম আমাকে এনে দেবে?"

"তোর মত ছোট ছেলে হারমোনিয়াম বাজায় নাকি? তোর জন্যে একটা সুন্দর ছবির বই নিয়ে আসব।"

"আমাকে একটা বই-এর আলমারি কিনে দেবে বাবা?"

"হ্যাঁ, দেব!"

শরদিন্দুর গালে একটা হাত রেখে বড় খুশী হয়ে স্বপন বলল, "তবে আমি হারমোনিয়াম চাই না। আমি বই লিখব বাবা। বই লিখে-লিখে আলমারিতে রাখব। আমাকে অনেক আলমারি কিনে দেবে তো?"

শরদিন্দু স্বগতোক্তি করার মত বলল "মাই ব্রিলিয়ান্ট বয়। তোকে আমি অনেক বই-এর আলমারি কিনে দেব স্বপন—যত চাস।"

শরদিন্দুর জন্যে খাবার সাজিয়ে তাকে ডাকছিল মমতা। সে তখন কোল থেকে স্বপনকে নামিয়ে দিল, আদরও করল—রাধারানীকে বলল একটা গান করতে। বাইরে থেকে এত পরে এলেও কোন ক্লান্তি ছিল না শরদিন্দুর। সে চোখে-মুখে অনেক জল দিল। পায়জামা পাঞ্জাবি পরল। পরে পরিচ্ছন্ন হয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে খাবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মমতাকে দেখল।

তাকে দেখতে দেখতে এই ভরা সন্ধ্যায়ও সঙ্গমের একটা ইচ্ছা জাগল শরদিন্দুর। ঘন ঘন সিগারেট টেনে সে তার সে-ইচ্ছা দমন করবার চেষ্টা করছিল। নিটোল স্বাস্থ্য মমতার। তার দেহে যৌবন উথলে উঠেছে। গায়ের রঙ যদিও শ্যামলা, চোখ দুটো টানা টানা অদ্ভুত। সাড়ি পরেছে মমতা, নীল পাড়। তার কানে সোনার দুটো রিঙ ঝিকমিক করছে। তাকে দেখলে বাইরের লোক হঠাৎ রাধারানীর দিদি বলে ভুল করতে পারে।

সম্ভবত সিগারেটের গন্ধ পেয়ে মমতা শরদিন্দুর উপস্থিতি জানতে পারল এবং পিছন ফিরে বিরক্তির অস্ফুট একটা শব্দ উচ্চারণ করে বলল, "দেখছ চা ভিজিয়েছি, এখন আবার সিগারেট ধরালে কোন বুদ্ধিতে?"

শরদিন্দু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল বাচ্চা চাকরটা কাছাকাছি আছে কিনা, পরে সে কয়েক পা এগিয়ে এসে মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বলল, "এটা ধরাবার দরকার ছিল, না ধরালে হয়তো স্থান কাল জ্ঞান থাকত না যতই দিন যাচ্ছে তোমাকে ততই—"

মমতার চোখে কৃত্রিম শাসন ঠেলে উঠল, "সারাদিন ওই এক ভাবনা! মেয়ের কত বয়েস হল খেয়াল আছে?"

"মেয়ের বয়েস হয়েছে তো কী?"

"ছ' দিন পরে বিয়ে দেবে, তারপর যদি—"

শরদিন্দু বাধা দিয়ে বলল, "মানে বলতে চাও মা আর মেয়ের যদি একসঙ্গে বাচ্চা-টাচ্চা হয়—"সে হাসল, "হয় হবে। বাচ্চার শখ তো এখনো আছে তোমার, আর আমিও রীতিমত সবল—"

"থাম। রাধার বিয়ে দাও আগে স্বপনটা মানুষ হোক। ছুটোকে মানুষ করতেই হিমসিম খাচ্ছ—"

চেয়ারে বসে পড়ল শরদিন্দু। তার বেশ খিদেও পেয়েছিল। রোজকার মত আজও নতুন কিছু করেছে মমতা। শরদিন্দুর প্লেটে চিংড়ি মাছের গরম কাটলেট ছিল। শেষ হওয়ার আগেই সে সিগ্রেট নিবিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলল।

একটা কাটলেট ভাঙতে গিয়ে ইতস্তত করল শরদিন্দু, মুখ তুলে বলল, "রাধা আর স্বপনকে একটু ডাক তো—"

"না, কিছুতেই ডাকব না ওরা অনেক খেয়েছে।"

"তবে তুমি একটু খাও—"

"আমিও খেয়েছি—" মমতা উষ্ণস্বরে বলল, "নিজে খাও না।"

ততক্ষণে একটা কাটলেটের কিছু অংশ জোর করে মমতার মুখে দিয়ে দিয়েছে শরদিন্দু, "বাঃ চমৎকার। আর একটু খাবে?" "এখান থেকে আমি চলে যাব বলছি কিন্তু—বলে মমতা সুইচ বোর্ডের কাছে এসে রেগুলেটারের খটখট শব্দ করে পাখার স্পীড বেশ কমিয়ে দিল। না হলে শরদিন্দুর চা জুড়িয়ে যাবে। দক্ষিণের জানালার পর্দা পত

পত করছে। হাওয়া উঠেছিল। কাটলেট খেতে খেতে একটু অন্য-মনস্ক হয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল শরদিন্দু। রাধারানী নতুন হারমোনিয়াম বাজিয়ে খুব মন দিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে।

তা শুনতে শুনতে কিছু পরে শরদিন্দু বলল "রাধার গলা সত্যি আশ্চর্য রকম মিষ্টি হয়েছে, শুনছ কী দরদ!"

মমতা হেসে বলল, "কিন্তু পড়াশুনোয় যেএকেবারেই মাথা নেই।"

"না থাক, এমন যার গলা—" শরদিন্দুও হাসল, "তার আর ভাবনা কী—" সে একটু চুপ করে থেকে বলল, "তবে স্বপনটা সত্যি ব্রিলিয়ান্ট! ওর মাথা সোনা দিয়ে বাঁধান। এইটুকু বয়েসে এত বুদ্ধি—"

"পরে কী হয় দেখ।"

শরদিন্দু জোর দিয়ে বলল, "ও সাংঘাতিক ভাল ছাত্র হবে! পরে খুব নাম করবে। সেই যে একটা পুরোন কথা আছে না, যে-গাছ বাড়ে তার দুপাতায় বোঝা যায়।"

শরদিন্দুর সামনে থেকে খালি প্লেটটা সরিয়ে দিয়ে মমতা বলল, "ছেলেমেয়েদের নিয়ে তুমি একটু বেশী আদিখ্যেতা কর। নিজের কথা ভাব না, নিজের দিকে তাকিয়েও দেখ না।"

"আমাকে তো তুমি দেখবে—" চা-য়ে চুমুক দিল শরদিন্দু, চামচ নেড়ে ভাল করে চিনি মিশিয়ে নিল। পরে একটু ভিজে স্বরে বলল, "আরো কত কিছু করা উচিত ওদের জন্যে—মাঝে মাঝে বাইরে ঘুরিয়ে আনা—পাহাড় সমুদ্র দেখানো। টাকার জন্যে কিছুই করা হয় না।"

একটা ম্লান আভা শরদিন্দুর মুখে ফুটে উঠেছিল দেখে সম্ভবত তা মুছে ফেলার ইচ্ছায় মমতা বলল, "যা করছ তাই ঢের। এর চেয়ে বেশী আজকালকার দিনে আর ক'জন করতে পারে।"

"অন্য লোকের কথা জানি না মম, তবে রাধারানী আর স্বপনের মত কজনই বা হয়—" কয়েক মুহূর্তের জন্যে উদাসীনের মত হয়ে

থাকল শরদিন্দু, কী ভাবতে ভাবতে বলল, "ছেলেবেলায় আমরা কত কী পেয়েছিলাম। প্রচুর অর্থ, খোলামেলা জায়গা, নদী মাঠ পুকুর—বাবার বদলীর চাকরি তো। তা ছাড়া ছুটিতে ছুটিতে দিল্লী জয়পুর দার্জিলিং ডেরাডুন—এই রকম ঘোরাঘুরি তো ছিলই।"

"সময়টাও তখন যেন ভাল ছিল। আমরা ছিলাম ঢাকায়, তারপর দিনাজপুরে—আমার বাবারও বদলীর চাকরি ছিল। জলপাইগুড়িতে বাবা মারা গেলেন। তারপর থেকেই আমরা এখানে কলকাতায়!"

"কত সালে তোমরা প্রথম কলকাতায় আস মনে আছে?"

"না, সাল-টাল মনে নেই। আমি তখন খুব ছোট, ইস্কুলে নিচু ক্লাসে পড়ি।"

চা খেতে খেতে পুরোন দিনে ফিরে যেতে বেশ ভাল লাগছিল শরদিন্দুর। তার আবার সিগ্রেট খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল। প্যাকেটটা পকেটে নেই, সে তা শোবার ঘরে ফেলে এসেছে।

শরদিন্দু চায়ের কাপে আঙুল দিয়ে টুং-টাং- শব্দ করতে করতে বলল, "আমিও ঠিক তাই। ক্লাস এইটে পড়ি। বাবা মারা যাওয়ার পর আমরাও এখানে এলাম—" সে মমতার দিকে তাকিয়ে হাসল, সেটা উনিশ শ'তেত্রিশ সাল। আমরা যেদিন প্রথম কলকাতায় এলাম সেদিন একটা শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল—দেশপ্রিয় জে এম সেনগুপ্তের দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই প্রথম ওই রকম ভিড় দেখেছিলাম। জান মম, রাস্তায় বড় বড় গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে উঠে বসেছিল মানুষ দেশপ্রিয়কে শেষ নমস্কার জানাবার জন্যে!"

শরদিন্দুর কাপে আর একটু চা-ঢেলে দিয়ে মমতা গালে একটা হাত রেখে প্রথমে খুব অবাক হওয়ার ভান করল এবং পরে ঠাট্টার ছলে বলল, "এত মনে থাকে তোমার! তুমি দেখছি আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো!"

মমতার পরিহাস উপভোগ করে তাকে দেখতে দেখতে চোখের একটা ভঙ্গী করল শরদিন্দু "আমার মধ্যে বার্ধক্যের কী লক্ষণ তুমি-

পেলে বলতো—" সে স্বর অনেকটা নামিয়ে নিয়ে বলল, "রাত্তির-টাত্তিরে সময়-বিশেষে তোমাকেই তো আমার বুড়ি বলে মনে হয়—একটুতেই একেবারে কাহিল হয়ে পড়—"

মমতা বড় বিব্রত হয়ে এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে দেখল শরদিন্দুর কথা আর কেউ শুনতে পেয়েছে কি না। তার চোখে শাসন কাঁপছিল, "একটু সতর্ক হয়ে কথাবার্তা বলতে শেখ, বুঝলে ?"

"ওসব মিডলক্লাস ভীতি আমার নেই। প্রাণে শখ ষোল আনা, বাইরে সব রেখে-ঢেকে চেপে-চেপে চলা—" শরদিন্দু একটা ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করল, "ইডিয়টিক ! আমাদের বয়সের আগে বুড়িয়ে যাবার কারণই হল এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দমন।"

"দমন আর কোথায় করছ। নির্লজ্জের মত শুধু খাই খাই।"

"এতে তোমার তো খুশী হয়ে ওঠার কথা। এখনো আমার প্রেম অটুট, এখনো যৌবনের আবেগে—"

"আঃ, থাম না—" কাপ গেলাস ছোট ছোট প্লেট একদিকে সরিয়ে খাবার টেবিল একটু পরিস্কার করে রাখছিল মমতা, "এসব ইয়ার্কি ফাজলামী না করে স্বপনটাকে একটু পড়াও না।"

শরদিন্দু হালকা স্বরে বলল, "সেক্স আর্জকে তুমি ইয়ার্কি ফাজলামী বল ?"

"তাছাড়া আর কী—" মমতার চাপা স্বরেও ধমকের রেশ ছিল, "অসভ্য।"

মনে মনে বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল শরদিন্দু। অখিল ক্ষুধা খেলছিল তার চোখে। একপাল তাজা হরিণীর মত গ্রীষ্মের হাওয়া হুড়মুড় করে এখন ঘরে ঢুকে পড়ছিল। শরদিন্দুর চোখের সামনেই মীটসেফের ওপর পাকা পাকা অনেক আম ছিল। শরদিন্দু সেগুলো দেখল এবং আপন মনেই হাসল।

মমতার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। শরদিন্দু বুঝল সে এঘরে আর থাকবে না। শরদিন্দুও উঠে পড়ল। সিগ্রেট থাকলে সে

আরো কিছু সময় এখানেই বসত। হিটারে বোধ হয় মাংস বসিয়েছে মমতা, একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। এত কাটলেট খাবার পরেও সে গন্ধ ভাল লাগল শরদিন্দুর।

মমতা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই শরদিন্দু অল্প অল্প হাসতে হাসতে খুব আস্তে বলল, "মনে হচ্ছে তুমিও খুব ইচ্ছুক। কাটলেট, মাংসের গন্ধ, সামনে পাকা আম—"

শরদিন্দুর কথা শুনে মমতা ফিক করে হাসল, "আমের মধ্যে তুমি কী সেক্স অ্যাপীল দেখতে পেলে?"

"যার মন তাজা সে সব জিনিসের মধ্যেই প্রাণ খুঁজে পায়—" শরদিন্দু বলল, "আর প্রাণ যার আছে সে স্বভাবতই অস্থির—আমি প্রাণচঞ্চল লোকদের কথাই বলছি। এই মম প্লীজ, একটা কথা শুনে যাও—" সে মমতার বেশ কাছে এগিয়ে এল, "শোন, আমার তাজা মন আজকাল এক নতুন খেলা খেলতে শুরু করেছে—"

"দয়া করে তোমার খেলাধুলো তাড়াতাড়ি শেষ করবে? মাংসটা পুড়ে না যায় —"

"পোড়াই খাব। শোন না—" শরদিন্দু পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে আর একবার সিগ্রেট খুঁজল, "ট্রামে বাসে কিম্বা কোথাও যখন দেখি স্বামী স্ত্রী বেশ ভালমানুষের মত মুখ করে বসে আছে তখন আমার কল্পনা আজকাল হঠাৎ খুব প্রখর হয়ে ওঠে—"

"তা তো হবেই—" কিছু একটা আঁচ করতে পেরে মমতা বলে ফেলল, "তোমার মনের পরিচয় আমি আগেই পেয়েছি।"

মমতার কথা অগ্রাহ্য করে শরদিন্দু বলে চলল, "আমি কল্পনা করি ওদের রাতের রঙ্গ। আবরণহীন আদিম নরনারী। পূর্ণ, চরিতার্থ। অথচ আশ্চর্য, সামাজিক শাসনের চাপে এখন ওরা কত নম্র, কী ভদ্র!"

"তা সকলেই দিন রাত রঙ্গ করে বেড়াবে নাকি? সকলেই তোমার মত?" কথা শেষ করে মমতা চলে গেল।

সিগ্রেটের কথা আবার মনে পড়ল শরদিন্দুর। সে এল শোবার ঘরে, ছোট একটা টেবিলের ওপর থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট দেশলাই তুলে নিল। মাংসর গন্ধ আরো বেশী করে তার নাকে লাগল। হয়তো ডেকচির ঢাকনা খুলে মমতা দেখছে মাংস সেদ্ধ হয়েছে কিনা।

সিগ্রেট ধরিয়ে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি পেল শরদিন্দু। তরুণ কবির দু-একটা লাইন উচ্চারণ করবার ইচ্ছে হল তার। একটা অ্যাসট্রে হাতে নিয়ে খাটের ওপর বসে পড়ল সে। পরেই গুনগুন করে উঠল, "তোমাকে দিয়েছি আমার প্রাণের—" শরদিন্দু চুপ করল। পরের কথাটা, 'বর্ষা ঋতু' উচ্চারণ করতে দ্বিধা হলেও সে সবটা না বলে পারল না—।

"তোমাকে দিয়েছি আমার প্রাণের বর্ষা ঋতু
এখন আমার বুক জুড়ে শুধু রৌদ্রদহন
কখনো কি আর সাগরে মরুতে বাঁধবে সেতু
মেঘ-যবনিকা ছিঁড়ে ফেলে তুমি ছুঁয়ে যাবে মন ?"

শরদিন্দুর মুখ নরম হয়ে এল, করুণ হয়ে উঠল। এই লাইনগুলো থেকে থেকে তার মনে আসে কেন! সুখে সম্ভোগে হঠাৎ অতর্কিতে এই রকম এক বেদনাকে প্রশ্রয় দিতে কেন তার ভাল লাগে, সে তা জানে না।

পুড়ে পুড়ে সিগ্রেট খুব ছোট হয়ে এসেছিল। শরদিন্দুর ঠোঁটে ছেঁকা লাগতেই সে চমকে তাড়াতাড়ি সিগ্রেট ফেলে দিল। ঠোঁটে অল্প অল্প জ্বালা করছে। তার ডান পা অসাড়ের মত হয়ে গেছে, পায়ে খিল ধরেছে—নাড়তে গেলেই চিনচিন করে উঠছে। হতভম্বের মত বসে থাকল শরদিন্দু। ভূমিকম্পে কি বন্যায় ঘর বাড়ি চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে অদৃশ্য হয়ে গেলে মনের যেমন অবস্থা হয়, তার অবস্থা এখন কতকটা যেন সেই রকম।

এখনো আলো জ্বলে ওঠেনি। অন্ধকার দেখে মনে হয় বেশ রাত হয়েছে। একটু দূরে বড় রাস্তায় বাস-ট্রাম চলাচলও অনেক কমে

এসেছে। কে দূর থেকে ঢেউ-এর মত শব্দ আসছে এবং পরেই রাস্তা ফাঁকা পেয়ে হুস করে ট্রাম বেরিয়ে যাচ্ছে।

এতক্ষণ যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে বড় আরামে গড়াগড়ি যাচ্ছিল শরদিন্দু। তার চোখ মুখ শরীর মন—সবই খুব হালকা খুব নরম হয়ে উঠেছিল। সিগ্রেটের আচমকা ছেঁকা তার সাধের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। আস্তে আস্তে সেই তাপটাই আবার তাকে পেয়ে বসল। তার চোখ কটকট করে উঠল। মাথার যন্ত্রণা সে আবার অনুভব করল। শরদিন্দু দাঁতে দাঁত চাপল। কিন্তু তা করবার আগেই তার মুখ রুক্ষ হয়ে উঠেছিল।

শরদিন্দু দেখল তার সামনে কচুরিপানায় ঠাসা সেই পুকুর, পিছনে ছোট নালা, এ-পাশে ভাঙা ক্লিপ, ওপাশে একপাটি ছেঁড়া চটি—কোন চাকর-বাকর ছেড়ে গেছে হয়তো। তাকে অনেকক্ষণ থেকে মশা কামড়াচ্ছিল, এখন এত পরে খুব বিরক্ত হয়ে মশা মারতে গিয়ে সে নিজের দেহের এখানে-ওখানে জোরে চড় মারল।

এবং তা করতে করতে শরদিন্দু আর একবার অনুভব করল তার পায়ে খিল ধরে আছে। জোর করে ওঠবার চেষ্টা করল সে, পরেই বসে পড়ল। দুত্তোর! সে এখানে বসে বসে এত সময় কাটাল কেন। মনটা আরো তেঁতো হয়ে উঠেছে—রক্তের চাপ বাড়ছে। এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকলে মুশকিল, লোকে মাতাল-টাতাল ভাববে।

একটা প্রক্রিয়ার কথা মনে পড়ে গেল শরদিন্দুর। পায়ে খিল ধরলে কানে কলম কিম্বা হালকা কিছু গুঁজে দিলে তা ছেড়ে যায়। পকেট থেকে ডট পেন টেনে নিল সে। কট করে ক্লিপের শব্দ হল। কানে কলম গুঁজেই জোর করে উঠে দাঁড়াল শিরদিন্দু। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটল। রাতে সে ভাল দেখতে পায় না, তাই মাথা নিচু করে ঠাহর করে হাঁটছিল। তার দু হাত গুটিয়ে সে বুকের কাছে ঠেকিয়ে রেখেছিল।

এত সাবধানে হাঁটলেও ছোট একটা গর্তের মধ্যে পা পড়ল

শরদিন্দুর এবং সে হোঁচট খেতে খেতে টাল সামলে নিল। তার মেজাজ আরো বিগড়ে গেল। সে বলে উঠল, "ওরে শালা পৌর প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডারা, তোদের মা-বোনকে চিৎ করে আর কতদিন কলকাতার রাস্তায় শুইয়ে রাখবি? খালি গর্ত আর গর্ত।"

এই রকম উক্তি করেই শরদিন্দু বড় গম্ভীর হয়ে গেল। যার যা খুশি করুক, তার কী। শহরের সুখ-সুবিধার কথা ভেবে কবে সে মাথা ঘামিয়েছে। সুতরাং এখন ফোঁস করে উঠে লাভ কী। রাস্তায় মাথা গরম করলে আবার তাকেই হোঁচট খেতে হবে।

এখনো শরদিন্দুর ঠোঁট জ্বলছিল। পা-টাও টন টন করছে। তবু একটু জোরেই পা চালাল সে। একটা কদম গাছ হিমে জড়োসড়ো হয়ে আছে! পর পর কয়েকটা একতলা ছোট বাড়ি। ছিম ছাম। কোথাও কোথাও শাকসব্জি ফলফুলের বাগান। বাড়িগুলোর দরজা-জানালা বন্ধ। এসব দেখে-শুনে শরদিন্দু বড় মন-মরা হয়ে যাচ্ছিল।

অন্যমনস্ক হয়ে চলতে চলতে কিছু পরেই আবার চমকে উঠল সে। প্রচণ্ড শব্দ করে কাছাকাছি কোথাও একটা বোমা ফাটল। আবার ফাটবে। তারপর ফটফট গুলির শব্দ হবে। এবং ফায়ার ব্রিগেডের একটানা ঘণ্টাও শোনা যাবে। এইরকম দুমদাম গুরুম্‌গাড়ুম্‌ ঢংঢং চলবে সারা রাত ধরে।

—এসব শরদিন্দুর গা-সওয়া হয়ে গেলেও এরকম শব্দ-টব্দ হলে এখনো সে চমকে ওঠে—উৎকর্ণ হয়ে ওঠে—অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকায়। কিন্তু এখন শরদিন্দু দেখল, কোন বাড়ির দরজা-জানালা একটুও ফাঁক হল না। গাছের একটা পাতাও কাঁপল না। এমন কি, রাস্তায় একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়েছিল সে-ও নড়ল না।

শুধু শরদিন্দুই খোঁড়াতে-খোঁড়াতে হাঁপাতে-হাঁপাতে এবং একটা যন্ত্রণায় ভিতরে-ভিতরে জ্বলতে-জ্বলতে হাঁটল, হাঁটল, হাঁটল।

এক-একটা সিঁড়ি অন্ধকারে ভেঙে যেন বড় পরিশ্রান্ত হয়ে আস্তে আস্তে দোতলায় উঠে এল শরদিন্দু। তার ফ্লাটের দরজায় হাত দিয়ে শব্দ করল। কোন সাড়া এল না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ধৈর্য হারিয়ে যাচ্ছিল শরদিন্দুর, আর একটু জোরে দরজায় ধাক্কা দিল।

"কে ?"

একটু রুক্ষ স্বরে শরদিন্দু বলল, "খোল না শিগগির।"

তাড়াতাড়ি দরজা খুলল মমতা, অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "সেই কখন আলো নিবে গেছে! বড় ভয় করছিল। তুমি এত দেরি করে ফিরলে কেন ?"

শরদিন্দু কিছু বলল না। দেখল, আলো বন্ধ হয়ে আছে বলে এখানেও মোমবাতি জ্বেলে দিয়েছে মমতা। প্রথমে বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে নিল শরদিন্দু। শার্ট প্যান্ট ভাঁজ করে আনলায় রাখতে রাখতে একবার পিছন ফিরে দেখল তার সুবিধার জন্যে একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে মমতাও শোবার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

চোখ দুটো বসে গেছে মমতার, মুখে ঘাম গায়ে তেলের গন্ধ। হাড় জিরজিরে শরীর, যেন মোমবাতিটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। শরদিন্দু বুঝল, মমতা কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছে না কিন্তু তার মনের মধ্যে একটিই প্রশ্ন তাকে আরো কাহিল করে তুলেছে।

এসব ভাবতে-ভাবতে খুব রাগ হয়ে গেল শরদিন্দুর। সে মুখ-টুখ ধুতে গেল না, ঝপ করে খাটের ওপর বসে পড়ে কর্কশ গলায় বলল, "কেন ফিরতে দেরি হল জান না ?"

মোম গলে-গলে অশ্রুর মত গরম ফোঁটা মমতার হাতের ওপর টপটপ করে ঝরে পড়ছিল, সে মোমবাতিটা কাচের উঁচু তাকের ওপর তেল চিরুনি সাবানের একপাশে বসিয়ে দিতে দিতে খুব নরম করে জিজ্ঞেস করল, "উকিলবাবু কী বললেন? স্বপনকে জামিনে ছাড়বে না ?"

"কে জানে! অনেক পাপ করেছি তো, যত ঝক্কি আমার!"

"উকিলবাবু যে বলেছিলেন—"

খাটের ওপর ভেঙে পড়ে উত্তেজনায় হাত-পা ছুঁড়ল শরদিন্দু, "আরে ছুত্তোর! শালাদের খালি টাকা খাওয়ার মতলব। মার্ডারারকে বের করে আনা সোজা? তোমার গুণধর ছেলের নামে কী-কী চার্জ এনেছে পুলিস জান?"

মমতা মুখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "জানি।"

"না, জান না—" বিকৃত স্বরে চিৎকার করে উঠল শরদিন্দু, "তিনটে ছাত্রকে সামনাসামনি স্ট্যাব করেছে, কলেজের ছাদ থেকে বোমা ছুঁড়ে রাস্তার একটা নিরীহ লোককে মেরে ফেলেছে—"

খাটের ওপর বসে পড়ল মমতা, শরদিন্দুকে শান্ত করবার জন্যে তার গায়ে একটা হাত রাখল এবং ভারী নিশ্বাস ফেলে ক্লান্ত স্বরে বলল, 'আমি সবই জানি।'

"জান ত দিনরাত কেন তোমার গুণধর দেশনেতাটির জন্যে ফ্যাচ ফ্যাচ কর? কেন—কেন আমার কানের কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর কর,—এক ঝটকায় গা থেকে মমতার হাত সরিয়ে দিয়ে শরদিন্দু বলল, "বাবু রাজনীতি করবেন, পলিটিক্স করবেন—আর আমি বাড়িভাড়া বাকি রেখে, প্রত্যেকটি পাওনাদারকে ফিরিয়ে দিয়ে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা ঢেলে ওর জন্যে ফতুর হয়ে যাব! হারামজাদা, আনগ্রেটফুল, সোয়াইন!"

মমতার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। মোমের অল্প অল্প আলোয় সে তাকাল ঠাকুরের পটের দিকে। শুধু দেখলই। কী চাইবে, কী প্রার্থনা করবে ভেবে পেল না। আলোর শিখা কেঁপে-কেঁপে ম্লান হয়ে আসছিল। তার ঠাকুরের পটও ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

মন শক্ত করবার চেষ্টা করে মমতা কিছু পরে বলল, "অত ভাবনা-চিন্তা করবার দরকার কী স্বপন তো চায় না যে আমরা ওর জন্যে কিছু করি। সে তো পরিষ্কার বলেছে, আমাদের মানবে না—আমাদের কোন কথা শুনবে না—"

"তা বললে পুলিস শুনবে? পুলিস এ ফ্ল্যাটে হানা দিচ্ছে না? জিনিসপত্র তছনছ করছে না? হারামজাদা কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই তো এই রকম শুরু হয়েছে—" অধিক উত্তেজনায় শরদিন্দু হাঁপাচ্ছিল, বালিশের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে একটু থেমে সে বলল, "আহা, কী সুখের সংসার। যেমন হয়েছে ছেলে, তেমন হয়েছে মেয়ে। হীরের টুকরো একেবারে। বাপ-মাকে রাজারানী করে রেখেছে।"

রাধারানীকে স্বপনের মত পুলিস গ্রেপ্তার-টেপ্তার করেনি। গত বছরে সে লুকিয়ে এক গীটার বাজিয়েকে বিয়ে করেছিল। পরে তার সঙ্গে বনিবনা হল না। স্বপন একদিন মমতাকে বলেছিল, "মনাদাকে ডিভোর্স করে দিদি বম্বে চলে গেছে প্লে-ব্যাক করতে।" রাধারানী কোথায় আছে, কী করছে মমতা কিছুই জানে না। কেননা বিয়ের পর বাপ-মার সঙ্গে যোগাযোগ করবার কোন চেষ্টাই সে করেনি।

রাধারানীর নাম কখনো উচ্চারণ করে না শরদিন্দু, আজ ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ বলে ফেলল। মেয়ের নাম শুনে এবং শরদিন্দুর কথা ভেবে ঝিম মেরে গেল মমতা। একটা অসহ্য ব্যথা তার বুকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠছিল।

কিছু পরে মমতার মনে হল তার এই রকম ঝিমিয়ে পড়া এখন শরদিন্দুর পক্ষে আরো ক্ষতিকর। তবুও সে স্থির করতে পারল না এই অবস্থায় কী বলবে—কী করবে। একটু আগে ঠাকুরের পট লক্ষ্য করে মমতার আকুল প্রার্থনার ইচ্ছা জেগেছিল, তখন সে স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি কী সে চায়। এখন চোখ বন্ধ করে মমতা মনে মনে বলল, "আমাকে পাথর করে দাও ঠাকুর—পাষাণ করে দাও! আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

এবং চোখ বন্ধ করেই মমতা বুঝতে পারল তার ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে। তার মাথা আর কাজ করছে না। হাত-পা অসাড়

হয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডার একটা ভারী ঝাপটা তার শরীরের রক্ত-চলাচলও সম্ভবত বন্ধ করে দিতে চলেছে।

এই রকম পাষাণে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার ভাবনায় ভয় পেয়ে চোখ খুলল মমতা। দেখল, তার পাশেই অসনাক্ত একটা শবের মত উপুড় হয়ে পড়ে আছে শরদিন্দু। মমতা ইতস্তত করল না, তার গায়ে ও মাথায় হাত বুলিয়ে আস্তে ডাকল, "ওগো?"

বালিশে মুখ গুঁজেই শরদিন্দু বলল, "উঁ?"

"একটু চা-টা খাবে? করে দেব?"

'থাক, রাত হয়ে গেছে।'

মমতা বড় মিষ্টি করে বলল, "অমন উপুড় হয়ে শুতে নেই। ঠিক হয়ে শোও। দেখ আমার দিকে—"

শরদিন্দু যেন বড় কষ্টে তার দেহটাকে নাড়াল, চিৎ হয়ে শুয়ে দেখল মমতাকে। কথা বলল না। পরিশ্রান্ত মানুষের মত চুপচাপ থাকল।

"ভাত খাবে এখন?"

"খিদে-তেষ্টা আর নেই।"

শরদিন্দুকে সান্ত্বনার কোন কথা বলল না মমতা, অনুনয় করার মত শুধু বলল, "ওঠ, চল।"

শরদিন্দু উঠল না। মমতার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সে হঠাৎ বড় শান্ত হয়ে গেল। তার চোখে অশ্রু ছিল না, জ্বালাও না—শরদিন্দুর মনে হল, মমতার দৃষ্টি সব বেদনা আর যন্ত্রণার জগৎ থেকে তাকেও যেন অনেক ওপরে তুলে নিতে চাইছে।

মোমবাতিটা ততক্ষণে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে প্রায় নিভে এসেছে।

বিজন, তুমি কি....

....

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিজন, তুমি কি কোনো অন্যায় করেছো ?

না, করিনি !

বিজন, তুমি অত জোর দিয়ে বলছো কেন ? তোমার মনে কি কোনো দ্বিধা আছে ? ভাল করে ভেবে ত্যাখো !

না কোনো দ্বিধা নেই। খুব ভালো করে ভেবে দেখেছি। আমি আদর্শের জন্য লড়াই করছি।

তা হলে তুমি এমনভাবে একজন হীন অপরাধীর মতন লুকিয়ে রয়েছো কেন ? যে আদর্শবাদী, তাকে কি এরকম মানায় ?

নিশ্চয়ই মানায়। এটা একটা স্ট্রাটেজি। আমি এখন বাইরে বেরুলেই পাগলা কুকুরগুলো আমায় ছিঁড়ে খাবে। যতদিন সমাজের সব ক'টা পাগলা কুকুরকে পিটিয়ে না মারা হচ্ছে—

অন্ধকার ঘরটার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে বিজন। প্রচণ্ড গরমকালের দুপুর, আশেপাশে কোথাও কোনো মানুষজন নেই, বাইরে অশ্রান্তভাবে ঝি ঝি ডাকছে, ঘুম এসে যাচ্ছে বিজনের। গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে চপচপে হয়ে গেছে, গত তিনদিন ধরে পরে আছে এই গেঞ্জিটা। জামাটা খুলে রেখে দিয়েছে মেঝের ওপর, তার নিচে ঢাকা পড়েছে বড় ছুরিটা।

ছুরিটায় এখন রক্ত লেগে নেই। বিজনের হাতেও রক্ত নেই—সে তো তিনদিন আগেকার ঘটনা। কাল রাত্তিরবেলা স্নান করেছিল পুকুরে, এখন আবার স্নান করতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু বেরুবার উপায় নেই দিনেরবেলায়। রতনটা জোর করে গোঁয়ারের মতন বেরোলো। এখনো আসছে না কেন রতন? বিজন মনে মনে বুঝতে পারছে, এরকমভাবে নির্জন পোড়ো বাড়িতে লুকিয়ে থাকবার মানে হয় না। এখানেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশী। লোকজনের মধ্যে ফিরে যেতে হবে, ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকাই নিরপদ।

রতন গেছে খাবার জোগাড় করে আনতে। তিনদিন ধরেই তো তাকে বাজে খাবার খেয়ে কাটাতে হচ্ছে। গরম গরম ভাত, ডাল আর আলুসেদ্ধ যদি পাওয়া যেত এখন, ঠিক অমৃতের মতন লাগতো। উঃ, কতদিন যেন ওসব খাওয়া হয়নি। হিরণ্ময় যে কোনদিকে ছিটকে চলে গেল কে জানে। ধরা পড়েনি, খবরের কাগজে নাম নেই, কিন্তু একা একা গেল কোথায়? ও তো জানতোই যে—এখনো এসে···

বাঁ পা'টা মচকে গেছে বিজনের, ব্যথায় অসাড়। খিদে তেষ্টা গরমে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। রতনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই এখন। রতন না আসা পর্যন্ত ঘুমোলেও চলবে না, যদি কোন উটকো লোক হঠাৎ এসে পড়ে—

বিজন, তুমি কি কোন অন্যায় করেছো?

না, করিনি।

আবার ভেবে ছাখো। এখন তো তুমি একা, নিজের কাছে লুকোবার দরকার নেই।

না, অন্যায় করিনি।

অন্যায়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না, দলের নির্দেশ ছিল হেম চৌধুরীকে শেষ করে দেবার। হেম চৌধুরী ছিল প্রগতিশীল আন্দোলনের শত্রু। মুক্তির লড়াই চালাবার জন্যই তাকে সরিয়ে দেওয়ার দরকার হয়েছে, সেখানে ব্যক্তিগত অন্যায়ের কোন প্রশ্নই উঠে না।

তিনদিন আগে ভোরবেলা বিজন হিরণ্ময় আর রতন দাঁড়িয়ে ছিল, হেম চৌধুরীর বাড়ির সামনের রাস্তার মোড়ে। হেম চৌধুরী রোজ ভোরবেলা বেড়াতে বেরতেন। রতন আগে থেকেই খবর এনেছিল— উনি রোজ ঠিক সাড়ে ছ'টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়েন। আশ্চর্য, সেদিন কিন্তু সাড়ে ছ'টা বেজে গেলেও উনি বেরোন নি। ওরা তিনজনে দাঁড়িয়ে ছিল। একটু দূরে দূরে, যেন কেউ কারুকে চেনে না। প্ল্যান সব ঠিক করাই ছিল আগে থেকে। অথচ সেদিনই হেম চৌধুরীর বাড়ি থেকে না-বেরবার কারণ কী—খবর পেয়ে গেছে আগে থেকে! অসম্ভব ওদের দলের কেউ বিশ্বাসঘাতক নয়।

হিরণ্ময় কাছে এসে বলেছিল, আজ বোধ হয় আর মক্কেল বেরুবে না। চল আবার কাল এসে অ্যাটেমট্ করে যাবো। রতন জিজ্ঞেস করেছিল, কেন বেরুলোনা কেন?

—ঘুম ভাঙেনি বোধ হয়!

—মর্নিং ওয়াক করা যাদের স্বভাব, তাদের ঠিকই ঘুম ভাঙে।

—সর্দি জ্বর টর হয়েছে বোধ হয়!

—বোধহয় টোধহয় নয়। ডেফিনিট্লি জেনে যেতে হবে।

—আজ আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, খবর টবর নিয়ে কাল আবার আসা যাবে।

—এরকম সামান্য কারনে প্ল্যান বদল করা যায় না।

বিজন চুপ করে শুনছিল ওদের কথা। এবার সেও বলেছিল, হ্যাঁ, আমারও তাই মত। ফট করে প্ল্যান বদলানো উচিত নয়। মোটে তো পৌনে সাতটা বাজে! আরও অন্তত আধঘণ্টা ওয়েট করে যাবো। হিরণ্ময় বলেছিল, এরপর বেশি রোদ উঠে গেলে কি আর কেউ মর্নিং ওয়াকে যায়। রাস্তাতেও লোকজন বেড়ে যাবে অনেক।

—বাড়ুক।

—বড্ড চা খেতে ইচ্ছে করছে। চল, ঝট করে এক রাউণ্ড চা মেরে আসি।

—পজিশন ছেড়ে এক পাও নড়বি না, হিরন্ময়! পরে চা খাবার ঢের সময় পাবি। আমরা সোলজার, আমাদের প্রত্যেক ষ্টেপে ডিসিপ্লিন মানতে হবে।

রতন খুব জোর দিয়ে বলেছিল কথাগুলো। রতনের উপর যে কোন কাজের ভার দিয়ে নির্ভর করা যায়। রতন এখনো আসছে না কেন? খাবার পায়নি? না পেলেও ফিরে আসা উচিত ছিল। এখানে কেউ ওকে চেনে না। যাই হোক রতন পুলিশের হাতে ধরা পড়বে না কিছুতেই—ও ঠিক বেরিয়ে আসবে। তবে দালাল পার্টির লোকেরা যদি—

আবার ঘুম এসে যাচ্ছে বিজনের। জোর করেও চোখ খুলে রাখতে পারছে না। আর কিছু না, যদি এক কাপ চা পাওয়া যেত এখন! রতন বলেছিল, পরে চা খাওয়ার অনেক সময় পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, সময় আসবে, সমাজের শত্রুগুলো যেদিন সব কটা খতম হবে। হিরন্ময়ের মনটা একটু দুর্বল ছিল—যদি বেশী নার্ভাস হয়ে যায়........

ঘুম আসছে, দারুণ ঘুম—এদিকে তো কোনো লোকজনই নেই। বিজন কি একটু ঘুমিয়ে নিতে পারে না? একটুখানি ঘুম অন্তত পাঁচ দশ মিনিট....

—দাদু! দাদু!

একটা কচি গলার ভয়ার্ত চিৎকার শুনে বিজন ধড়মড় করে জেগে উঠলো, সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কে চ্যাঁচাচ্ছে? একটুক্ষণ কান পেতে শুনলো। কোন শব্দই নেই। মচকানো পা-টা ঘষটে ঘষটে বিজন উঁকি মারলো বাইরে। কেউ কোথাও নেই। অথচ সে স্পষ্ট শুনলো একটা বাচ্চা মেয়ের চিৎকার। তা হলে কি সে স্বপ্নের মধ্যে শুনেছে? সেই মেয়েটা—

বিজন, তুমি কি কোন অন্যায় করেছো?

না, কোনো অন্যায় করিনি।

হেম চৌধুরী বাড়ীথেকে বেরিয়েছিল সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিটে।

বিজন, হিরন্ময় আর রতন একটু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে। রতনের কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলানো। তিনজনেরই পকেটে হাত। তিনজনে একবার চোখা-চোখি করলো। হেম চৌধুরী গলির মোড় পর্যন্ত এগিয়ে আসতেই—

না, বিজন সে দৃশ্যটা আর ভাবতে চায় না। কেন বারবার মনে আসছে। অতীতের দিকে তাকানোর কোনো মানে হয় না। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন তাকে বাঁচতে হবে। আবার কাজে নামতে হবে। সামনে কত কাজ, এখনো মানুষের সমাজে দুষমনরা গিজগিজ করছে। বাঁচতে হবে, এরকম ভাবে পোড়ো বাড়িতে লুকিয়ে থাকলে আর চলবে না। আজ রাত্তিরেই এখান থেকে বেরিয়ে —বাঁ পা-টায় কিছু ওষুধ টস্থুধ না লাগালে যদি বেড়ে যায়—

হেম চৌধুরীকে চিনতোই না বিজন। আগে কোনোদিনও দেখেনি। সুতরাং তাকে খতম করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত কোনো কারণের প্রশ্নই আসে না। রতন তাকে বলেছিল হেম চৌধুরী একজন শ্রেণীশত্রু, তাকে সরিয়ে দেওয়ার প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। দলের নির্দেশে কাজ করেছে বিজন। শুধু সেই মেয়েটা—। আশ্চর্য, একজন মানুষ সম্পর্কে যখন ভাবা হয়, তখন একথাটা মনেই পড়ে না যে, সে কারুর সন্তান বা কারুর ভাই বা কারুর বাবা, তার জীবনের সঙ্গে অনেক কিছু জড়িত।

বিজন, তুমি কি অন্যায় করেছো ?

না, আমি কোনো অন্যায় করিনি।

প্রথম ছুরির আঘাত করেছিল রতন। তারপর ওরা তিনজনেই। ওরা তিনজনে একসঙ্গে এত জোরে দৌড়ে গিয়ে হেম চৌধুরীর গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছিল যে তিনি আত্মরক্ষা করার সামান্য সুযোগও পান নি। হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, চোখ ভর্তি বিস্ময় নিয়েই মারা গেলেন। প্রথম আঘাত খেয়েই চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, ওরে বাবারে, একি একি ! মেরো না, আমাকে মেরো না—। সেই সঙ্গে একটা শিশুর চিৎকার।

খবর রাখা হয়েছিল যে, হেম চৌধুরী রোজ সকালে বেড়াতে বেরোন। কিন্তু একথা কেউ বলেনি যে ওর সঙ্গে ওর নাতনীও থাকে। পাঁচ ছ বছর বয়েস, টুকটুকে সুন্দর চেহারা, জাপানী পুতুলের মত দেখতে। মাথার চুলগুলো রেশমের মত।

আগে ঐ বাচ্চা মেয়েটিকে ওরা লক্ষ্যই করে নি। বিজন প্রথম ছুরি তুলেই ওকে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু তখন আর ফেরার পথ নেই। তখন রতন পর পর দু'বার ছুরি মেরেছে হেম চৌধুরীর ঘাড়ে। কথা ছিল প্রত্যেককেই আঘাত করতে হবে, প্রত্যেকেরই হাতে যেন লাগে রক্ত, কেউ যেন দায়িত্ব এড়াতে না পারে।

তখন আর ফেরার পথ নেই বিজনের। হেম চৌধুরী পড়ে গেছেন মাটিতে। রতন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে—বিজনও ছুরিটা তুলে মারলো, আর একদিক হিরন্ময়—হেম চৌধুরী চিনতে পেরেছেন রতনকে, রতনের হাত জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে বলছেন, একি, রতন, বাঁচাও, মেরো না আমাকে—। সুতরাং, তখন আর হেম চৌধুরীকে একটুও বাঁচিয়ে রাখা চলে না—একেবারে শেষ করে দিয়ে যেতে হবে—।

অনেক সময়, এই রকম পরিস্থিতিতে বয়স্ক সঙ্গীরা ভয়ে পালিয়ে যায়, হেম চৌধুরীর সঙ্গেও যদি বয়স্ক কেউ থাকতো, ওদের বাধা দেবার বদলে নিজের প্রাণ সামলাতো। কিন্তু শিশুর তো ওরকম ভয় বোধ নেই, সে বোধহয় প্রথমে বুঝতেই পারে নি, কি হয়ে যাচ্ছে। সে দাদু দাদু বলে চিৎকার করে জড়িয়ে ধরলো হেম চৌধুরীকে। তখনও হেম চৌধুরীর শরীরে প্রাণ আছে—এ অবস্থায় ফেলে যাওয়া যায় না, যেটুকু সময় বেঁচে থাকবে, তার মধ্যেই রতনের নাম বলে দেবে। কিন্তু আবার মারতে গেলে মেয়েটার গায়ে লাগবে।

রতন চাপা গর্জন করে বিজনের দিকে তাকিয়ে বলে দিল, মেয়েটাকে সরা। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বোমা বার করেছে

রতন, পালাবার সময় ব্যবহার করতে হবে। বিজন টেনে হিঁচড়ে দূরে সরিয়ে দিল মেয়েটাকে, তার হাতের রক্ত লাগলো মেয়েটার বাহুতে। রতন ততক্ষণে বোমা ছুঁড়েছে হেম চৌধুরীর গায়ে—। শেষবারের মতন দেখেছিল বিজন, সেই মেয়েটার মুখখানা যেন নীল হয়ে গেছে, বিস্ফারিত ছুটি চোখ—

বিজন, তুমি কি অন্যায় করেছো ?

না, করিনি। আগে তো জানতাম না, সঙ্গে ঐ বাচ্চা মেয়েটা থাকবে।

একটা নিষ্পাপ শিশু, তার চোখের সামনে এই বীভৎস কাণ্ড হয়ে গেল—ওকি সারাজীবনে আর সুস্থ হতে পারবে ? ওতো কোনো দোষ করেনি—ওর জীবনটা যদি নষ্ট হয়ে যায়—

আমি দায়ী নই। সেজন্য আমি দায়ী নই। এটা একটা অ্যাকসিডেণ্ট, ঐ মেয়েটির দাহু তো গাড়ি চাপা পড়েও মারা যেতে পারতো।

কিন্তু মানুষের হাতে মানুষের মরাই পৃথিবীর সবচেয়ে বীভৎস দৃশ্য। ঐ মেয়েটির চোখের সামনে—

ভুলে যাবে। সব ভুলে যাবে।

যদি না ভোলে ? বিজন তোমার মনে কি কোথাও কোনো দাগ কাটে নি ?

না, আমি যা করেছি আদর্শের জন্যে, ও রকম একটা বাচ্চা মেয়ে এসে ভিকটিমের দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, এটা তো আগে ভাবিনি।

সন্ধে হয়ে গেল, তখনও রতন ফিরলো না। ক্ষিধে আর পায়ের যন্ত্রনা—সব মিলিয়ে অসহ্য হয়ে দাঁড়ালো বিজনের কাছে। কিছুই যখন করার নেই, বিজন আবার ঘুমিয়ে পড়লো। ক্লান্ত দেহে, সারা রাত মড়ার মতন পড়ে পড়ে ঘুমোলো বিজন। ভোরবেলা বেরিয়ে পড়লো সেই লুকোনো আশ্রয় থেকে। এখন আর তার

কোনো ভয় নেই, এখন আর সে আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক নয়, তাকে মানুষের মধ্যে ফিরে যেতেই হবে।

দিন সাতেকের মধ্যে বিজন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলো। ফিরে এলো বাড়িতে। তাকে কেউ সন্দেহ করেনি, পুলিশ তার খোঁজ করে নি। সে এখন পরিষ্কার জামা পরে, রোজ দাঁড়ি কামায়—রাস্তায় যখন বেরোয়—সমস্ত মানুষের মধ্যে সে মিশে যায়, তাকে আলাদা করে চেনা যায় না। কেউ বুঝতেই পারবে না, মাত্র দিন দশেক আগে তার হাত মানুষের রক্তে লাল হয়েছিল।

মাঝে মাঝেই বিজন নিজেকে প্রশ্ন করে, আমি কি অন্যায় করেছি? সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃঢ়ভাবে উত্তর দেয়, না অন্যায় করিনি। কোনো অন্যায় করিনি। আদর্শের জন্য—

হঠাৎ হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে বিজন হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে হেম চৌধুরীর বাড়ীর রাস্তায়। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে বাড়িটার দিকে। কি একটা দুর্বোধ্য কারণে তার ইচ্ছে করে ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকতে। ইচ্ছেটা এমনই তীব্র যে এক একদিন সে একেবারে ও বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। যেন এক্ষুণি সে কলিংবেলে হাত দেবে।

বাড়িটাতে কিংবা সামনের রাস্তায় সেদিনের কোনো চিহ্নই নেই। বাড়িটার দরজা জানালা বন্ধ, নিস্তব্ধ; কিন্তু রাস্তা দিয়ে ঠিক আগের মতই লোক চলাচল করে, পানের দোকানের সামনে ভিড়, বাড়িতে বাড়িতে রেডিও বাজে। ঠিক যে জায়গায় হেম চৌধুরী পড়ে গিয়েছিলেন, বিজন সেখানে দাঁড়ায়। আজ তার হাতে রক্ত নেই কেউ তাকে চেনে না।

পরপর কয়েকদিন ও পাড়ায় এসে ঘোরাঘুরি করার পর বিজন নিজেই আবার সচেতন হয়ে গেল। এরকমভাবে সে আসছে কেন? এটা কি বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? তার মধ্যে কি বিবেক যন্ত্রনা জেগেছে? না, মোটেই না। সে তো কোনো অন্যায় করেনি।

তবু যুক্তিহীন ভাবে তার প্রাণপণ ইচ্ছে হয় হেম চৌধুরীর বাড়িতে একবার ঢুকতে, একবার সে দেখে আসতে চায়—। একজন মানুষ শুধু একজন আলাদা মানুষ নয়—সে কারুর বাবা, কারুর ভাই। কারুর স্বামী……।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে পারে না বিজন, কিন্তু ও পাড়ার পানের দোকানের সামনে অনাবশ্যক ভাবে অনেকক্ষণই দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর কিছু না ভেবেই সে পানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা হেম চৌধুরী কোন্ বাড়িতে থাকেন ?

পানওয়ালা সন্ত্রস্তভাবে তাকায়। তারপর দ্রুত উত্তর দেয়, উনি তো মারা গেছেন।

এ কথা শুনে চমকাবার ভাণ করা উচিত ছিল বিজনের। কিন্তু সে ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আবার আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, একটা ছোট মেয়ে ঐ বাড়িতে থাকে, পাঁচ দশ বছর বয়েস, তার কোনো খবর জানো ?

পানওয়ালা চোখ নিচু করে, দ্রুত রাস্তার দিকে তাকায়, তারপর নিঃস্ব মানুষের মতন বললো, তার কথা আর বলবেন না বাবু, রোজ আমার দোকান থেকে টফি কিনে নিয়ে যেত—আজ দশদিন ধরে তার জ্ঞান ফেরেনি—অনবরত ভুল বকছে,…ওরই তো চোখের সামনে….বোধ হয় বাঁচবে না, এরপর আর না বাঁচাই ভালো—

বিজন হনহন করে চলে গেল দোকানটার সামনে থেকে। আর কোনো দিকে তাকালো না। হাঁটতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে—হাঁপিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। তারপর একটা পার্কের রেলিং ধরে যেই দাঁড়িয়েছে, অমনি তার মনের মধ্যে আবার সেই প্রশ্ন, বিজন তুমি কি অন্যায় করেছ ?

বিজন জোর দিয়ে বললো, না। সেই সঙ্গেই সে সেই অন্ধকারে একা পার্কের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

এবং অধুনা

....

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

চোখ বুজলেই দেখতে পাই ফ্রিজ টেলিফোন গাড়ি কিংবা রেডিওগ্রাম কিংবা বিশাল পিয়ানোর ধারে দাঁড়ানো মিস ক্যালকাটা আমার বউ তুলি, পরনে ক্রিমরঙা টেরিভয়েল, সিঁথিতে সিন্দূর। আমার ভিতরের চোখজোড়াকে ক্রমশ নির্বোধ করে তোলে একটা মধ্যবিত্তমনস্কতা, রোগা নেড়ি কুকুরের মত যার রাস্তায় জন্ম হয়েছিল একদা এবং কালক্রমে সেও বয়োপ্রাপ্ত হতে পেরেছে।

সেই জিনিসগুলো, আমি জানি কারখানায় যাদের উৎপাদন করা যায় এবং জারজ অনাথদের মতো যারা বারবার হাতবদল হতে পারে, আমার ভিতরের ইচ্ছার রঙে রাঙা। অবশ্য ক্রিমরঙা তারা। কারণ, এই একটি রঙই আমার ও তুলির দারুণ পছন্দ। ঘরের নির্দিষ্ট জায়গায় তাদের দাঁড় করানো দেখতে পাই, কেবল গাড়িটা বাদে। অত বড় ক্যাডিলাকের জন্যে নিচে গেটের পাশের গ্যারেজটাই বরাদ্দ —যেখানে প্রকৃতপক্ষে হরনাথের জয় মা কালী স্টোর্স। কোন কোন মধ্যরাতে হঠাৎ ঘুম চিড় খেয়ে যখন বেজে ওঠে টেলিফোনের ক্রিংকার, কানে তুললেই শুনি হ্যাল্লো ডারলিং! অন্ধকারে নিঃশব্দ ফ্রিজের হৃদয়ে ভাপওঠা লাল স্বাদু ফল আর সব জলের বরফ হতে থাকা দেখতে পাই। হঠাৎ চাপা স্বরে বাজতে থাকে রেডিওগ্রাম,

সুপার হিট পপ গানের কলি ওরা গাইতে থাকে 'আজ রাতে চলে যাবো একশো মাইল দূরে!' বিশাল দুর্গের মতো পিয়ানোটার সামনে হালকা ছিপছিপে দেহ ভেঙে নদীর নরমতা আনে, স্তনদুটো কেঁপে ধরে রাখে অস্থির আদিম ঝড়। এবং হঠাৎ বেজে ওঠে নিচের গেটের দিকে ষড়যন্ত্রসঙ্কুল প্রিঁ প্রিঁ। বড় দেরী করে বাড়ি ফিরল তুলি, হয়তো চোখের সামনে তার হলুদ সিংহের পাল, তার সঙ্গে ক্যাডিলাকটাও আজ রাতে বড্ড বেশি মাতলামো করছিল।

এইসব উপদ্রব আজকাল এবং ভীষণ গোলমেলে কাণ্ড। তিতিবিরক্ত হয়ে সিগ্রেট জ্বালি এবং জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ওদিকটায় চাপা থকথকে অন্ধকারে আটকানো মাছির পালের মতো কয়েকশো ভোটারের খোলার ঘর পেরিয়ে অনেকটা দূর অব্দি আকাশে পৌঁছনো যায়— কারণ কলকাতার এইসব মধ্যরাতে ইচ্ছেরা খুব হালকা হয়ে ওঠে এবং সামনের জাতীয় শল্যবিদ্যা শিক্ষালয়ের তেতালা ছাদে সার সার কামান বসিয়ে নক্ষত্রের দিকে গোলা ছোঁড়াও সোজা। গর্বিত হতে কোন বাধা নেই যে আমি এখন নক্ষত্র দেখতে পাচ্ছি। বস্তুত এই সময় অনেক ইয়াহিয়া খানের অভ্যুদয় ঘটতে পারে।

কিন্তু তখনও, হায়, আমার পিছনে অলীক টেলিফোন বাজতে থাকে, অলীক ফ্রিজের হৃদয়ে কলজের মতো স্বাদু ফলে ভাপ ওঠে এবং সব জল তার হারিয়ে বরফ হতে থাকে, অলীক রেডিওগ্রামের ভিতর হল্লা করে কারা একশো মাইল হিচহাইকিং চালিয়ে যায়, এবং মাতাল কোন অলীক ক্যাডিলাক গেটের পাশে ধাক্কা মারে। ওদিকে বিশাল অলীক পিয়ানোর কাছে একটা সত্যিকার নারীশরীর গলে গলে নদী হয় আর স্তনের বৃন্তে থর থর করে সত্যিকার কালো ঝড়!···

খুব কম দামী টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিই। জ্বালবার মুহূর্ত অব্দি মনে রাখি, এটা কি কোন এক রীতামিতানিনার দেওয়া তুলিকে তার হ্যাপি বার্থডে উপহার, নাকি বিবাহস্মারক-রজনীতে হারটিলি

গ্রিটিং! গঙ্গার ধারে দেখা দুলন্ত চলন্ত চপল সেই স্বর্ণকেশিনী বাঙালিনীদের কেউ কেউ চাপা ঠোঁটে আধো আধো দেশোয়ালি বুলি? কিন্তু তারপর আমি বিছানায় ভাঙা শুকনো ডালের মতো তুলিকে হাঁ করে ঘুমোতে দেখি। তার ব্রেশিয়ারের প্রান্তে ঘামের কণাগুলো দুঃখীর তাকানোর মতো টলটল করে। সায়াটা সরে গিয়ে খসখসে উরুর কালো দাগ স্পষ্ট করে—ছেলেবেলায় ওর একটা ফোঁড়া হয়েছিল নাকি, সেই দাগ। আমার ধারণা, তুলির শরীরটাতে যৌবনের শুরুতেই একটা চমৎকার সাজানো বাগানের 'প্রকল্প' নেওয়া হয়েছিল, আজকালকার সরকারী ব্যর্থতার মতোই সেইসব 'যোজনা' রেখে গেছে অনেকগুলো ধ্বংসের ছাপ। আর, তুলিও তো বলে, বিয়ের আগে কি আমি এমনি ছিলুম? অনেক মাস্তানকে ট্যারা করে দিতুম। তুলি হাসে। ওর মধ্যে অনেকগুলো জোর আছে। ও প্রাণভরে হাসতে পারে। এবং স্বপ্ন দেখতে পারে। বস্তুত স্বপ্ন দেখার প্রচুর শক্তি সঙ্গে নিয়েই তুলিদের বাঙালী পরিবারের অভ্যুদয়।

সেইসব অলীক আসবাবগুলো আসলে তুলিরই আমদানী। ওব প্রচুর স্বপ্নের ফসল। ও মাসে মাসে টাকা জমাচ্ছে। ও বলছিল, সেন সায়েব সামনের জানুয়ারীতে ওকে বেশি মাইনের জায়গায় বসাবেন। তুলির দিনগুলো কাটছে না। এদিকে আমায় সেন সায়েব উপদেশ দিয়েছেন, ওভার-টাইম করছ না কেন? পাঁচটা বাজতে না বাজতে বাড়ির দিকে ছুটছ। কী, আছে কী বাড়িতে? আমার সেন সায়েব ফোকলা দাঁতে হাসেন।

যা আছে বাড়িতে, তা তো এই। মধ্যরাতে বাতি জ্বেলে তার দাঁত-ছরকুটে থাকা স্পষ্টতা অর্থাৎ বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে, তুলির উরুদুটো সায়ায় ঢেকে দিতে দিতে, ভিতরে কোন চোরা রোগ থাকলে মানুষ হাঁ করে ঘুমোয়। ভাবতে ভাবতে আবছায়াভরা ঘরের সেই ফ্রিজ কোন পিয়ানো রেডিওগ্রাম নিষ্ঠুর হাতে মুচড়ে ভাঙি, আছাড় মারি এবং সিঁড়ি বেয়ে নীচের গ্যারেজে ঢুকে ক্যাডিলাকটা বীরবিক্রমে

রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলি, আগুন জ্বেলে দিই, তারপর হরনাথের জয় মা কালী স্টোর্স সাইনবোর্ডটা যথাস্থানে টাঙিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে আসি ছাদের ওপর এককামরা আমার 'ফ্ল্যাটে'। তুলির দিকে তাকিয়ে থাকি। রাগে ওকে মারতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পারিনে। ওর ব্রেসিয়ারের প্রান্তে ঘামের দুঃখিত ফোঁটাগুলো ওর দেহের আর্ত নিঃশব্দ ফোঁপানির মতো মনে হয়। ওর হাঁ করা মুখে করুণায় চুমু খেতে গিয়ে পিছিয়ে আসি। টের পাই, ওর দেহের ভিতর দিকে কোথাও পচ ধরেছে। ঘৃণা আর মমতা আমাকে টানাটানি করে।

হঠাৎ চুপচাপ আমি শুয়ে পড়ি। একটু তফাতে থাকি। চিৎ হয়ে তাকাই। চোখ বুজতে আমার ভয় করে। সেইসব অলীক পণ্য-সমূহের বিপুল উপদ্রব, তবু চারপাশে ওঁৎ পেতে থাকে সারারাত। সারারাত ধরে ফোন বাজে ক্রিং ক্রিং, ফ্রিজের হৃদয় শীতলতর হতে থাকে, একশো মাইল হেঁটে যাওয়ার শ্বাসক্লিষ্ট চাপা গান এবং পিয়ানোর টুং টুং থামে না, নিচের গেটে মত্তমাতাল ক্যাডিলাক অলীক কণ্ঠস্বরে ডাকে প্রি' প্রি'।

গতকাল চব্বিশ ঘণ্টা একটা বন্‌ধ্‌ গেল। হঠাৎ একটা ছুটি পেলে আমি বা তুলি খুবই খুশী হই। কিন্তু বন্‌ধ্‌টা বড্ড নিরাশ করে। হঠাৎ একটা ছুটি বিশ্রাম, হঠাৎ বন্‌ধ্‌ বেদম খাটনি। কারণ ছুটি আমাকে বাইরে ছড়ায় ছিটোয়, বন্‌ধ্‌ করে ফেলে ঘরবন্দী। মগজের ভাপ উঠে, কিছু করবার থাকে না বলে। এই গাছগুলো, মাঠটা, রাস্তার কল, মুচি, মুদি, মসজিদের গেটে সারবন্ধ ভিখিরী পুরো মুখস্থ হয়ে যায়। যাবতীয় নাগরিক অর্থাৎ পৌর সমস্যা, অর্থনীতি ইত্যাদি খুঁচিয়ে রক্ত বের করে। সেনেটর কেনেডি সারাক্ষণ বাংলাদেশের কথা বলতে থাকেন। এবং বিশ্ববিবেক, এবং ইন্দিরা গান্ধী, এবং ম্যাটিনি শোতে ছবিঘর না যেতে পারায় তুলিও বিশেষ সাজল না, এইসব শনির চাকা আমার চারপাশে বনবন করে ঘোরে। ক্রমশ নীরক্ত হতে থাকি কপালে ভাঁজ পড়ে।...... তোমার কি

শরীর খারাপ ? তুলি বলে। এবং জবাব না পেয়ে অস্ফুট স্বগতোক্তি করে, আমারও। কেট্‌! বিচ্ছিরি। কিস্সু করার নেই।

খট করে টিপে দিলাম লোকাল সেট ট্রানজিসটারের চাবি। এক লাইন বাজতে না বাজতে ভুরু কুঁচকে তুলি তাকাল, যন্ত্রণার্ত দৃষ্টি এবং হঠাৎ উঠে এসে বন্ধ করে দিল। আমি কিছুই বলি না। কারণ, আমার এটা বোকামি। তুলি বলে, খুললেই খালি কালোয়াতি, নয় রবীন্দ্রসঙ্গীত। আর কিছু কি থাকতে নেই ?

একটু হাসি।....তুমি কিন্তু ও দুটোরই ভক্ত ছিলে। বিশেষ করে শেষেরটার।

তুলি হাসে না। বলে, সহজ ভালোবাসার সঙ্গে একটা জবরদস্তি জুড়ে দিলে এমন বিচ্ছিরি লাগে না! বেহাগ শুনলেই চোখের জল ফেলতে হবে, এমন দিব্যি আমি মানিনে।

এখন তোমার সহজ ভালবাসা পাবে, সে কোন গান তুলি ?

জানিনে। বকিও না মেলা।....বলে তুলি জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। ও স্ত্রীলোক। বাইরের বনধ-বন্দী শহরটার কাছে এখন কী প্রত্যাশা ওর, অনুমান করতে চেষ্টা করি। একটামাত্র ম্যাটিনি শো ? বিশ্বাস হয় না। আমার ধারণা, এইসব বন্‌ধ্‌ একটা 'অতি অল্প হইল, গোছের ব্যাপার। কোথাও গুরুতর বিশাল ভাঙনের দিকে আমার মতো তুলিরও গভীর সমর্থন আছে। যখন উপড়ে যাবে সব সাঁকো, উল্টে যাবে রেলগাড়ি, আছড়ে পড়বে সব উড়োজাহাজ এবং কারখানায় কারখানায় আগুনের হল্কা দেখা যাবে, এবং স্কাইক্রেপার পড়বে ভেঙে, তুলি আর আমি এইসব পোশাক-আসাক ফেলে পুরো ন্যাংটো হয়ে চলে যাবো কোন গাছের কোটরে।

বন্‌ধের পুরো দিনটা একরকম এই করে কেটে গেল। শ্রুতিকারের দেশ থেকে ক্রমাগত ভেসে আসছিল বিপুল ধ্বংসের বাজনা—তার মধ্যে বিসমিল্লা খাঁর সানাই বেজে গেল, একটা

বিজয়াদশমীর গোধূলিকালটুকু টানটান পর্দায় একটু একটু কাঁপতে লাগল হঠকারী স্মৃতির অনুষঙ্গে মুহুর্মুহু নানান প্রতিভাস, এবং পাড়াগাঁয়ের রাঙামাটির পথে একটি বালকের সামনে অশেষ জ্যোৎস্না, দূরের ঘরেফেরা ঢাকীদের মিলিয়ে যাওয়া ঢাকের শব্দ, হঠাৎ বলেছিলাম, তুলি, তোমরা তো বাঙাল ?

পাল্টা তুলির প্রশ্ন, তোমরা তো ঘটি ?

একটু হেসে বলেছিলাম, আমরা কিন্তু সবাই এখানে বহিরাগত। আউটসাইডার। এতাবৎকালের এই শহরটার যা ইতিহাস, তা একটা ধারাবাহিক ভীষণ সংঘর্ষের ইতিহাস। আউটসাইডারদের সঙ্গে এর সংঘর্ষ সমানে চলেছে। কোনপক্ষের মনেই কোনরকম নৈতিক বা দৈবিক আনুগত্য নেই পরস্পরের প্রতি।

আমাকে চুপ করতে দেখে তুলি অশ্লীল ভাবে তাকায়। কিন্তু কিছু বলে না। আসলে আমার মুখে একটা করুণ অসহায়তা ও লক্ষ্য করেছিল। ও টের পাচ্ছিল, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তাছাড়া, এ সবই আমাদের অস্তিত্বসংক্রান্ত কথাবার্তা। আমি শহরটাকে অস্তিত্ব দিয়েছি, শহরটা দিয়েছে আমাকে—অথচ আমরা পরস্পর মূলত ভিন্ন, তেল এবং জলের মতো, শিখা এবং ধোঁয়ার মতো। তুলি স্ত্রীলোক। প্রকৃতি তার বোধকে দিয়েছে ঘষেমেজে চকচকে আয়নার মতো—কিন্তু সব প্রতিফলনের তাৎপর্য সে ধরতে পারে না। যা পারে, তা হল যন্ত্রণা। যন্ত্রণার ছাপটা সে ভালই চেনে। এবং সেকারণে আমাকে চুপচাপ দেখে কতক্ষণ পরে তুলি বলেছিল, গ্যাসটা বেড়েছে। ট্যাবলেট খাচ্ছো না কেন ?

সত্যি সত্যি বমিভাব পেয়ে বসছিল আমার। বুকের খাঁজে খাঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একটা উড়ুক্কু সূঁচ। সেই সময় নীচের রাস্তায় চলে গেল একটা মিছিল শ্লোগান দিতে দিতে। দু মিনিট বিরতি, বিরতির পর ফের বমিভাব এবং বুকের ভিতর সেলাই শুরু। হঠাৎ তুলি পাশে এসে বসল।....আচ্ছা, এই দিনে যদি....ধরো

আমাদের গাড়ি থাকত, বেরিয়ে পড়তুম, কেউ কি আগুন জ্বালিয়ে দিত ?

ওর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আমি বলি, কী জানি ! আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই ।

তোমার বন্ধুদের কারো গাড়ি নেই ? ওদের কাছে শোননি ?

মনে পড়ছে না ।

তুলি চুপ করে থাকল । ওর ওই মুখটা আমি চিনি । টের পাচ্ছিলাম ও এখন স্বপ্নের ভিতর একটা ক্রিমরঙা বেগবান গাড়ির আরোহিনী । সারা শহর ও শহরতলী, এবং সব হাইওয়েতে ওর যাত্রা । গতির পুলক ওর শিরায় । ওর রুগ্ন জরায়ুতে এখন কিছুক্ষণ এক অমিততেজা ভ্রূণের আবির্ভাব আসন্ন । তারপর ও একটু ঘুরে বসে । ঘরের ভিতর কী যেন খোঁজে । আস্তে আস্তে বলে, ছাই, একটা ফোনটোনও নেই যে গল্প করে সময় কাটাই ।

আমি হাসি ।....একটা রেডিওগ্রাম থাকলে মন্দ হত না । ও-বাংলার কোন শিল্পীর যেন রেকর্ড বেরিয়েছে ।

তুলি বলে, সামনের মাসে একটা সস্তাটস্তা রেকর্ডপ্লেয়ার কিনে ফেললে মন্দ হয় না ।...

এই সব কথাবার্তা এবং আফসোস দিনটা কেটে গেল । আমাদের কিছুই করা হল না । অথচ ছিল দায়িত্ববিহীন প্রচুর একটা অবসর এবং নির্জনতা । তুলির প্রায়-সহজাত প্রচুর ভালবাসা ক্রমশ যেন মিইয়ে পড়ছে দিনে দিনে । ওর শরীর—যা ভালবাসাকে চেহারা দিতে পারে, তা একটা গভীরতর পচধরা অস্বাস্থ্যে ক্ষয় হচ্ছে । আমার পাকস্থলীতে গ্যাসের উপদ্রব । তবু আমরা পরস্পরকে নিয়ে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করছি । কারণ, এই ঘরের ভিতর প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে কিছু আধুনিক পণ্যদ্রব্য, ঠিক মধ্য রাতে হঠাৎ যারা আত্মপ্রকাশ করে । টেলিফোন বেজে ওঠে ক্রিং ক্রিং, ফ্রিজের বুকের

মধ্যে ভাপওঠা স্বাদু ফল এবং জল স্তব্ধতার হতে থাকে, একশো মাইল চলে যাবে ভালবাসায় যারা তারা হল্লা করে হাঁটে মাতাল ক্যাডিলাক জয় মা কালী স্টোর্সে গিয়ে ঢুঁ মারে এবং বিশাল পিয়ানোর সামনে নারী গলে নদী হয় যার স্তনে থরথর কাঁপে ঝড়।

আজকাল এইভাবে আমরা ঘর বন্দী। আমাদের ইচ্ছারা কিছু অলীক পণ্যের ওপর গুটিসুটি বসে সমানে তা দিতে থাকে। আমরা পিরামিডের নিচে শুয়ে থাকি রাজারাণীর মতো, আমাদের হাঁপ ধরে যায়। অনেক কিছুর ওপর ঘৃণা হয়। জানলার বাইরে গাছপালা এবং আকাশ আছে। এখন সূর্য ওঠে। হাওয়া বয়। শিমুলগাছে বাসা বাঁধবার জন্যে একজোড়া কাককে দেখি কাঠকুটো কুড়োতে, যদিও কোকিলের ডিমেই তাদের তা দিতে হবে। মহিলা কলেজের পাঁচিলের ধারে যে কৃষ্ণচূড়া এবার দারুণ ফুল ফুটিয়েছিল, তার ছায়ায় শুয়ে একটা বস্তির ছেলে—যার ডানহাতটা বোমায় উড়ে গেছে এবং তার মা সারাক্ষণ পাখা ঘুরিয়ে হাওয়া দেয় ক্ষতস্থানে, রাস্তার কলে মুদি ভুঁড়িতে সাবান ঘষে এবং পিছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে কিছু লোক। বোঁ করে চলে যায় পুলিশের গাড়ি। সাঁৎ সাঁৎ মিলিয়ে যায় কিছু রকের ছেলে। মসজিদের গেটে ভিখিরিরা প্রতীক্ষা করে। কে চেঁচিয়ে কাকে বলে, দেখেছ? আজও স্বীকৃতি দেওয়া হল না?....হয়তো বাংলাদেশের কথা বলা হয়। এবং তুলি আপিসে যায়। আমিও আপিসে যাই। রাতের দিকে শোবার সময় তুলি হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে, ওই যাঃ! আজ ট্যাবলেট খেতে ভুলেগেছি! কী হবে! বাতি নেভানোর পর কতক্ষণ সে নিঃসাড় হয়ে থাকে। আমি অনায়াসে তাকে বলতে পারি অভিরুচি নেই। কারণ...,

সবাই বৃথা লাগে, যদি না মধ্যরাতে বেজে ওঠে একটা সত্যিকার ফোন, একটা সত্যিকার ফ্রিজের হৃদয়ে রক্তিম স্বাদু ফলে ভাপ ওঠে বা

বরফে, যথাযথ রেডিওগ্রামে বাজে চলমান
তা ক্যাডিলাক যতক্ষণ না সরাতে পারে জয় মা
ইনবোর্ড কিংবা প্রকৃত পিয়ানোর বিশালতায় নাচে
তী নারী—যার স্তনে অপেক্ষা করে আছে দুর্দান্ত

াথাও গুরুতর ভাঙনের দিকে আমার ও তুলির সবিশেষ
ছে।

সমাপ্ত